শ্রেষ্ঠ গল্প

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এরকম তোমার ইচ্ছায়। দেখতে কি পাও, শুনতে কি পাচ্ছ?

অপেক্ষা ক'রো।

তাঁতী বউ

সব দেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার-যুগ, আর একটি আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগ। বাঙলা দেশে অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ। সেই যুগের গল্প একটা বলছি :

অভিমন্যু বসাকের ছেলে গোকুল বাপের ব্যবসায়ে উন্নতি যতটা করলে অবনতি তার চাইতে কম করেনি। অভিমন্যুর ছিল আটপৌরে ঠেঁটি আর বচকানা কাপড়ের ব্যবসা, পয়সা যা পেত তাতে দিন চলে যেত, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে তাঁতীবউয়ের নামে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছে। যতদিন পারা যায় গোকুল কাঁধে লাল গামছা দুলিয়ে খয়বু-দেওয়া পান খেয়ে নিছক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু করল না। বাপের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে সে যন্তরপাতিগুলি নিজের মতো করে গুছিয়ে নিল; লোকে অবাক হল দেখে, যে গোকুল অপদার্থ হিসাবে বিখ্যাত হয়েছে সে বাপের আসনে বসে বাপের মতো ঠেঁটি আর বচকানা বুনে যাচ্ছে যেন কতদিনকার অভ্যাস।

লোকে বলে পরিবর্তন তারপরে যেটা হল তার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল, কাজেই বাপের শোক গা-সহা হতেই গোকুল একদিন তাঁত ঘরে সব উল্টে পাল্টে ভেঙেচুরে ফেলল যখন, তখন তারা আদৌ অবাক হল না। তবু গোকুল তাদের অবাক করল। তিন গুরুবার পার হয়ে যাবার পরে চারের বারে গোকুল বিকেল-বেলায় কচি কলার পাতায় কি একটা মুড়ে নিয়ে গ্রামের জমিদার-বাড়ির দিকে রওনা হল। সে জমিদারের কাছে গেল না, গিন্নিমার কাছে গেল না, সোজা গিয়ে উপস্থিত কাজলার (দীঘি) ঘাটে যেখানে জমিদারের নতুন-আনা বেটার বউ আর নতুন-বিয়ে-হওয়া মেয়ে ইশারায় স্বামীর গল্প করছে। গোকুল যখন ফিরে এল তখন তার হাতে বেটা-বউয়ের হাতের দুগাছা রুলি। এই হচ্ছে গোকুলের মসলিন বুনবার প্রথম কথা। গঞ্জে পাঠাবার মতো সরেস জিনিস তার তাঁতে উৎরাত না, বিশেষ করে ফুলের কাজগুলোতে সোনার আঁশ খাটাতে সে পারত না, বড় জোর শাদা সুতোর বুটি উঠত; আর বহরে সেগুলো শাজাদীর দয়বারী শাড়ি হত না, কাজেই রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া বড়

বেশি কারো চোখে পড়ত না তার কারিগরি; বড় জোর সকালে কোনো স্বামী দেখতে পেত, রাত্রির শুকনো মালাগাছির সঙ্গে বিছানায় পড়ে আছে মাকড়সার শাদা জালির মতো কি একটা।

গোকুল মাঝারি গোছের গুণী কিন্তু বড় রকমের খেয়ালি ছিল। বড় গুণীর বড় খেয়ালে যা ঘটে খেয়াল মিটবার পর তার জের থাকে না। কিন্তু মাঝারি গুণী বড় খেয়াল ধরলে, কিম্বা মেজ গুণী মেজ খেয়ালে হাত বাড়ালে খেয়ালের জের অত সহজে মেটে না। সাধারণ ঘরের মেয়ে একরাতে মসলিনের সাত পাক পরলে সকালে বিছানা ছাড়বার সময়ে স্বামীকে না-জানিয়ে বিছানার একপাশে আলগোছে মসলিন খুলে রেখে যেতে পারে না এও তেমনি আর কি। গোকুল তার খেয়ালে জড়িয়ে পড়ল।

শীতের গোড়ায় ইদিল-শাহীতে পরগণার হাট বসত একমাসের জন্য। সব হাটেই সেকালে নানা ধরনের পণ্য আসত, পরগণার হাটে কতগুলি বেশি দামী জিনিস আসত। সে সবের জন্য এ হাটের একটা দিক আলাদা করা থাকত। অন্য সব দোকানের পসরা ফুরিয়ে যাবার পর হাটের এদিকে ভিড় লাগত। জমিদারেরা নিজে আসতেন, এমন কি উজিররাও কেউ-কেউ আসতেন কোনো-কোনো ক্ষেত্রে। এদিকে বাঁদী-বান্দার দোকান। টাকা দিয়ে বান্দা পাওয়া যেত যোয়ান, বুদ্ধিমান, কৌশলী, পাঠান, মোবলা, খোজা, হিন্দু যার যে রকম চাই। বাঁদীও পাওয়া যেত মুলতানী, গুজরাটি, আফগানি, শাদা, গোলাপী, শ্যামলা, কখনো বসরা থেকেও আসত। এসব দোকানের বর্ণনা ইতিহাস যা দিয়েছে তার চাইতে ভালো বলা যায় না। আনারকলি, নুরজাহাঁ এসব দোকানের বেসাতি।

গোকুল মসলিন ক'খানা বেচে ফেলেছে, দোকান-ছেড়ে সে মেলায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে কি-কিনি কি-কিনি ভাব। অন্য যে দু-একজন গুণী এসেছে তারাও ঘুরছে। কিন্তু হাটের একটা দিকে সে কিছুতেই ভিড় ঠেলে এগোতে পারছে না। লাঠি-বল্লম নিয়ে এক-এক দল লাঠিয়াল তো আছেই, খোলা কিরিচ হাতে পাহা-ড়ের মতো উঁচু ঘোড়ায় চেপে ঝকঝকে সাঁজোয়া পরা সিপাইও আছে কয়েক দলে। গোকুল ভাবল, বোধহয় রাজা-মহারাজেরা কেনা-কাটা করে এখানে। কিন্তু ভয়ে কৌতূহল চাপা যায় না। মেলার শেষ দিন এসে গেল, গ্রামের সঙ্গীরা চলে গেল কিন্তু গোকুলের যাওয়া হল না। ওদিকের সব দোকান উঠে গেছে, এদিকেরও দু-একটা মাত্র অবশিষ্ট। প্রথমে সিপাইরা গেছে, তারপরে গেল লাঠিয়ালরা। একদিন গোকুল দেখল এবার এগোনো যায়।

একটা মাত্র দোকানই খোলা ছিল, দোকান ভেঙে চলে যাবে বলে একটা

চাকর গালিচা পর্দা জড়ো করে গাঁটরি বাঁধছে। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করল না, অবশেষে সাহসে ভর করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের দোকান গো?'

বুড়ো দোকানি ফুরসি টানতে-টানতে বলল, 'মাল তো নেই বাপু, আর তুমি কিনবেই বা কি?'

'যা হয় কিছু, খালি হাতে মেলা থেকে ফিরব?' •

'তা দেখ, বাপু, এদিকে এস। আমার দুর্নাম গেয়ে বেড়িও না, ভালো মাল নেই, বেছে নিয়ে যাবার পর না-পছন্দ এক-আধটা আছে।' এই বলে ঝানু দোকানি দোকানের ওঁচা ভাঙা মাল হাতখালি করবার জন্য যে কোনো দামে ক্রেতাকে গছানোর ভঙ্গিতে গোকুলকে ডেকে নিল।

পর্দা তুলে গোকুল দেখল কোনো মাল নেই, একটি মেয়ে শুধু বসে আছে, মেয়ে নয়, মেয়ের কাঠামো যেন, শুধু হাড়গুলো দেখা যায় সারা গায়ের শ্যামল চামড়ার নিচে। গোকুল বুঝল কিসের দোকান এটা, কিন্তু হঠাৎ সে বলে বসল, 'আমি কিনব।'

কেন বলল একথা গোকুল সেদিনও বলতে পারেনি, কোনোদিনই বলতে পারবে না। তার একার সংসারে ঝি-বাঁদীর কি বা কাজ। গ্রামের লোকেরা বলে সে খেয়ালে একাজ করেছিল। মসলিন বিক্রির টাকা বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে গোকুল বলল, 'আমার কেনা হল।'

পথে দুর্বল রোগা মেয়েটার দিকে চেয়ে-চেয়ে কষ্ট যত না হল তার চাইতে বেশি হল রাগ। সে যে ঠকেছে, গ্রামের লোকরা আর একবার তাকে বোকা তাঁতী বলবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। সমস্ত শরীরে হাড়গুলো নড়বড় করছে। আধ-ময়লা ডুরে ঠেঁটি পরবার ধরনটাই বা কী। চোয়ালের হাড়গুলোর নিচে চোখ ডুবে গেছে, কাঁধের হাড়ের জোড়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। কঙ্কালই হোক. কঙ্কালের গড়নের মধ্যেও একটা ছন্দ থাকা উচিত। যেন কোমর নেই এত সরু জায়গাটা, গোকুল ভাবছিল মচ্ করে একটা শব্দ হবে, তারপর দু-টুকরো হয়ে যাবে মেয়েটি। সে বললে, 'আস্তে চল, বাপু।' তার মনে হতে লাগল, মুচিরা মাঝে-মাঝে যেমন বুড়ো গরু হাঁটিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে এও যেন তেমনি। হাতে করে তুলে ফেলে দেবার মতো হলে সে ছুঁড়ে ফেলে দিত তার বোকামির নিশানা কারো চোখে না পড়ে এমন জায়গায়।

পথে-ঘাটে বেরুলে লোকে ঠাট্টা করবে এই ভয়ে গোকুল ঘরে বসে তাঁত বোনে, আর কিছু কাজ যাতে হয় সে উদ্দেশ্যে মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সবল করে তোলার জন্য যখন তখন তাকে ধমকে-ধমকে খাওয়ায়। মেয়েটা কাঁদে আর খায়, আর মাঝে-

মাঝে রোদে রাখা লাটাই ঘরে তোলে, ঘরের লাটাই রোদ্দুরে দেয়। গোকুল তার দিকে চেয়েও দেখে না। চোখের কোনায় যদি হঠাৎ কখনো পড়ে, সারা শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে: কি বিশ্রী, কি বিশ্রী।

মানুষ যেমন হঠাৎ একদিন মরতে পারে, তেমনি হঠাৎ একদিন বাঁচতেও পারে।

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার পর থেকে পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো বর্ষা নেমেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গোকুল ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় হিসাব দেখছে। আজকাল সে বুড়িয়ে গেছে যেন, বাঁদীটাকে কিনে যে লোকসান হয়েছে তাই উশুল করতে গিয়ে সেই যে সে টাকা-পয়সার হিসাবে নেমেছে ক্রমশই তাতে জড়িয়ে পড়ছে।

মেয়েটি চট পেতে বারান্দায় শোয়। কদিনের বৃষ্টিতে মাটির দাওয়া কাদা-কাদা, তবু তারই মধ্যে সে শুয়ে থাকে। বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেলে ক্রমে দেয়ালের কাছে সরে আসে। সারা শরীর জলে ভিজে যায়, হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে ঘুমের আশা ছেড়ে কোনো-কোনো রাত্রিতে সে দাঁড়িয়ে কাটায়।

গোকুলের চোখে তন্দ্রা এসেছিল। পর-পর তিন-চারবার প্রবল বজ্র গর্জনের সঙ্গে ঝাঁ-ঝাঁ করে বৃষ্টি নামল। বারান্দার দিকের জানলা দিয়েও বৃষ্টির ছাঁট এসে গোকুলের গায়ে লাগছিল। সেটা বন্ধ করার জন্য উঠে এগিয়ে যেতেই তার কানে কান্নার শব্দ এল। কে বা কাঁদছে, ভয় পেয়ে ছেলেমানুষের মতো, অসহায় অব্যক্ত কান্না। অদ্ভুত লাগল গোকুলের। অথচ তেমন লাগবার কথা নয়, বাড়িতে আর একটি প্রাণী আছে, এই তিমির ঘন দুর্যোগের রাতে বাইরে বৃষ্টির নিরাশ্রয় ধারার মধ্যে। বাঁদী কাঁদে এমন করে মানুষের মতো?

দরজা খুলে দিল গোকুল তবু নড়ে না বাঁদী। অন্ধকারের মধ্যে নজর ঠেলে দিয়ে গোকুলের লজ্জা বোধ হল। ঘরে ঝুলানো সকালে তাঁত থেকে নামানো শাড়ি-খানা হাত বাড়িয়ে বাঁদীর দিকে এগিয়ে দিয়ে গোকুল ঘরের অন্ধকারে সরে গেল। সেখান থেকে হুকুম করলে বাঁদীকে ঘরের ভিতরে আসতে।

বিছানায় বসে সে ভাবতে লাগল কি বিড়ম্বনায় সে পড়েছে খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে। মানুষ, হোক সে বাঁদী, এমন নির্বোধ হয় কি করে? লাথি আর মিষ্টি কথার তফাত বোঝে না। অবশ্য গোকুল পরখ করে দেখেনি, লাথির অপমান বুঝতে হলে খানিকটা বুদ্ধি থাকা দরকার। খিদে পেলে যে খায় না, খিদে না থাকলেও খাও বললেই যে খায়, গোবর ঘেঁটে হাত ধোবার ইচ্ছা হয় না যার, পায়ের নখ উল্টে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলেও যাকে বলে দিতে হয় হাত দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ কর—সে যে কি পরিমাণ নির্বোধ। শুধু নির্বোধ নয় নির্বাকও।

গোকুল রাগ করে বলল, 'কাপড় পরেছ, তবে ঘরে আসছ না কেন? ঘরে এসে দরজা দাও, ঘর ভিজে গেল জলে। কি আপদ!'

বাঁদী ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

গোকুল রাগ চড়িয়ে বলল, 'এবার ওই কোণটায় শোও, শুয়ে চোখ বোজ, চোখ বুজে ঘুমাও। আরও বলে দিতে হবে?'

বাঁদী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, অন্ধকারেও মনে হল কি যেন বলতে চায় সে।

গোকুল বলল, 'যাও, শোওগে যাও।' কিন্তু একথার পরও বাঁদী যখন নড়ল না বরং হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল দরজার পাশে গোকুলের মনে হল বাড়ির কুকুরটির মতো বাঁদীটিও তার। উঠে গিয়ে প্রদীপ তুলে সে দেখল বাঁদীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। একটা মিষ্টি কথা বললে তার প্রভুত্ব বোধ হয় খর্ব হবে না, বললে সে, 'কেঁদো না, বাপু, সবার জীবনই সুখের হয় না।'

বাঁদী উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের আলো তার সর্বাঙ্গে পড়েছে। সবজে মোটা মসলিনের অন্তরালে বাঁদীকে দেখে গোকুল নির্বাক হয়ে নিজের থুতনি চুলকাতে লাগল। হাড়ের কাঠামোর উপরে মেদমাংস লেগেছে এ খানিকটা গোকুল প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু কি বিশ্রী কি বিশ্রী করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে বলে সে কোনো দিনই এ পরিবর্তনের আভাস পায়নি। বক্ষের বৃত্তাভাস, নিতম্বের বিস্তৃতি, উরুর মসৃণতা, আর সব ছাপিয়ে তার চোখ দুটি।

গোকুল কিছু ভেবে না পেয়ে বাঁদীর হাত ধরে বলল, 'ভয় নেই তোমার।' তার মনে হল এত করুণ, এত কিশোর। এ কি কখনো ভাবা গেছে এ এত অল্পবয়সী। গোকুলের মনে হল এত স্নেহ দিতে পারে একে তবু না-হয় স্নেহের শেষ, না-হয় তা জানানো। বিছানায় বসে গোকুল তাকে পাশে বসাল। বারে বারে বলল, 'কাঁদিসনে, কাঁদিসনে।' কোথা থেকে সাহস পেয়ে বাঁদী দু-হাতে গোকুলকে আঁকড়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

সকালে তাঁতঘরে গিয়ে গোকুল প্রথমে কিছুক্ষণ এত সূক্ষ্ম কাজ করল যা জীবনে করেনি। মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানত? শিরা-উপশিরাগুলির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শ্বেত চন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে। মনের খানিকটা অংশ জুড়ে (গোকুলের মনে হল বুকে) যে শুভ্রতা কমনীয় হয়ে উঠছিল, স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল তার একবার অনুভব হল সেটা শুভ্র উরুদেশের ছায়া। ঘরে ফিরে এসে সে দেখল তার শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাঁদী। রাত্রির স্বপ্নের সঙ্গে দিনের আলোর মিল দেখে সে অবাক

হল একটু। গোকুল ফিরে গেল খানিকটা বাদে আবার ফিরে আসবার জন্য।

গোকুলের তাঁতঘর থেকে দিবারাত্রি গান শোনা যায়, যে গান গলা নিরপেক্ষ, সুর নিরপেক্ষ, চাষী হলুদে ধান কাটতে যে গান গায় কতকটা তেমনি।

অল্প বয়স যতদিন থাকে মানুষ প্রবীণ গৃহস্থের অনুকরণ করতে ভালোবাসে, যেমন ছোট-ছোট মেয়েরা করে খেলাঘরে। গৃহকর্তা হয়ে একদিন রাত্রিতে গোকুল বাঁদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শোন্ বলি তোকে। একটা জিনিস আমাদের নেই। একটা ছেলে না হলে যেন চলছে না, তাই নয়। বড় খালি-খালি, শুধু দুজন।' বাঁদী বড়-বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল মাত্র।

দু-চারদিন বাদে গোকুল কথাটা আবার বললে তাকে, বাঁদী শিউরে উঠে বললে, 'না।'

'নয় কেন?'

বাঁদী গোকুলের কাছে সরে এসে থরথর করে কেঁপে উঠল।

কথাটা গোকুল ভুলল না। কখনো বাঁদী না শুনবার ভান করে অন্য দিকে চেয়ে থাকে, কখনো গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক মিনতি করে।

বাঁদীর ছোট-খাট শরীরটার মধ্যে একটা ছোট মন আছে সেটা গোকুলের গলা শুনলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। দোকানির তাঁবুতে যত মেয়ে ছিল সবার চাইতে সে ছিল ভীরু। মানুষ দেখলে তার জিভ জড়িয়ে আসে, কথা ফোটে না, স্তম্ভিত হয়ে যায় ভিতরটা।

এক রাত্রিতে বাঁদীর করুণ দৃষ্টিতে মন ভিজল না গোকুলের, সে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। বাঁদী জানাতে চায় গোকুলকে সুখী করতে না পেরে সে দুঃখী, সেটুকু জানানোর জন্য বাঁদী শব্দ করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোকুল ধমক দিয়ে উঠল, 'কি আপদ ঘুমাতে দেবে না।'

সারা রাত বাঁদী বসে রইল, সারা রাত তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নিজের উপরেও রাগ হচ্ছিল তার।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে গোকুল পরের দিন রাগ করল না। শুধু বলল, 'আমার মনে হয়, ও তুই পারবিনে, সব মেয়ে পারে না।'

মিষ্টি কথায় বাঁদী অভিমান করে পাশ ফিরে রইল। সামান্য মাত্র, বেশি করতে সে ভয় পায়।

একদিন গোকুল নরম করে বলল, 'এই দেখ কি এনেছি, এইটে হাতে বেঁধে দিই আয়, সিদ্ধি-থানের মাটি আছে এতে, দেখি তার পরে কি হয়।'

বাঁদী উঠে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হবে ?'

'হ্যাঁরে হ্যাঁ।'

কিছুদিন পরে বাঁদী গোকুলকে নিজে থেকে বলল, 'ফকির এসেছে ও গাঁয়ের মাঠে, যাব ?'

'যাবি কেন। ও বুঝেছি। তা তোর বুঝি ভরসা নেই করচে। কিন্তু কি করে যাবি ? সে নাকি সন্ধ্যার পরে একা-একা এলো চুলে নতুন শাড়ি পরে যেতে হয়। ভয় করবে রে। ও মাঠে রাতের বেলা গাঁয়ের লোক যেতে ভয় পায়। তা আমিও না হয় কিছু দূর সঙ্গে-সঙ্গে যেতে পারি।'

'না। যেতে হয় না।'

'তাই বলেছে ওরা ? যাস তবে তাই।'

বাঁদী গিয়েছিল। নতুন শাড়ি পরে, কপালে খয়ের-টিপ এঁকে, চোখে কাজলের রেখা দিয়ে। যে রকম লোকে বলেছিল ঠিক তেমনি করে এলো চুলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হলে সে ফকিরের কাছে গিয়েছিল। যদিও বাড়ি থেকে সাত পা যাবার আগেই সে ভয়ে ঘামে নেয়ে উঠেছিল।

ভোরবেলার একটু আগে সে ফিরে এল। গোকুল আলো নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বাঁদীকে দেখে চমকে উঠল। কোথায় খয়েরের টিপ, কোথায় চোখের কাজল। পরিক্লান্ত, সর্বহারা দৃষ্টি।

আশঙ্কার সঙ্গে কিছুটা পরিহাস মিশিয়ে গোকুল বলল, 'ডাকাতের হাতে পড়েছিলি নাকি রে ?'

'না।'

'ভয় না হয় নাই পেলি, পেয়েছিস কিনা আমি জানছি। আহা-হা পড়ে গিয়েছিলি সাঁকো থেকে। ঠিক তাই, ঠোঁট কেটে গেছে, এই তো কাপড়ও ভিজে।'

'না।'

'রাগ করেছে পাগলি। সত্যিরে আমার জন্যে এত কষ্ট হল তোর।'

'না।'

গোকুল বাঁদীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল ; নতুন গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছিয়ে শাড়ি পালটিয়ে বিছানায় বসাল তাকে।

'আমি জানি। অভিমান হওয়া তোর অন্যায় নয়। আমাকে সুখী করার জন্যে তুই যে সাহস দেখালি, যে কষ্ট করলি তারপর তোকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। তুই বলেই পেরেছিস। আর কেউ তাঁতীর জন্যে এতটা করত না।'

'না, না।'

বাঁদী দু-তিন মাস কথা বলল না, ভালো করে রাঁধল না, খেল না, চুল বাঁধল না। শুধু আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে দিন কাটাল। গোকুল দূরে-দূরে থেকে ভাবল, অভিমান করবেই তো বাঁদী, সে কি সোজা কথা রাত করে ওই ভয়ের মধ্যে যাওয়া।

একদিন পাড়া থেকে বেড়িয়ে ফিরে গোকুল বলল, 'শুনেছিস, তাঁতীবউ, তোর সেই ফকিরটা মরে গেছে। গলায় বাঘে না কিসে কামড়েছিল, তার ঘাতেই দু-তিন মাস ভুগে-ভুগে মারা গেল। ভেবেছিলাম একদিন ভালো করে সিন্নি দিয়ে আসব, হল না তা।'

বাঁদী দপ করে জ্বলে উঠল, 'গোরে দেয়নি বোধহয়, যাও যাও, এখনো দিয়ে এস সিন্নি।'

'রাগ করলি তুই? দেখতো কত বড় দয়া করেছে ফকির আমাদের। মন্তরে ফল হতেও পারে তো।'

চৌকাঠ চেপে ধরে বাঁদী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন তার নিজের স্বরের তীব্রতার প্রত্যুত্তরে গোকুলের রোষের আশঙ্কায় তার মুখ বিবর্ণ হয়েছে।

কিন্তু গোকুল রাগ করল না। এমন হয় সংসারে, অনুগৃহিতার একটি মাত্র আত্মদানের ফলে তার স্থান অনুগ্রহিতার সমপর্যায়ে উঠে যায়। গোকুল অপ্রতিভ হয়ে পালিয়ে গেল।

একদিন বাঁদী কথা বলল। নিজে থেকে গোকুলকে ডেকে লজ্জায় মুখ লাল করে বলল, 'হবে, পাবে তুমি এতদিনে।'

তারপর একটু কাঁদল বাঁদী। সারা মুখ বিকৃত হয়ে দুর্বার লবণাক্ত অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

গোকুল বলল, 'কাঁদ, কাঁদ। আনন্দে কান্না পায়।'

তাঁতীদের মধ্যে যারা গোকুলকে খাতির করত তার ওস্তাদীর জন্য তারা এল। ওপাড়া থেকে জোলাদের রহিমবুড়ো এল জন কয়েক সাকরেদ নিয়ে; যে দোকান থেকে মাঝে-মাঝে গোকুলের মসলিন বিক্রি হয় ধনীদের মধ্যে এল সে।

রাঙা পাড় কোরা ঠেঁটি পরে বাঁদী (এখন সে তাঁতীবউ) বসেছে রকে। কোলে ছোট্ট ফুটফুটে, টুলটুলে একটা ছেলে। গোকুল সকলের সামনে জোড় হাত করে দাঁড়াচ্ছে। সকলে এগিয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করছে। গোকুল কারো কথা শুনল না, রহিমবুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে ছেলের মাথায় বারবার মাখিয়ে দিয়ে বলল, 'দোয়া কর, চাচামিঞা, তোমার মতো হাত হয়।' একমুখ হেসে বুড়ো বলল, 'হবে

রে হবে, বাপের বেটা হবে।'

সকলে চলে গেলে গোকুল ঘরে গিয়ে বসল। শোবার ঘরের ওদিকটায় এক-খানা নতুন কাঁঠাল কাঠের চৌকি পড়েছে—সোনার মতো রঙ তার। একরাশ রঙিন কাঁথার ভাঁজ স্তরে-স্তরে সাজানো। গোকুল পাড়ার অনেককে বানাতে দিয়েছিল, আজ নিয়ে এসেছে। তাঁতীবউ তখনও বাইরে বসে ছেলে কোলে করে। গোকুল ডাকল, 'ঘরে এস বউ, খোকনমণির ঠাণ্ডা লাগবে।'

তাঁতীবউ হাসে, তাঁতীবউ কথাও বলে।

একদিন সে ছেলে শুইয়ে এসে বসল গোকুলের পাশে।

'খুশি হয়েছ তুমি ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে এখন আর তেমন করে মনে পড়বে না, তাই নয়।'

'বাস রে কত কথা শিখেছিস তুই।'

তাঁতীবউ হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বলল, 'তুমি খুশি হলেই হল।'

দিন যায়, রাত্রি যায়। গোকুল ছোট চৌকিখানার কাছে ঘোরে আর ছেলেকে দেখে আর ষাঁড়ের মতো চেঁচায়, 'বউ দেখসে দুধ তুলছে।' কখনো বলে, 'দেয়ালা কাটছে দেখে যারে, দেখে যা।' কখনো নিজেই রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বলে, 'একটা কথা বলি, হাসবি না। খোকা আমাকে চেনে। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়ে।'

রাত্রিতেও ওই একই কথা হয়। গোকুল বলে, 'এই তো উঠে বসবে, চাঁদির একটা গোট বানিয়ে দেব। কিন্তু তোর ছেলে কি ভদ্রলোক ভেবেছিস ? ফোকলা মুখের নালে-নালে বুক ভরে রাখবে।'

সোহাগের বুক থেকে তাঁতীবউ অনুযোগ করে, 'দিনরাত তোমার ওরই কথা।'

গোকুল বলে, 'যার জন্যে ওকে পেলাম সে বুঝি ফেলনা।'

চাঁদির গোট গড়াল গোকুল, ছেলে কিন্তু উঠে বসবার কোনো লক্ষণই দেখাল না। পাঁচ মাস গেল, সাত মাস গেল, বছর ঘুরে এল, ছেলে বাড়ল না পর্যন্ত। দেখলে মনে হয় যেন কত কালের বুড়ো, হাসে না পর্যন্ত।

গোকুল বউকে ডেকে বলে, 'একি হল রে ?'

তাঁতীবউ প্রবোধ দেয়ার স্বরে বলে, 'সেরে যাবে বড় হলে দেখো।'

রাতে ছেলে ঘুমায় না। কি একটা কষ্টে সারা রাত কাঁদে, সারা রাত কাতরায়। তাঁতীবউ বাইরে নিয়ে পায়চারী করে বেড়ায়। তাঁতীও উঠে আসে।

তাঁতীবউ বলে, 'একি হল ছেলে ?'

তাঁতী বলে, 'কপাল।'

ওঝা এল। কবরেজ-হেকিম এল। চিকিৎসা হল কিন্তু সবাই যেন ছেলের ভ্রূকুটি দেখে ফিরে যায়। শেষে অনেক ধরনা দিয়ে অনেক কষ্টে গোকুল সিদ্ধস্থানের ঠাকুরাণীকে নিয়ে এল। অনেক কথা, অনেক মন্ত্র, অনেক তুক সারা সকাল, সারা দুপুর চলল। সারাদিন না খেয়ে আগুনের কাছে ঠায় বসে থেকে তখন গোকুলের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে, তাঁতীবউ ঢলে পড়েছে, দেয়ালের গায়ে। সন্ধ্যা লাগা-লাগা সময়ে সিদ্ধা মুখ খুলে বলল, 'তুই বউ বদলা, গোকুল। এ বউয়ের রিষ্টি যোগ আছে। এর কাছে ভালো ছেলে তুই সাতজন্মেও পাবি না।'

গোকুল বোধ করি ঝিমিয়ে পড়েছিল, প্রথমবারে তার কানে যায়নি কথা-গুলো। সিদ্ধা স্পষ্ট করে বলবার জন্য আবার বলল বউ বদলানোর কথা। এবার লাল চোখ মেলে গোকুল সিদ্ধার দিকে চাইল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরো, বেরো। ভণ্ডামি করার জায়গা পাওনি।'

সিদ্ধা চলে গেল। সারা দিনে স্নান খাওয়া হয়নি তবু সে রাত্রিতে খাওয়ার জন্য কেউ উঠল না। গোকুল যজ্ঞস্থান থেকে একটু সরে এসে মাটিতেই শুয়ে পড়ল। চূড়ান্ত আশাভঙ্গের এমন মূর্তি আর দেখা যায় না। তাঁতীবউ মাটির মূর্তির মতো বসে রইল। ছেলেটা রাত্রিতে কতবার কাঁদল, কেউ উঠেও দেখল না।

ব্যাপারটা গোকুলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। প্রথমে সে নিজের মন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই যা দেরি হয়েছে—তাঁতীবউ আবার বাক্‌হীনা হয়ে পড়েছে। দিনকে দিন যেন সে বোকা হয়ে যাচ্ছে। যেন সেই আগের পীড়াটাই তার ফিরে এসেছে।

তাঁতী একদিন ডেকে বলল, 'তুই কি আবার আগের মতো শুধু বোকা হয়ে থাকবি, শুধু কাঁদবি নাকি?'

তাঁতীবউ একটু হেসে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে লাগল।

'সারা রাত বসে-বসে বাতাস করবি নাকি? তার চাইতে ঘুমো না হয়। তোর মনও তো ভালো নেই। শুয়ে থাক আমার পাশে।'

তাঁতীবউ চুপ করে শুয়ে পড়ল।

গোকুল বলল, 'কেমন যেন আগের মতো, তোর নিজের ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই, শুতে বললাম আর টুপ করে শুয়ে পড়লি।'

তাঁতীবউ শত অনুরোধেও মুখ তুলল না; গোকুলের বুকে মুখ গুঁজে প্রাণপণে দু-হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল।

দিনকে দিন তাঁতীবউ শুকিয়ে যাচ্ছে। গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠে চোখ দুটিকে

আগের চাইতে বিস্তৃত করে দিয়েছে। চলে যেন না-চললে নয়, বলে যেন না-বললে নয়।

একদিন গোকুলের মাথায় খুন চেপে গেল, রাগের মাথায় সে চিৎকার করে উঠল, 'নিকুচি করি তোর চোখের, কথা বলিস না কেন? জিভ ক্ষয়ে গেছে। চুলের মুঠি ধরে বের করে দেব পাজি কোথাকার।'

তারপর কোঁচার খোঁটে চোখ মুছতে-মুছতে নিজেই বেরিয়ে যায়।

এক রাত্রিতে গোকুল শেষ চেষ্টা করবার জন্য তাঁতীবউকে ডেকে নিল। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে কোলে করে বসল। দুহাতে মুখ তুলে ধরে অনেকক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকল। তার পরে বলল, 'অন্য বউদের মতো কথা বলতে তুই জানিস না, তা জানি। তবু যেমন বলতিস তুই নিজের তৈরি একটা-দুটো কথা তেমনি বল, বলতে হবে তোকে। বল আমাকে, সত্যি করে বল, আর ভালো লাগে না আমাকে।'

'লাগে।'

'লাগে তো? তবে কেন অমন করিস? এ ঘর সংসার কি তোর নয়?'

তাঁতীবউয়ের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

গোকুল ব্যাকুল হয়ে বলল, 'বল, যা বলতে চাচ্ছিস বল।'

তাঁতীবউ বলল, 'বউ বদলাও।'

প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তারপর হো-হো করে হেসে উঠল, খুব হাসির কথা যেমন বারবার আবৃত্তি করে তেমনি করে গোকুল বলতে লাগল, 'বউ বদলা, বউ বদলা···ঘুমা তুই, বদলাতে হয় কিনা সে আমি জানি। এই ভেবে বুঝি দিনকে দিন বোকা হয়ে যাচ্ছিস।'

আর একবার কবরেজ, গুণিন্ ওঝা নিয়ে মেতে উঠল গোকুল। একে পায় তো ওকে ছাড়ে, ওর খ্যাতি শোনে তো ছুটে যায়, ওর একটু দুর্নাম শোনে তো ছাড়িয়ে দেয় ওকে। ছেলেটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে আর বউকে ডেকে বলে, 'একটু উন্নতি হয়েছে, নারে?' বউ সাড়া দেয় না; সাড়া না দিলেও সে নিজেই বুঝতে পারে উন্নতি কিছুমাত্র হয়নি।

এমনি করে ছেলেকে দেখতে-দেখতে একদিন গোকুলের খুন চেপে গেল মাথায় আবার। 'হারামজাদা পাজি, ভাগাড়ের শকুন, বাঁদরের বাচ্চা কোথাকার'। যেমন দেবতা তার বরও তেমনি। অমন মরকুটে ফকির না হলে এমন ফল হয় তার মন্তরে।'

ক্ষুদ্র প্রাণীটির জ্বালাময় নিদ্রাহীন আলো অন্ধকারের অভিজ্ঞতার হয়তো সে-

দিনই শেষ হয়ে যেত, যদি নিজের কথাগুলি কানে যেতে কানে আঙুল দিয়ে গোকুল ছুটে না পালাত।

সারাদিন এদিক-ওদিক কাটিয়ে গোকুল সন্ধ্যার পরে ফিরে এল। একটুখানি জোছনা উঠেছে সেদিন। উঠানে দাঁড়াতেই তাঁতীবউকে দেখতে পাওয়া গেল। জোছনার এক ফালির মাঝখানে সে বসে আছে, শান্তস্থির পটের ছবির মতো। স্নিগ্ধতার আশ্বাসে পায়ে-পায়ে গিয়ে গোকুল বসল তার পাশে। সকালের তাণ্ডবের জন্য তার অনুতাপের অবধি নেই।

'ও বউ, কথা বল, তোর পায়ে ধরি। আমার দোষ—সব, বুঝতে পেরেছি। তোর দিকে আমি চেয়েও দেখিনি।'

'কি বলব বল।'

'কিছু কি তোর বলবার নেই? আমি কাছে এলেই তোর এত কষ্ট? আচ্ছা আমি যাই।'

'না যাসনে। আজ একটা কথা বলব তোমাকে। ও কোনোদিনই ভালো হবে না। ওর দোষ নয়, তোমার দোষ নয়। বোধহয়—'

'কি বোধহয়?'

'বোধহয় আমার রিষ্টি যোগ আছে।' কথাটা বলতে গিয়ে অস্ফুট কান্নায় তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল।

কথাটা নতুন নয়। অনেক আড়ম্বর করে, এর চাইতে অনেক দৃঢ় স্বরে সিদ্ধা বলেছিল। কিন্তু বাক্ বিহীনার স্বরে এমন সব আশা নষ্ট হওয়ার স্বর ছিল যে গোকুল আহতের মতো খাড়া হয়ে বসল।

'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ সত্যি। ওরা বলে—আমার মনে হয়...'

'ওরা ভুয়া দেয়। তাহলে আর আমি জানতাম না?'

'না জানতে না। আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, যে দিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

'তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ।' তাঁতীবউ উঠে দাঁড়াল যেন সে তখনই যাত্রা শুরু করবে।

পরদিন সকালে উঠে গোকুলকে দেখা গেল না, তার পরদিনও না, তারপরও না। তাঁতীবউ বড় কান্নাই কাঁদল। দুদিন সে উঠল না, রাঁধল না, খেল না। মাঝে মাঝে শুকিয়ে ওঠা স্তনটা শিশুর মুখে গুঁজে দিয়ে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করে। অনাহারের অবসাদে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে তাকে তাও যেন সে বুঝতে পারে

না। গোকুলের মুখ মনে পড়ে আর সব কিছু অন্ধকার হয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু দুঃখে পাথর হয়ে যেতে-যেতে তাকে এক সময়ে নড়ে উঠতে হল। পেটের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে বলেই রান্নাঘরের দরজা খুলতে হল তাকে। কিন্তু গোকুল নেই, কে তাকে বলবে রান্না করতে যেতে, কখন কি করতে হবে। অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া শিশুর মতো ভয়ে নিচুস্বরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

দুঃখের গভীরতা যখন বেড়ে যায় তখন সে আঁ-আঁ করে কাঁদে। এক-একদিন সন্ধ্যায় বর্ষা নামে। বর্ষার শব্দের মধ্যে তার বোবা কান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে এমন দু-একজন তার কান্না শুনে তাড়াতাড়ি হেঁটে গোকুলের বাড়িটা পার হয়ে যায়।

তারা বলাবলি করে কোনো দিন, 'গোকুলের বাঁদীটা বুঝি। গোকুল গেছে বিয়ে করতে শুনলাম। তা হবে। বেচারার বড় কষ্ট। একা-একা ভয়-ভয় করে বোধহয়।'

গোকুলের নাম শুনে তাঁতীবউ উঠে যায় ভালো করে শুনবার জন্য। শুনতে পায়—গোকুল গেছে বিয়ে করতে।

আকস্মিক আঘাত পাবার মতো একটা অস্ফুট শব্দ করে তাঁতীবউ সরে আসে জানলা থেকে।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গা ধুয়ে সে গোকুলের দেয়া ভালো শাড়িগুলো বের করে পরে। কপালে টিপ আঁকে, বিনুনি করে পিঠে ঝুলিয়ে দেয় চুল। খোঁপা বাঁধে না, গোকুল পছন্দ করত না। তারপর বারান্দায় গিয়ে বসে প্রতীক্ষায়। গোকুল হাটে যাবার সময়ে এমনি করতে বলে যেত তাকে। কাজ করতে-করতে থেমে গিয়ে সে ভাবে—গোকুল কোন কাজটা কি রকম করে করতে বলে দিয়েছিল। ঠিক তাই করে সে।

কোনো-কোনো দিন সে ভাবে শুয়ে-শুয়ে, যদি কোনো দেবতা বর দিতো তাকে! এমন কি হয় না কোনো গুণিন এসে দু-হাতে তুলে একটা সন্তান তাকে দিয়ে যায়, একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটা ছেলে। দু-হাত ভরে নেয় সে তাহলে। বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে ওঠে তার। ঘুমন্ত রুগ্ন কঙ্কালসার ছেলেটাকে তুলে নিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়। কিন্তু সেও যদি ফকিরের মতো হয়। কথাটা মনে হতেই তাঁতীবউ আড়ষ্ট হয়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে, গা ঘিন্-ঘিন্ করে ওঠে। ছেলেটাকে দুম্ করে বিছানায় ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মরেছে মরেছে, বেশ হয়েছে। বাঘের কামড়ে গলা ফুটো হয়ে মরেছে। তাঁতীবউয়ের

চোখ দুটি শ্বাপদ হিংসায় চকচক করে ওঠে। রক্তে মুখ ভরে উঠল ভেবে—থু-থু করে উঠল তাঁতীবউ। না দরকার নেই। কোনো গুণীর কাছে সে বর চায় না। শুধু গোকুল ফিরে আসুক। সে যদি বউ নিয়ে আসে, তাও আসুক।

তবু এক-একদিন স্বপ্নে দেখে সে একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটি ছেলেকে।

রাত্রির উঠোনে তাকাতে তার ভয় করে, তবু খুট করে একটু শব্দ হলেই সে উঠে যায় দরজার কাছে। মাঝরাতে উঠে বসে একদিন তার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। যদি তাঁতী ফিরে গিয়ে থাকে তার সাড়া না-পেয়ে। সেদিন থেকে সে দরজা খুলে রাখল। বিছানায় শুয়ে সে সারা-রাত ঘুমোতে পারল না। দরজা বন্ধ ঘরে গোকুলের পাশে শুয়েও যার ভয় যায় না, সেই আজ দরজা খুলে রেখেছে।

একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। গোকুলের প্রত্যাশায় বসে থেকে-থেকে মাঝরাতে ঘুমে গা এলিয়ে এসেছে, বসে-বসে ঢুলছে তাঁতীবউ—এমন সময়ে উঠোনে পায়ের শব্দ হল যেন। তাঁতীবউয়ের মনে হল সে বলবে—এস, আমি তোমার জন্যে জেগে আছি দেখ। আজই শুধু নয়। পাছে ফিরে যাও বলে প্রদীপ জেলে রেখেছি, দরজা খুলে রেখেছি। কিন্তু কথা বলা হল না। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসে দম বন্ধ করে দিল যেন। মনে হল কাঁদতে না পারলে সে মরে যাবে, তবু কাঁদল না। দেখবে সে প্রথম মুহূর্তেই তার তাঁতীকে, পোড়া চোখ বার-বার করে মুছতে লাগল।

কিন্তু পায়ের শব্দ যখন একেবারে তার পাশে এসে থামল তখন সে মুখ তুলতেও পারল না। একটা সুন্দর সুবাস আসছে, তাঁতীবউ ভাবল—সুখে ছিল গোকুল তাই। কিন্তু অভিমান সে করবে না, মান করা তার সাজে না—কি আছে তার গরবী হওয়ার।

মুখ তুলে তাঁতীবউ বিস্ময়ে অভিনবত্বে দিশেহারা হয়ে গেল। স্বপ্নের মধ্যে যেন সে ভাবল—তুমি দেবতা, তুমি এলে। আমার দুঃখ, তাঁতীর দুঃখ, ওই ছেলেটির দুঃখ সব মিলে তোমাকে টেনে এনেছে। তাই এত সুবাস, তাই এত সুন্দর তুমি। তোমার মুখের দিকে চাইবার সাহস নেই আমার। তুমি তো আমার মনের কথা জানো।

অনভ্যস্ত কথা বলার পরিশ্রমেই যেন তাঁতীবউ হাঁপাতে লাগল। 'শোন, তাঁতী-বউ, গোকুল ফিরবে না। তুই এত দুঃখ করবি কেন ? আর গোকুল যদি ফেরেই কখনো যা দিয়ে তোকে সে কিনেছে তার চাইতে দশগুণ আমি তাকে দিয়ে দেব। বুঝতে পেরেছিস আমার কথা ? আজই নয়...। চিনিস তো আমাকে, রাজবাড়িতে

দেখেছিসও বোধহয়।'

দেবমূর্তি সাপ হয়ে কামড়ালেও তাঁতীবউ এতটা শিউরে উঠত না। পলকে দূরে সরে গিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পৃথিবী তখনো পায়ের তলায় দুলছে। তীব্র রূঢ় দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রাগ করে কি বলতে গেল সে, কিন্তু অসীম ঘৃণায় সে বারবার বলল, 'ছি-ছি তোমাকে দেবতা বলেছি, ছি-ছি-ছি!'

'শোন, তাঁতীবউ ভেবে দেখ্। সময় নে।'

'ছি-ছি-ছি-ছি।'

আগন্তুক কখন চলে গেল, কে তাকে তাড়িয়ে দিল এসব কিছু মনে নেই তাঁতী-বউয়ের। প্রথম সাধারণ বোধ ফিরে আসতেই ভয়ের একটা আর্তশব্দ করে উঠে গিয়ে দরজার খিলগুলো এঁটে দিল সে।

এর বোধহয় প্রয়োজন ছিল। এমন বেহুঁস হয়ে, এমন কোমল প্রাণ নিয়ে যারা চলে, তারা না-পারে নিজে বাঁচতে না-পারে অন্যকে প্রাণ দিতে। ভয় যতক্ষণ না-আসে ততক্ষণ তার আশঙ্কা এমন আড়ষ্ট করে রাখে যে নিজেকে পিঁপড়ের মতো তুচ্ছ মনে হয়। ভয় এসে চলে গেলে আশঙ্কাটা কমে যায়, কিছুটা আত্মবিশ্বাসও আসে।

প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তাঁতীবউকে তার উঠোনের পৃথিবীর বাইরে পা দিতে হয়েছে। হঠাৎ কারো কথা শুনলে যার প্রাণ সুদ্ধ আড়ষ্ট হয়ে যেত এখন সে হাটে যায়। অপরিচিত দোকানির সঙ্গে দামদস্তুর করতে হয়। পয়সা উপার্জনের ফিকির সে নিজেই বার করেছে। জোলারা আসে তার কাটা সুতো নিতে। পাকা কার-বারির মতো সে বাকিতে মাল দেয় না, কথার খেলাপ করে না।

কখনো-কখনো সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গোকুলকে নিয়েও আলাপ হয়। মেয়ে-দের কাছে সে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করে এরকম অবস্থা হলে তাদের স্বামীরা কি করত। কেউ বলে—ফিরবে একদিন, এই রূপ ফেলে কেউ থাকতে পারে। সেদিন রাত্রিতে গোকুলের দেওয়া মসলিন পরে আরসি ধরে নিজেকে দেখে তার অবাক লাগে—তা কি হয়, এর জন্য কখনো কেউ ফেরে যদি এতদিনের এত কান্না তাকে ফেরাতে না-পেরে থাকে। অন্যদিন কেউ বলে—দেখ, কোথায় আবার বিয়ে-সাদি করেছে। সেদিন রাত্রিতে আরসির সামনে বসে সে ভাবে—কিছুই তো বদ-লায়নি। যেদিন প্রথম গোকুল তাকে বলেছিল—তোকে না হলে আমার চলবে না, সেদিনকার মতোই তো সব আছে। সে ভাবে—এ সবের জন্যই দায়ী সে। গোকুলকে সে নিজে ঠেলে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। কিন্তু সে তো তখন বুঝতে পারেনি তাঁতী আর কাউকে বিয়ে করলে কত কষ্ট। আর কি বোকা ছিল

সে। গোকুল কথা বলতে যত অনুরোধ করত তাকে, তখন সে নির্বাক হয়ে যেত। এখন যখন মেয়েরা বলে রাত্রিতে কে কি বলেছে স্বামীকে তখন সে শোনে আর অবাক হয়ে যায়—এদের চাইতে অনেক মিষ্টি কথাই তো গোকুলকে সে বলতে পারত, গোকুলের কাছে গেলে মনেও হত।

তার ছেলেটা এখন হামা টানতে শিখেছে। হোক অনেক দেরিতে তবু শিখেছে তো। পাড়ার সব ছেলেমেয়েগুলি এমন কিছু সুন্দর নয়, সবলও নয় সবগুলি। গোকুল এলে এসব সে বুঝিয়ে বলবে, গোকুল তো বোকা নয়, সে বুঝবে। সুন্দর ছেলে-মেয়েও আছে। এই তো সেদিন গাজনের মেলা থেকে সন্ধ্যার একটু আগে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে ফিরতে-ফিরতে দুটি ছোট-ছোট ছেলেকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কার ছেলে গো? নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকেও সাধ মেটে না তার। ঠিক এমনি চেয়েছিল গোকুল। এগিয়ে গিয়ে ছেলে দুটির সঙ্গের ঝিটিকে জিজ্ঞাসাও করেছিল সে। কিন্তু নাম শুনবার পর তার মনে হল যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। রক্তহীন মুখে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

সেদিনকার রাত্রির কথা মনে পড়ল। তেমনি চোখ, এখনি যেন তেমনি ক্ষুধাতুর হয়ে জ্বলে উঠবে।

কিন্তু সত্যি দেবশিশুর মতো দেখায় ছেলে দুটিকে।

সহযাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'কি যেন লাগল পায়ে।'

কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষের মন। সেখানে একটা ক্লেদাক্ত আবিল সম্ভাবনা কি করে বাসা বাঁধল কখন। তাকে অস্বীকার করার জন্য তাঁতীবউ সারা পথ সারা মন দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল—চাই না, চাই না, ছি-ছি-ছি। বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করল।

একদিন গোকুল ফিরে এল। তাঁতীবউ বসে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, এমন সময়ে গোকুল এসে দাঁড়াল তার পিঠের কাছে। তাঁতীবউ উঠে দাঁড়াল, কাঁদল না, বোকার মতো চেয়ে থাকল না, একটা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বস, হাত ধুয়ে আসি।'

হাত ধুয়ে আসতে একটু দেরি হল। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে হয়তো বা একটু কেঁদেছিল সে, অনেক দিনের অভ্যাস তো। মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে এসে পাখা নিয়ে তাঁতীর পাশে বসে বাতাস করতে-করতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ছিলে এতদিন, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? খাওয়া-দাওয়া ভালো হত না?'

কিছুক্ষণ পরে বলল, 'ভালো মন আমার, এতদিন পরে এলে প্রণাম করতেও

ভুলে গেছি।'

নিচু হয়ে তাঁতীর ধুলোভরা পা বুকের পরে চেপে ধরল। গোকুল ক্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, অন্ত খুঁজে পায় না।

তাঁতীকে সেধে-সেধে খাইয়ে ঘরে নিয়ে এসে বসল সে, যেন তার বাড়িতে গোকুল অতিথি। এক সময়ে হাসতে-হাসতে সে বলল, 'আমারই জিত হল দেখ। কই পারল ডাকিনীরা ধরে রাখতে আমার তাঁতীকে?' তাঁতী মুখ নিচু করে থাকে। দু-হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে তাঁতীবউ যেমন গোকুল এককালে তার ধরত।

কাজ করতে-করতে ফিরে এসে তাঁতীবউ বলে, 'কিন্তু ওরা কি লোক গো!'

'কারা?'

'তোমার সেই ডাকিনীরা যারা তোমাকে ধরে রেখেছিল। তারা কি শুধু ছলাই জানে? পুরুষটাকে কি খেতেও দিতে নেই!'

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে দেরি করে তাঁতীবউ ঘরে এল। গোকুল দেখে অবাক—মসলিন পরেছে তাঁতীবউ, চোখে কাজল। অথচ এ সবের জন্য অনুনয় বিনয় করে-করে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি করেছে এককালে। তাঁতীবউ মুচকি হেসে গোকুলের কোলে গিয়ে বসল, নিজে সেধে মুখের পরে মুখ নামিয়ে আনল।

'একি গা পুড়ে যাচ্ছে যেন, জর হয়েছে তোমার?'

'হয়।'

'রোজ হয় জর? কি সর্বনাশ। কি করে হল?'

'জানিনে, রোজই হয়, বড় কষ্ট হয়রে।'

তাঁতীবউ লজ্জায় যেন মরে গেল, সজ্জা তার গায়ে পুড়ে উঠল। মসলিন ছেড়ে ঠেটি পরে সে ফিরে এল বিছানায়। তাঁতীকে নিজের পাশে শুইয়ে বলল, 'কষ্ট হচ্ছে মাথায়?'

'হ্যাঁ।'

তাঁতীবউ ভেবে পায় না কি করবে। বুকের মধ্যে তাঁতীর মাথাটা টেনে এনে বলল, 'এখানে চোখ বুজে থাক্, ঘুমিয়ে পড়বি।'

'আমি কি বাঁচব না বউ,' গোকুল ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ছোট ছেলের মতো তাঁতীকে টেনে নিয়ে তাঁতীবউ বলে, 'ষাট, ষাট!'

একটু হাসি পায় গোকুলের, বলে, 'তুই যেন মা হলি। আমি সেরে উঠব। তোর কাছে থাকলে সেরে উঠব।'

কবরেজের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে ওষুধ এনে দেয় তাঁতীবউ, সারাদিন চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁতীকে। অবোধ শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে রাখে বুকের কাছে। কিন্তু জর তবু কমল না, সন্ধ্যা হতেই জর আসে। হাড্ডিসার হয়ে গেছে তাঁতী। তাঁতীবউ ভেবে পায় না—কি করে এমন হল, কিসে সারে।

মাঝে-মাঝে মনে হয় তার মনের দুঃখেই এমন গা পুড়ে যায়। গত দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তাঁতীর কোনো সাধই সে পূরণ করতে পারেনি। ভাবে, তাঁতী যদি নাই বাঁচে?

একদিন রাত্রিতে ঘুম ভেঙে তাঁতী দেখল বউ বসে-বসে নিঃশব্দে কাঁদছে।

'কাঁদছিস তুই?'

'দূর, কই না, কাঁদব কেন?'

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে তাঁতীবউ। বলে, 'ঘুমাও লক্ষ্মীটি, আমি হাত বুলিয়ে দিই।'

'কত তো দিলি।'

'সে কি বেশি কথা নাকি? তোর তো কোনো সাধই মিটল না আমাকে দিয়ে।'

'সব মিটেছে এতদিনে।'

তাঁতীবউয়ের ঠোঁট কাঁপল—একটা ছেলে চেয়েছিল, তাও পারলাম না দিতে। নীরবতার ফাঁকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

তাঁতীবউ ভাবে—এর চাইতে অনেক ভালো হত যদি গোকুল আগেকার মতো গঞ্জনা দিত তাকে। গোকুলের প্রভাহীন চোখ দুটির দিকে চেয়ে-চেয়ে সে ভাবে চোখের চারিদিকের ওই কালো ও যেন গোকুলের মনের ছাপ, সেখানে আশা নেই, শুধু অন্ধকার। শুধু একটা মূক অভিযোগ। সংসার করার সামান্য সাধও মেটেনি। গোকুল মুখ ফুটে তো বলেই না, জিজ্ঞাসা করলেও অস্বীকার করে পাছে তার মনে ব্যথা লাগে। সে এত ভালো বলেই না এত কষ্ট তার জন্য তাঁতীবউয়ের।

চার-পাঁচদিন খুব বেশি জর হওয়ার পর সেরাত্রিতে গোকুলের জর কম।

'আজ ঘুমাতে পারব, তুইও ঘুমিয়ে নে একটু'—এই বলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁতীবউয়ের ঘুম এল না।

বাইরে ভাদ্রমাসের আকাশ থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে-থেকে বাতাসের সঙ্গে ঝরঝর করেও পড়ছে। ওপাশের বিছানায় ছেলেটা কেঁদে উঠল। গোকুলের মুঠি থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁতীবউ উঠে দাঁড়াল। ছেলেটাকে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। একটা সুস্থ সবল ছেলে কেন তার কোলে এল না? গাজনতলার হাটে দেখা ছেলেদের মতো একটা পেলে

গোকুল হয়তো বাঁচবার জোর পেত। এত নিবিড় করে সে গোকুলকে সুখী করতে চায় তবু কেন পারবে না সে। তাঁবুর অন্ধকারে গোকুলকে দেখবার প্রথম দিন থেকে সবগুলো দিনের ছবি একটার পর একটা যেন বাইরের নিবিড় অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠতে থাকে। কত সাহস তার হয়েছিল যেদিন অন্ধকারের আড়ালে সে ফকিরের কাছে গিয়েছিল মন্তর আনতে। সে কি তার সাহস—সে তো প্রাণপণে গোকুলকে সুখী করার চেষ্টা। তারপর একদিন গোকুল চলে গেল। গোকুলের জন্য প্রতীক্ষার দিবারাত্রিগুলির কথা ভাবতে গিয়েই মনে হল তার সেই রাত্রির কথা যার স্মৃতিতে পৃথিবী ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। ছি-ছি, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষের মন: গাজনতলার হাটে দেবশিশুর মতো ছেলে দুটিকে দেখবার পর তাদের পরিচয় পাবার পর মুহূর্তের জন্য যে সম্ভাবনার কল্পনাতে ঘৃণায় শিউরে উঠেছিল তার মন, আজ তেমনি সম্ভাবনার ইঙ্গিতটিই তাকে দিশেহারা করে দিল। ছি-ছি-ছি, তবু তেমনি ফুটে উঠতে লাগল কল্পনাটা।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল। অন্ধকারের বুকে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা কি এমন করে চোখে দেখবার মতো হয়ে ফুটে ওঠে? যেন ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোর কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, বাকিটুকু ঘটবেই। ভবিষ্যতের তাঁতীবউ যেন অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠেছে।

জানলা থেকে ফিরে এসে তাঁতীবউ ঠেঁটি পালটে মসলিন পরল, কপালে টিপ দিল, চোখে আঁকল কাজল। আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের বুকে ফুটে ওঠা ভবিষ্যতের ওই অর্ধপরিচিত মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করল। রুক্ষ ভাস্বর রিক্ততায় সে যেন জলতে-জলতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল তাঁতীবউ। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ঝরঝর করে উঠল উঠোনের পারের আমগাছটার মধ্যে। তাঁতীবউ উঠোন পার হল, সদর পার হল, সদরের দরজা ঠেলে বন্ধ করে দাঁড়াল পথে। অন্ধকারে সামনে পিছনে একাকার হয়ে গেছে। সামনে তবু নজর চলে। পিছনের যে দরজাটা এইমাত্র সে বন্ধ করে দিল হাতড়েও সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাঢ় অন্ধকারে আর সব অনুভূতি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, একটা অনির্দিষ্ট প্রাবল্যে উদরের অন্ত্রগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে বারে-বারে।

জমিদার-বাড়ির বাগান পার হয়ে এল তাঁতীবউ। গ্রামের বউঝিদের কৌতূহল ও আতঙ্কের গল্প শুনে-শুনে সে জানে কোথায় সে ঘরটি। প্রতিবার পা ফেলতে সারা গায়ের স্নায়ুগুলো রিন-রিন করে উঠছে। রুদ্ধ দরজার ফাঁকে, আধ-খোলা

জানলায় একটু আলো চোখে পড়ল। দরজা ধরে দম নিতে লাগল তাঁতীবউ। তার একবার মনে হয়েছিল কেঁদে ফেলবে সে। একটা অস্ফুট অর্ধজান্তব আকৃতি যেন দরজায় করাঘাত করল তার মনের মধ্যে। কি করে দরজা খুলে গেল তাঁতীবউয়ের মনে নেই। প্রবল প্রতিরোধে হৃৎপিণ্ডকে ঠেলে উঠতে না দিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে।

বর্ষণক্ষান্ত আকাশে ভোরের পাখি ডেকে ওঠার আগে সে ফিরে এল। ঘরে তখনো প্রদীপটি জ্বলছে, যেমন সে জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। ছেলেটি এখনই জেগে উঠবে। তার আগে একটু বিশ্রাম করতে হবে। স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানি দেখবার লোভ হল তার। ঘুমটা আজ ভালোই হচ্ছে গোকুলের। কয়েক বিন্দু স্বেদ যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তাঁতীবউ। এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলেও সময় নষ্ট হবে খানিকটা। সকলেরই বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে, তারও আছে।

মাটিতে শুয়ে দেখতে-দেখতে তাঁতীবউ ঘুমিয়ে পড়ল।

দুলারহিন্‌দের উপকথা

এই একটা দেশ। সব চাইতে কাছের রেলপথ পঁচিশ ক্রোশ দূর দিয়ে গেছে। বহু বহু ক্রোশ চললেও কৃষকের দেশ শেষ হয় না। মকাই-জোয়ারের দেশ। বৃত্তের পরিধির মতো পাহাড় এবং শাল-মহুয়ার বন। সেই পাহাড় এবং অরণ্য যদি পায়ে হেঁটে পার হও তবে সভ্যতার প্রান্তগুলি চোখে পড়তে পারে।

সেই দেশে ভুখন কৃষকের জমিতে মজুরের কাজ করে, ভইসা টহলায়।

ভুখন একা নয়, তার সঙ্গে দুলারহিন্‌-ও থাকে। ভুখন আর দুলারহিন্‌ নিজেদের ভাইবোন ব'লে ভাবতে শিখেছে। ওরা সহোদর নয়। ভুখনের মায়ের মৃত্যুর পরে ভুখনের বাবা সর্বস্বান্ত হ'য়ে যাকে ঘরে এনেছিলো তারই এপক্ষের মেয়ে কিম্বা বেটা-বউ দুলারহিন্‌।

দুলারহিন্‌ যখন এই কুঁড়েটিতে প্রথম আসে তখন ভুখনের বয়স ছ' বছর, দুলারহিনের নিজের আট দশ হবে। দুলারহিন্‌ ভুখনের বাবা ও তার সৎমাকে ভুখনের মতোই বাবা-মা বলতো। ভুখনের যখন আট বছর এবং দুলারহিনের বছর বারো প্রায় একদিনেই এই কুঁড়ের বাপ-মা প্রাণী দুটি বিদায় নিলো। এখন এমন কেউ নেই যে ওদের সম্বন্ধের জট খুলে দিতে পারে।

ভুখনের বয়স এখন একুশ বাইশ হ'লো, দুলারহিনের আরও দু'বছর বেশী। প্রায় পনেরো বছর গড়িয়ে গেছে ওদের জীবনের। যাদের সম্বন্ধ নিয়ে এত খুঁটিনাটি তাদের জীবনের পনেরোটা বছর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কি যুক্তি? বিশ্বাস করো, এ সময়ের মধ্যে কিছু ঘটে নি।

ভুখনের চেহারা নিম্ন প্রকারের: তামা ও ছাই রঙে মিশানো একটা রঙের ত্বক্‌। স্ফীতপেশী দেহ, মস্ত বড় মুখে ছোট একটা নাক। মাথার চুলগুলি ধুলোয় কটা, আর সেই খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট চুলের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গোছা কড়কড়ে টিকি। পরনে দেড়হাত চওড়া কাপড়ের ফালি কতকটা পালোয়ানী ঢঙে পরা।

দুলারহিনের স্বাস্থ্য ভালো। বয়সের চাপে ত্বক্‌ যেন ফেটে যাবে। তার মুখাবয়বেও শাস্ত্রোক্ত সৌন্দর্য আছে বলা যায় না। গত পনেরো বছরের একটি মাত্র ঘটনা—তার বসন্ত হয়েছিলো। দাগ রেখে গেছে। তার ফলে ফুটকিতে আচ্ছন্ন

তার মুখ বেলে পাথরের বহু পুরাতন প্রতিমূর্তির মতো।

ওদের সংসার মন্দ চলছিলো না। সংসারে লোক বাড়বে এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। ভুখন বিয়ে করতে পারছে না, অন্তত তিন কুড়ি টাকা লাগবে যে কোন রকম একটা বিয়ে করতে, তার কমে কে মেয়ে ছাড়ে কিম্বা বোন। সদ্ভাবেই দিন যাচ্ছিলো।

এমন নয় যে ঝগড়া হয় না, হয়, ইতিমধ্যেই একদিন হ'য়ে গেলো। একই কুঁড়ের মেঝেতে খেজুর পাতার দু'খানা চাটাই পেতে শোওয়া। বাপ-মা চ'লে যাওয়ার পরে ভুখন বহুকাল দুলারহিনের বক্ষলগ্ন হ'য়ে ঘুমিয়েছে, ইদানীং ছোট জায়গায় শুতে ভুখনের অসুবিধা হ'তো, অতবড় হাত পা গুলোকে দুমড়ে ছোট ক'রে সে এখন ঘুমোতে পারে না। কিন্তু এক রাত্রিতে সে খুব বেকায়দায় প'ড়ে গেলো। চাল ফুটো করা, বর্ষায় তার অংশের মেঝেটুকু কাদা হ'য়ে আছে। সে ভাবলো দু' একরাত তার মস্ত শরীরটাকে গুটিয়ে কোন প্রকারে দুলারহিনের পাশেই কাটিয়ে দেবে, কিন্তু আপত্তি তুললো দুলারহিন্, নেহিন্।—দেখ, দুলারী, দুলারি করো না। এমন অবস্থা নয় আমার একদিনে চালটা সারিয়ে নেবো। দু' একদিনই তো অসুবিধা হবে আমার, সে কিছু নয়।

দুলারহিন্ ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কুঁড়ের শুকনো জায়গাটায় ভুখনের চাটাই পেতে দিয়ে ঘরের ঝাঁপ তুলে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। রাগে ভুখনের ঘাড়ের শিরাগুলি অবধি ফুলে উঠলো। লাফিয়ে গিয়ে দুলারহিনের কাঁধ দুটো তার দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরলো। দুলারহিন্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো,—ছোড়দে, বহিনকো ছোড়দে। কি আশ্চর্য! বহিন ব'লেই না ভুখনের এত রাগ—অভিমান। এই বাদলা রাতে বাইরে থাকা কত কষ্টের তা বোঝে ব'লেই না এত পীড়াপীড়ি করা। বেটাছেলে বাড়ির মালিক ভুখনের দায়িত্ব-জ্ঞানকে অপমান করা দুলারহিনের উচিত নয় অন্য বিষয়ে সে যত ছেলেমানুষি করতে চায় করুক।

—যা ইচ্ছা হয় কর, শুধু কাঁদিস্ না।

হাল ছেড়ে ভুখন শুয়ে পড়লো।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলে না বেটাছেলের। কাঁচা কাঁচাই হোক, আহারের সংস্থান না করেও কাঁচা কাশ কেটে বোঝা বোঝা মাথায় ব'য়ে এনে স্তূপাকার ক'রে ফেললো ভুখন কুঁড়ের সামনে। তারপর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, অনেক রাত অবধি অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ব'সে নতুন ক'রে চাল ছাইলো ভুখন।

দুলারহিন্ একদিন বললো,—ঘর ছেয়েছিস, এবার সাদি কর।

—তা হ'লে তুইও একটা কাস্তে নিয়ে চল।

—কাস্তে দিয়ে আবার কি হবে?

—কেন দু'জনে মেলা মেলা ঘাস কাটবো।

—ঘাস কাটবি কেন? আমি তো তোকে সাদি করতে বললাম।

—আমি ভাবলাম ও দুটো একই কাজ।

কিন্তু সহজে ভুলবার মেয়ে নয় দুলারহিন্। যখন তখন একই কথা বলতে লাগলো। অবশেষে একদিন বললো,—পৃথিবীতে চাঁদ আর সুরয ছাড়া আর কে আছে তাদের? বাপ—মা কোথায় গেলো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বেলায় ভুখন যদি বিয়ে করে, কম দামে মেয়ে পাবে, বুড়ো হ'লে বুড়ী ছাড়া আর যা পাবে তার জন্য চড়া দাম দিতে হবে না? আর সব কথার উপরে বড় কথা: একজনের মৃত্যুর পরে আর একজনের কি উপায় হবে যদি ইতিমধ্যে তৃতীয় একজন এসে আপন না হয়ে যায়?

মুখ গম্ভীর ক'রে বুড়োদের মতো চিন্তাক্লিষ্ট মুখ ক'রে ভুখন শুনলো সব যুক্তি, তারপরে বললো,—টাকা যদি যোগাড় হয় সাদি করবো, কিন্তু বউ যদি তোর সঙ্গে মারামারি করে তবে আমি কিন্তু দু'জনকেই পিটবো।

টাকা জমানোর চেষ্টায় মানুষ কি না করে? এমন কি হঠাৎ মানুষ নিজের একটা বিশেষ গুণও আবিষ্কার করতে পারে। এই রকমভাবে ভুখন কাঠের পুতুল গড়ায় মন দিলো।

ওস্তাদের বাড়িটা ছিলো ভুখনের ঘরের কাছেই। ভুখন মাঝে মাঝে শীতকালে আগুনের কাছে বসতে তার বাড়িতে যেতো। ব'সে ব'সে দেখতে দেখতে ভুখন একটা পুতুল একদিন বানিয়ে ফেলেছিলো। কাঠের এক চিড়িয়া। টাকা জমানোর কথায় ভুখনের মনে হ'লো পুতুল তৈরির কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে সে মনঃস্থির ক'রে ফেললো। ওস্তাদ যে সব বড় বড় পুতুল তৈরি করে সেই সব চিড়িয়া, জানোয়ার, আদমি-জনানা সে ছোট ছোট ক'রে তৈরি করবে। বিক্রির ভার ওস্তাদের।

—আর শোন, দুলারহিন্, এ পয়সা দিয়ে খাওয়া চলবে না। খাওয়ার জন্য সকাল-সাঁঝ খেতির কাজে যা হয় তাই।

পুতুল বিক্রির খুচরো পয়সাগুলি রোজ সন্ধ্যায় গুণতে বসে দুজনে। একদিন থাক থাক ক'রে সাজিয়ে রেখে ভুখন এমন চিৎকার ক'রে উঠলো যে দুলারহিন্ ভয়ে বাঁচে না। ছুটে কাছে এসে ভুখন বললো—যোড় বৌ, কুড়িসে চার কম, ত্রিপ চার।

ওদের জীবন ঠিক এরকম সময়ে একটা মোড় নিলো। সন্ধ্যায় ব'সে কথা হচ্ছিলো। ভুখন বললো,—যব্ তক্ শশুরা লোহার বাক্সা একটা না দেবে, ততক্ষণ কোন শশুরাকে পুতই খিচুড়ি খাবে না। অর্থাৎ বিবাহ-ব্যাপারটা সমাধা হ'তে সে দেবে না।

অযুক্তির কথা নয়, ভাবলো দুলারহিন্, হয়তো সেই রূপকথার কনোয়ারের মতো ভুখনের ভাগ্য নয়, হয়তো কোন মেয়ের বাপ মেয়ে আর টাকা নিয়ে সাধাসাধি করবে না, যেমন সেই রূপকথার নায়কের বেলায় ঘটেছিলো, তা হ'লেও ভুখনের পক্ষে একটা লোহার রংদার বাক্স চাওয়া অন্যায় নয়। তবু বিয়ের ব্যাপারে একটু হাসি-ঠাট্টা করতে হয়, দুলারহিন্ বললো,—তুইতো ভেরুয়া হ'য়ে যাবি, টাকা দিয়ে বউ আনবি, আর ফির হঁ, হঁ, সে দেখা যাবে। তারই খিদ্‌মৎ করবি। সেই রাত্রিতেই কিম্বা তার দু'এক দিন বাদে জ্বর হলো দুলারহিনের। অল্প অল্প জ্বর প্রথমে, সেই জ্বর দিনকে দিন বাড়তে লাগলো। একদিন সারারাত দুলারহিন্ বেহুঁস। সেদিন সকালে ওস্তাদের কাছে ভুখন শুনে এসেছে তাদের গ্রাম থেকে চার পাঁচখানা গ্রাম পার হ'য়ে গেলে যে বড় গ্রাম সেখানে এক ওস্তাদ-ডাংদার আছে সে নাকি সব জ্বর ভালো করতে পারে। তার মনে হ'লো কি অন্যায়ই সে করেছে এতদিনেও ডাংদার না এনে। ডাংদার কথাটাই সে জানতো না নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো এ যুক্তিও তার মনে এলো না। দুলারহিনের পায়ের কাছে ব'সে কাঁদতে কাঁদতে তার বার বার মনে হ'তে লাগলো বিশঠো রূপয়া যার ঘরে তার দুলারহিন্ নাকি এমনি ক'রে মরে।

ভোর ভোর রাতে ভুখন উঠে দাঁড়ালো, দুলারহিনের অজ্ঞান দেহের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললো,—দেখ, দুলারী, দুলারি করিস না। ডাংদার আনতে চললো তোর ভুখনোয়া ; যদি ফাঁকি দিয়ে ম'রে যাস—

চোখের জল মুছতে মুছতে ডাংদাবের গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলো ভুখন। ডাংদার এসেছিলো। বিশঠো রূপয়াতো গেছেই, আর বিশঠো তার কাছে ধার হয়েছে। সে ধার আবার বছরে পান রূপয়া ক'রে বাড়বে ; অর্থাৎ ভুখন সেই পুরনো জালে জড়িয়ে পড়লো। তা হোক দুলারহিন্‌তো বেঁচে আছে।

আগের মতোই সংসার করতে সুরু করলো। মাঝের কয়েকটা দিন যেন স্বপ্ন। একটা নোতুন আশার উত্তুঙ্গতা থেকে আছড়ে পড়ার ব্যাপারই যেন কতকটা।

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে দুলারহিন্। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার একদিন সে বললো,—তুই তো আর পুতুল বানাস না ?

—কি হবে ?

—সাদি করবি না ?

—ডাংদারের সঙ্গে সাদি করলাম যে।

দুলারহিন্ লজ্জিত হ'য়ে মুখ নামিয়ে নিলো।

আবার চেষ্টা করার কথা ভাবতে গিয়ে ভুখনের যে অনুভবটা হ'লো সেটা এই : ছ'মাসের যত্নে যে বিশ টাকা জমে সেটা বিশ টাকা নয়, ছ'মাসের ঘর্মাক্ত শ্রমও বটে।

আর সেই ঘর্মাক্ত শ্রমকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোন বুদ্ধিমানই করে না।

তার উপরে এলো সেই ডাংদার যাকে রোগী দেখতে আনতে গিয়ে ভুখনকে পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিলো। সে এলো না ডাকতে।

—ভুখন, আছো, ভুখন ?

—হ্যাঁ, সব ভালো আছি আমরা, দুলারহিন্ তো দিনকে দিন মোটা হ'চ্ছে।

একটি নিটোল হাসি ফুটলো ভুখনের মুখে।

—বেশ, তা হ'লে সুদের টাকা ক'টা দাও। কোথায় পাবে ? সে কি আমি ব'লে দেব ? টাকা যতক্ষণ না দিচ্ছ আমি নড়ছি না। সহর চেন, সহর ? সেখানে থাকে পুলিস, তাদের ডেকে পাঠাবো। ঘরে দু'চার পয়সা যা ছিলো এনে দিলো ভুখন। সব শুনে দুলারহিন্ চুপ ক'রে রইলো।

ছ'মাস পরে আবার ডাংদার এলো। আড়াই টাকা পাওনা হয়েছে, দিতে হবে।

—আড়াই পয়সা নেই।

—দেখো, ভুখন, ধার বাড়িও না, বাড়তে বাড়তে ধার এমন হয় যে কোন-দিনই ও আর শোধ দেয়া যায় না। বেশ, আড়াই টাকা যখন দেবে তখন আমার বিশ টাকা দিয়ে দাও, আর তার সঙ্গে ওই আড়াই টাকা।

—কি হবে যদি আমি না দি ?

—যদি তুমি না দাও ? (ডাংদার কথাটা উচ্চারণ করলো যেন আর একবার কানে শুনে অর্থটা পরিষ্কার করার জন্য।) বেশ যদি তুমি না দাও, ভগবান আছে মাথার উপরে। টাকা দেবে ব'লেই, ওষুধের দাম তো, তোমার দুলারহিন্‌কে ভালো করেছে ভগবান, টাকা যদি না দাও তা হ'লে

—হেই ডাক্তার, খারাপ বোল না। টাকা আমি দেবো, তুমি কিছু বোল না।

ঝাঁপের আড়াল থেকে সব শুনছিলো দুলারহিন্।

ভুখন ঘরে ঢুকতেই সে বললো,—ডাংদারকে তুই আর টাকা দিবি না।

—টাকা দেবো না তো তোর যদি আবার অসুখ হয়।

—টাকা তুই খরচা করতে পারবি না।

—টাকা আমার, যা ইচ্ছা আমি করবো।

—কেন করবি? আমি তোর কে? তোর আপনার বহিন যে আমার জন্ম টাকা বরবাদ করবি?

—কি বললি?

—না, একশ'বার না। তোর সৎমায়ের বেটাবউ আমি।

—আমার কেউ না?

—না, না।

ভুখন কথা বললো না, ঘর ছেড়ে চ'লে গেলো।

কিন্তু ঝগড়া করার জন্ম হ'লেও মুখোমুখি হ'তে হ'লো তাদের। অবশেষে পুরুষালি প্রীতির চোখ-রাঙানির কাছে দুলারহিনের মেয়েলি স্নেহ হার মেনে স্বীকার করলো, আর সে নিজের অসুখের কথা বলবে না, আর কখনও আত্মীয়তা অস্বীকার করবে না, তবে সে রাত্রিতে ভুখন রোটি খেলো।

খুব ভালো জোড়া লাগলেও কখনও কখনও একটা অস্পষ্ট দাগ থেকে যায়—দুলারহিনের কথাটাও সেই দাগ।

দুলারহিনের স্নেহ বাইরে হার মেনে গভীর হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। সেই গভীর স্নেহ তার মাথায় বুদ্ধি এনে দিলো। সে স্থির করলো নিজে আগে সাদি ক'রে সেই টাকা দিয়ে ভুখনের সাদি দেবে। নিজে সাদি ক'রে টাকা পাওয়া সহজ নয় যদি এপক্ষ থেকে কোন যোয়ান বেটাছেলে দাম না চড়ায়। এ দিকে ভুখনের বুদ্ধি যদি না খেলে দুলারহিন্ নিজেই তাকে বুদ্ধি দেবে। অবশ্য যোয়ান কোন বর হবে না তার, মুখে যে রকম দাগ; আর তাদের কেউ রাজী হ'লেও গরজ দেখাবে না টাকা দিয়ে। কয়েকদিন নিজের মনে কথাটা তোলাপাড়া ক'রে একদিন দুলারহিন্ সেটাকে প্রকাশ করলো।

ভুখন শুনে হো হো করে হেসে উঠলো,—তোর সাদির ইচ্ছা তাই বল।

—না হয় তাই হ'লো। তুই তা হ'লে আগে আমার ইচ্ছা মিটিয়ে দে। ডাংদারের টাকা, তুই সেই টাকা শোধ কর। তারপরও যে টাকা থাকবে সেগুলো গেঁথে আমারই না হয় হার বানিয়ে দিস।

দিন যেমন যায় তেমনি যায়। ভুখনের চাড় নেই। তার উপরে নতুন একটা উপসর্গ জুটেছে। পয়সা পেলেই দুলারহিনের জমাতে ইচ্ছা করে, আর ভুখনের খরচ করতে। এরই মধ্যে একদিন ওস্তাদকে দিয়ে একজোড়া কাপড় আনিয়ে নিয়েছে ভুখন। শুধু কি তাই, নিজের খানা ছুপিয়েছে হলুদ রঙে আর দুলারহিনের খানা পাতলা লালে। সারাদিন যে খেতির কাজ ক'রে মাঝ রাত অবধি ব'সে

ব'সে কেরোসিনের কুপির আলোয় পুতুল খোদাই করে, তার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। দুলারহিন্‌কে তাই চুপ ক'রে থাকতে হয়।

কিন্তু চুপ করে কতোই বা থাকা যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভুখন ঘরে ঢুকে বললো,—দেখি, এদিকে আয় তো, আরও কাছে আয়।

দুলারহিন্ ভেবে অন্ত পায় না। হাত জোড় করে সে, প্রায় যেন আড়ষ্ট হ'য়ে যায়।

ভুখনই এগিয়ে এলো।

—আরে ছাড়, ছাড় হাত জোড় ক'রে মিনতি করতে লাগলো দুলারহিন্. ততক্ষণে কাঁসার মল্ জোড়া দুলারহিনের পায়ে পরিয়ে দিয়েছে ভুখন।

—এ তুই করলি কেন ?

—হামার হিচ্ছা।

প্রতিদান না দিয়ে কি ক'রে থাকা যায় বলো। একদিন সকালে দুলারহিন্ একটা অচিন্তনীয় কাজ ক'রে ফেললো। লাল শাড়িখানা প'রে পায়ে কাঁসার মল দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলো সে ভুখন যখন ভইসা টহলাতে গেছে। আর ফিরবে না দুলারহিন্, যতদিন না টাকা আনতে পারে সে। যেখানে যত স্বজাতীয় আছে ডেকে ডেকে সকলকে জিজ্ঞাসা করবে তারা কেউ বিয়ে করতে চায় কিনা তাকে। যদি কেউ বলে : বিয়ে করবো, অমনি সে বলবে,—কত টাকা দেবে ? যদি বলে পাঁচশ', অমনি সে বলবে আমার ভাইএর সঙ্গে কথা বলো, অত কমে হবে না।

নিজের গ্রাম ছাড়তে ছাড়তে সূর্য প্রখর হ'য়ে উঠেছিলো, তবু দুলারহিন্ তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলেছে, এখনও ভিন্‌গ্রামের স্বজাতীয়দের সঙ্গে দেখা হয়নি। সাহস খানিকটা যেন ইতিমধ্যে কমে এসেছে। নাগাদ দুপুর ভিন্‌গ্রামের স্বজাতীয় বস্তিতে পৌঁছালো সে। এইবার তাকে বিক্রি সুরু করতে হবে। প্রথম দেখা হ'লো একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে, জল তুলছিলো সে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। দুলারহিন্ কুয়োর পাশে গিয়ে আঁজলা পেতে দাঁড়াতেই সে জল খেতে দিলো। তারপরে প্রশ্ন করলো, কোন জাত কোথায় ঘর। দুলারহিন্ পরিচয় দিলো।

—একা একা কোথায় যাচ্ছো ?

দুলারহিন্ এদিক ওদিক চেয়ে নিচু গলায় নিজের উদ্দেশ্য ব'লে বললো, —সাহায্য করতে পারো বহিন ?

বউটি হেসে বাঁচে না। একা একা কত আর হাসা যায়, একসময়ে থামতে হ'লো তাকে। তখন সে বললো,—তুমি খুব বোকা বহিন, আমি হ'লে ঘরের বাইরে

যেতাম না ; দুজনেরই সাদি দরকার, কি করতাম বলো তো ?

দুলারহিন্ উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়ালো ভালো ফিকিরটা শোনার জন্তে, বউটি হেসে হেসে চোখ ছোট-বড় ক'রে বললো।

দুলারহিন্ কাঁদো কাঁদো মুখে তার দিকে একবার চেয়ে হাঁটতে স্বরু করলো। মনে মনে সে স্থির করলো, কোন মেয়ের কাছে সে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না। ছিঃ ছিঃ। মেয়েছেলের জিভে হুল আছে।

গ্রাম ছাড়তে দুপুর শেষ হ'লো। শরীরের সঙ্গে মনও ক্লান্ত হয়েছে। ক্লান্ত মনে সে ভাবলো : এত যে সে করছে, সব কি মিছে নয় ? ভুখন তো একবারও জোর ক'রে বলেনি সে সাদি করতে চায়। কিন্তু আর একখানা গ্রাম এসে পড়ছে সামনে, এমন সময়ে আবার সাহস ফিরে এলো। না হয় নাই বলেছে সে, তাই ব'লে কি তার ইচ্ছা পুরণ করতে হবে না ? আর না বলার কথা বলছো ? বলে না ব'লেই তার সাধ মেটাতে আরও সাধ যায়।

সামনের বড় বড় কাশের ঝোপে ভরা মাঠখানি পার হ'লে আর একখানি ভিন্-গ্রাম। আলো মুছে যাওয়ার আগেই এই গ্রামে পৌছে একটা নিষ্পত্তি করতে হবে। এখনই আলোর রং প্রায় বাদামী হ'য়ে উঠেছে। এই ভাবতে ভাবতে জোরে জোরে কয়েক পা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে বললো, কে যায় ? দুলারহিন্ ফিরে দাঁড়ালো।

—কোথায় যাচ্ছো একা ?

লোকটি এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো।

—বাড়ি থেকে রাগ ক'রে এসেছো নাকি, বাপ-ভাই বিয়ে দেয় না ব'লে ?

—না নিজেই আমি বিয়ে করতে বেরিয়েছি।

—সাবাস্। আমার সঙ্গে করবে ?

—আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুড়ি তো বটেই। ভাইকে টাকা দেবো আমি।

—চার কুড়ি ? বেশ তাই হবে। আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও ভাইকে টাকা দিতে ইচ্ছা হয়, দেখা যাবে।

—না, টাকাটাই আগে দিতে হবে।

—ও, খুব দাম বাড়াতে পারো বা হ'ক। আগে দেখি কত দাম হ'তে পারে। এই ব'লে দুলারহিনের আঁচলের একপ্রান্তে চেপে ধরলো লোকটি।

কিছুক্ষণ থেকেই দুলারহিনের মাথায় একটা কষ্ট হচ্ছিলো। একটা গোটা দিনের রোদ গেছে মাথার উপর দিয়ে। তবু জেদ ক'রে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে

গিয়ে তার চোখের পিছনে ক্লান্ত মস্তিষ্কের যে ধোঁয়াটে ছাপটা পড়েছিলো তার চাহনিতে সেটাই বিবশ তন্ময়তায় মিথ্যারূপ নিয়েছিলো। বোধ হয়, সেটাই লোকটির এত আকর্ষণ। কিন্তু কাঁধের কাছে আঁচলটায় টান পড়তেই দুলারহিনের পা দু'খানাও বিবশ হ'লো। সে লোকটির গায়ের উপরে প'ড়ে গেলো, আর সেখান থেকে মাটিতে। তখন তার কষ বেয়ে ফেনাও গড়াতে লাগলো।

যখন ঘুম ভাঙলো দুলারহিনের, সম্বিত ফেরার সময়ে তাই মনে হ'লো তার, তখন মাঝরাত। চারিদিকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। লোকটির কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে স'রে বসলো। কিন্তু লোকজন দূরের কথা ধারে কাছে বোধ হয় পোকা মাকড়ও নেই, নতুবা ঝিঁঝিঁটা অন্তত ডাকতো। আর বহুদূর থেকে কিসের একটা অদ্ভুত অর্থহীন, শব্দহীন শব্দ আসছে। ভয়ে দুলারহিনের নিঃশ্বাস বড় বড় হ'য়ে পড়তে পড়তে সেটা অবশেষে চাপা কান্নায় পরিণত হ'লো। কাঁদতে কাঁদতে মনে হ'লো যেদিন বাপ-মা চ'লে যায় সেদিনও এমনি কেঁদেছিলো সে, কিন্তু তখন শক্ত পৃথিবীর বদলে বুকের কাছে যে দৃঢ়তা অনুভব করেছিলো সেটা প্রায় শিশু ভুখনের ধূলিমলিন মুখখানা। নিঃশেষে শূন্য বুকে বোধ হয় বেশীক্ষণ কাঁদাও যায় না। সেই ভুখনের মঙ্গলের জন্যই আজ সে পথে বেরিয়েছে।

চাঁদ উঠলো। সেই আলোতে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মেলে দুলারহিন্ দেখলো সে কাশবনের মধ্যেই প'ড়ে আছে। লম্বা-লম্বা ছায়া সজীব হ'য়ে দুলছে চারিদিকে। রাত্রির শব্দহীন ভাষা এবার প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো। খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে হেসে উঠলো যেন।

হুরার ?

কিন্তু দুলারহিন্ ভয় পাবে না। ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে তবু চোখের জল মুছে সে সোজাসুজি দেখতে চেষ্টা করলো। যদি হুরারই হয় হোক। বাধা দেবে না, পালাবে না, সর্বাঙ্গ আঁচল দিয়ে ঢেকে গলাটা বাড়িয়ে দেবে। হুরারদের তো আঁচলের উপরে লোভ নেই। যদি খুবলে খুবলে খায়ও ততক্ষণ দেহের দুর্গতি দেখার জন্য প্রাণ থাকবে না। গলাটা সব প্রাণীরই সব চাইতে দুর্বল অংশ শরীরের। হঠাৎ ভুখনোয়ার কথাটা যেন মনে পড়ছে। আর একবার তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হ'ত। আর রান্না ক'রে রেখে আসেনি সে। খেতির কাজ ক'রে ফিরলে বড় ক্ষুধা পায় বেটাছেলেদের। তখন মুখের সামনে খাবার না পেলে রাগই হয় পুরুষদের। কিন্তু তারপর সে হয়তো দুলারহিন্‌কে খুঁজতে এ পথেই আসবে। হয়তো এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। আর যেমন লোক, হয়তো সঙ্গে একটা লাঠি পর্যন্ত আনেনি। আর দেখো তেমনি ভয় এদিকে হুরারের। এই দুশমনের ব্যূহে

নিরস্ত্র ভুখন। চোখের জলে মজ্জিত হ'য়ে আবার সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হা ভগবান, হা ভগবান, সে নিজেই তো ভুখনের মৃত্যুর কারণ।

ভুখন ঘরে ফিরে প্রথমে ভাবলো দুলারহিন্ অবেলায় জল আনতে গিয়েছে। রাগ হ'তে লাগলো তার প্রতীক্ষার সময় যত দীর্ঘ হ'লো। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে গেলো তখন সে কুঁড়ের ভিতরে দুম দুম ক'রে পা ফেলে বেড়াতে লাগলো।

রাত যখন প্রথম প্রহর, তখন সে ভাবলো : ঠিক তাই হয়েছে, ও গিয়েছে নিজের সাদি ঠিক করতে। কেন, বাপু, আমি কি বলেছিলাম ডাংদারের টাকা আমি শোধ করতে পারবো না। তুমি শোধ করো সাদি ক'রে? না-খেয়ে আছি তা যদি দেখতে না এলে, তবে তোমার টাকা নিয়ে এসো দেখবো মাথা কোথায় রাখো।

কিছুক্ষণ পরে নিজের মাদুরখানা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক ক'রে নিয়ে শুতে গিয়ে সে ভাবলো : আসলে ওসব কিছুই নয়, তোমার নিজেরই সাদি করার ইচ্ছা, একা-একা ভালো লাগছিলো না আর। আমি তোমাকে কখনও বলেছি, দুলারহিন্ আমি বউ চাই। মনে হবে না কেন, সব পুরুষের মনেই হয়। তাকে জলের ধারে দেখে আমিও এগিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। সেও হেসে, রাগ ক'রে কথা বলেছিলো। কিন্তু আমি তো জানি বাপ-ভাইয়ে মিলে তার ছ'জন আছে, দু'কুড়ি টাকার কমে তারা রাজী হবে না। আমি হাত জোড় ক'রে বলেছিলাম—মাপ্ কিজিয়ে। কিন্তু তার কথা তোমাকে বলেছি? বেশতো গিয়েছ, তোমার ভালো হোক। প্রায় মাঝ রাতে অনিদ্রিত ভুখন ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে শুনতে চমকে উঠলো। সেই নীরব রাত্রির রহস্যময়ী ভাষা। চকিতে সে উঠে দাঁড়ালো। দুলারহিন্ যদি অন্ধকারে আশ্রয় না পেয়ে থাকে।

আর কিছু ভাববার সময় পেলো না ভুখন। দরজার ঝাঁপ ভেঙে কোন ক্রমে রাস্তায় প'ড়ে অন্ধকারে ছুটতে লাগলো সে,—দু-লা-র-হি-ন্।

দুজনের দেখা হ'লো সংযোগ হারানোর দ্বিতীয় দিনের দুপুর বেলায়। দুলারহিন্ তখন ক্লান্তদেহে তার চাইতেও ক্লান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথ ধরেছে। চোখমুখ ব'সে গেছে, তামাটে চুলগুলি উড়ছে বাতাসে।

দুলারহিন্ বললে,—তুই এলি কেন আবার, আমিই তো ঘরে যাচ্ছিলাম।

ভুখনের মুখে দু' হাজার দাঁত হো হো ক'রে হেসে উঠলো,—এলাম এমনি।

সামনে একটা খাল, নদীর মতো তা'তে স্রোত। সেটাকে পাশে ক'রে কিছুদূর গেলে একটা গ্রাম। যখন ধুলো উড়ছে না তখন সেখানে একটা গোয়ালার দোকান চোখে পড়ছে। ওখানে যা হোক কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে।

ভুখন বললো,—তুই স্নান করে নে, চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। দুলারহিনেরও

খুব ইচ্ছা হয়েছিলো কিন্তু ইতস্তত করতে হ'লো তাকে।

ভুখন বললো,—এক ক্রোশের মধ্যে কোন লোক নেই।

তীরে শাড়ি রেখে তখন দুলারহিন্ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানকৌড়ির মতো—বাস্। আর গেলে ডুবে যাবি।

ডুবে যাওয়ার ভঙ্গিতেই তবু আর একটু সাঁতার কেটে, ভুখনকে ভয় দেখিয়ে তারপর দুলারহিন্ উঠলো। তীরে দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়ো ক'রে চুলের জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে ভুখনকে স্নান করতে পাঠালো। স্নান শেষে তীরে উঠে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুলারহিন্ বললো,—যদি ডুবে যেতাম।

—আমিও ডুবে মরতাম।

দুলারহিন্ হাত বাড়িয়ে ভুখনের একখানা হাত জড়িয়ে ধ'রে হাঁটতে লাগলো। গাঁয়ের দোকানে তারা ভইসা দহি পেলো আর মকাই-এর খৈ।

একটি গাছতলায় ব'সে যত না খাওয়া তার চাইতে বেশী কোলাহল ক'রে তারা আহারপর্ব সমাধা করলো।

গাছতলায় হাত পা ছড়িয়ে ব'সে ভুখন প্রশ্ন করলো—দুলারী, আর কখনো আমাকে ছেড়ে যাবি না, বল।

—না।

রোদের ঝাঁজ ক'মে এলো। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পথ চলতে সুরু করলো তারা। এত হাল্কা মন তারা বহুদিন অনুভব করেনি। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, যেন সখ ক'রে দু'জনে বেড়াতে বেরিয়েছে। কয়েক পা গিয়ে ভুখন বললো,—দুলারী, এখন যদি কোন মহুয়াই-এর দোকান পেতাম—

—তুই তো নেশা করিস না, তবে ও কথা বলছিস কেন ?

—কিছুতেই যেন ঠিক ফুর্তিটা হচ্ছে না।

নিজেদের গ্রামে পৌঁছানোর আগে সন্ধ্যার আগেকার বাদামী আলোয় কাশের বড় বড় ঝোপে ভরা মাঠটিতে তারা এসে পৌঁছালো। দিনের বেলায় ভইসা থাকে, ভইসা নিয়ে রাখালরা এখন ফিরে গেছে। ছোটবেলায় যখন দুলারহিন্ ভইসা তাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ পারতো না, তখন এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হ'তো। ভুখন যখন ডাকতো তাকে, সে লুকিয়ে বেড়াতো এক ঝোপের আড়াল থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে। আর মাঝে মাঝে কুই করে সাড়া দিতো।

মাঠটা পার হ'তে হ'তে ঝিকমিকিয়ে হেসে দুলারহিন্ বললো,—আমি যদি এখানে লুকিয়ে থাকি খুঁজে বা'র করতে পারিস ?

—না, পারি না। এখনও তেমনি ছোট আছি, হাঁটতে হোঁচট খাবো।

দুলারহিন্ কয়েক পা আগে চলছিলো, হঠাৎ ধাঁ ক'রে সে লুকিয়ে পড়লো। ভুখন মনে মনে হাসলো ছোটবেলায় খেলতাম, এই মনে করলেই কি আর তেমন খেলা হয়। এখন সে হাত বাড়ালেই ঝোপের এপার থেকে ওপারের ঘাস সরিয়ে দুলারহিন্‌কে দেখতে পাবে। কিন্তু দুলারহিন্ ভারি সুন্দর লুকাতে পারে। আর তার পায়ের গোড়ালি যেন ধনুকের ছিলায় তৈরি। একটি ঝোপের আড়ালে তার সাড়া পেয়ে তার কাছে গিয়ে দেখলো ভুখন সে ততক্ষণে অন্য আর একটির কাছে স'রে গেছে। তার শাড়ির একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেখানে যেতে দুলারহিন্ উধাও। দু'তিন বারের চেষ্টায় একবার ভুখন দুলারহিন্‌কে ছুঁতে পারলো।

—নে এবার চল।

ভুখন ভেবেছিলো খেলা শেষ হয়েছে, কিন্তু দুলারহিন্ আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেলো হাসতে হাসতে।

খেলাটা বাল্যের মতো দুর্দম হ'য়ে উঠেছিলো। ইতিমধ্যে একবার দুলারহিন্‌কে সে দু'হাতে চেপে ধরেছিলো বুকের উপরে, কিন্তু হাতের ফাঁক গলিয়ে দুলারহিন্ আবার লুকিয়ে পড়লো। খেলার উত্তেজনায় ভুখনও ছুটতে সুরু করলো। কি একরকম ঘাস পায়ের তলায় দ'লে দ'লে যাচ্ছে, একটা সুঘ্রাণ উঠছে। কি একটা উত্তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই শুকনো খটখটে ঘাসের বাদামী আলোর পৃথিবী থেকে। এইমাত্র ভুখন ছোটবেলার পাকড়ানোর কায়দায় পাকড়ে ধরেছিলো দুলারহিন্‌কে। কিন্তু এবারও রাখতে পারলো না। দুলারহিন্ হাত ছাড়িয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ে পালালো, তারপরে হাসতে হাসতে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হ'য়ে আতপ্ত ঘাসের উপরে শুয়ে পড়লো। দুলারহিন্ ছোটবেলাকার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে—যেমন ক'রে ছোটবেলায় বলতো, আমি ম'রে গেছি। উরু দুটি প্রসারিত, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি, ঈষৎ মুক্ত ঠোঁট দুটি, বুক কাঁপছে থর থর ক'রে।

কিন্তু দুলারহিন্ ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলো। বল নিয়ে লুফতে লুফতে যদি হঠাৎ সেটা কুয়োয় প'ড়ে যায়, তা'হলে সেই কুয়োর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কুয়োর অন্ধকার মনে নিয়ে যেমন ফিরে যায় খেলুড়েরা—তেমনি মন নিয়ে ফিরে চললো ভুখন আর দুলারহিন্।

দুলারহিন্ একবার বললো,—ভুখন পিছিয়ে পড়ছিস। কিন্তু সেটা যেন ভাষা নয়, ভাষার খোলস শুধু।

ভুখন মুখ নিচু ক'রে থাকে, কথা বলে না। দুলারহিন্ ভাবে, কখনও কপালে হাত রেখে।

একদিন খুব সাহস ক'রে দুলারহিন্ ভাবলো,—ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলবে ভুখনোয়ার কোন দোষ নেই, বয়সে সে-ই বড়। আর এই কথা বলে যদি ভুখনকে মুখ দেখাতে না পারে, মরবে সে। মরা যত সহজ, বলা তত নয়। ভগবানকে যদি বলা যায়, মানুষকে নয়।

দুলারহিন্ রান্না করতে করতে ভুখনের পিঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, আহা সঙ্কোচে যেন ভেঙে পড়েছে। সে ভাবে, তোর জন্য আমি কি না করেছি। ছোটবেলায় একবার আগুনের মধ্যে গুলি ফেলে দিয়ে তুই কেঁদে উঠেছিলি। আর তোর সেই গুলি খুঁজে দিতে হাত দিয়ে জলন্ত আঙরা সরিয়েছিলাম, দাগটা ছিলো কিছুদিন। তাও কি তোর মনে নেই।

এক সময়ে দুলারহিনের চিন্তার পথ কিছু বদলালো। চিন্তায় সাহস আগে ছিলো না, এমন নয়। কিন্তু স্নেহের করুণরসে মজ্জিত হ'য়ে সে সাহসও হ'য়ে উঠতো করুণ। সমস্যাগুলোকে একদিন জীর্ণ বাসের মতো তুচ্ছ মনে হ'লো। নিজেকে অসীম ক্ষমতার উৎস ব'লে অনুভব করলো সে। সাহসে এত প্রাণ, এত পূর্ণতা এ কে জানতো? এতদিন পথে-পথে ঘুরে আজ তবে পথ দেখা গেলো। আবার সেই স্নেহগুলো ফিরে আসতে লাগলো। অনাস্বাদিত এক আস্বাদে বর্ণাঢ্য হ'য়ে হ'য়ে। দুঃসাহসী হওয়ার জন্য নিজের ভিতরে প্রেরণা এল তার।

সন্ধ্যার পর ভুখন ফিরে এলো তেমনি গম্ভীর মুখে। পায়ের শব্দে দুলারহিনের স্নায়ুগুলি রিন্‌রিন্ ক'রে উঠলো। নাগরদোলায় কয়েক পাক ঘুরে হঠাৎ মাটিতে দাঁড়াতে গেলে যেমন পরিচিত পৃথিবী অপরিচিতের মতো টলমল করতে থাকে তেমনি হ'লো দুলারহিনের।

দুলারহিন্ ভুখনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো,—ভুখ্‌নোয়া।

ভুখন অবাক হ'য়ে গেলো। রুক্ষ চুলগুলি ভিজে-ভিজে পাট-পাট করা, বোধ হয় তেলজাতীয় কিছু দিয়ে বাঁধা। পরনে লাল সেই শাড়ি। কপালে কালির টিপ। আর চোখ। সে চোখ কোন দিনই দেখে নি ভুখন। অনুচ্চারিত হাসির মতো তেমনি আভাযুক্ত কিছু দুলারহিনের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো মুখের বসন্তের দাগ-গুলিকে অস্পষ্ট ক'রে। ভুখনের মনে হলো প্রবল একটা আক্ষেপ বোধ হয় আসছে তার সারা দেহে। ভুখন নিরুদ্ধ গলায় মৃদু গর্জন ক'রে উঠলো।

দুলারহিন্ একটা হাত রাখলো ভুখনের কাঁধে।

ভুখন দু'হাতের সবটুকু জোর দিয়ে দুলারহিনের হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। যা কোন দিন সে কল্পনাও করে নি, তেমনি ক'রে দুলারহিনের আধখোলা ঠোঁটের উপরে প্রচণ্ড একটা চড় মারলো সে। আঘাত একটা দেয়ার জন্যই মন যেন উন্মুখ

হ'য়ে উঠেছিলো। একটা কিছুর প্রাবল্য দরকার এই সে অনুভব করেছে এ কয়েকটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'লো—আহা এ কি করলো সে। দুলারহিন্, বহিন্। পৃথিবীতে কে আছে তার দুলারহিন্ ছাড়া। আর যে দুলারহিন্ নাকি তার মুখ চেয়ে তারই আশ্রয়ে থাকে, এত কোমলা, এত দয়াবতী। ছোটবেলায় দুজনের একজনকে বাবা মারলে অন্যজন তাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠতো, তেমনি হ'লো।

ভুখন কেঁদে কেঁদে হেঁচকি তোলার মতো ক'রে বললো,—আর কখনো তোকে মারবো না। এই প্রথম, এই শেষ। দুলারহিন্ দুলারহিন্ বহিন্।

দুলারহিন্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো,—মেরে লাল মেরে ভুখ্‌নোয়া, ভাইয়া।

অনেকক্ষণ কেঁদে মনের নিরুদ্ধ পীড়াগুলিকে ধুয়ে মুছে দু'জনে নিজের নিজের চাটাইএ এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙলো ভুখনের। ঠিক যা মনে করেছিলো তাই, এই ভাবলো সে। বাবা মারলে তারপর কয়েকদিন খুব কাজে মন হ'তো দুলারহিনের ; ভোর থাকতে উঠে কাজে লেগে যেতো। আজ বোধ হয় তাই করছে, জল আনতে গেছে।

ভুখন ভাবলো : কি বোকা মেয়ে রে বাবা। অনেক বেলা হ'লেও যখন দুলারহিন্ ফিরলো না তখন ভয় হ'লো ভুখনের, সে খুঁজতে বার হ'লো।

কিন্তু সব সময়ে খুঁজে বার করা সহজ নয়। কয়েকদিন স্নানাহার ত্যাগ ক'রে খুঁজেও দুলারহিন্‌কে সে পেলো না। ভুখন বরং বুঝতে পারলো ওগুলোকে বর্জন করলে খোঁজার পরিশ্রমকেও বাদ দিতে হবে। তখন সে স্নানাহারের দিকে নজর দিলো। হাতের পয়সা কয়েকটি একসময়ে ফুরিয়ে গেলো। ততদিনে সে বহুদূরে এসে পড়েছে। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে খেতির কাজ ক'রে আবার হাতে পয়সা ক'রে বেরুতে গেলে দুলারহিন্‌কে বোধ হয় আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। তখন সে পথ চলতে চলতে কাজ করতে সুরু করলো। যখন যে গ্রামে গিয়ে পৌঁছায় সে-গ্রামেই খেতির যে কাজ পারে জুটিয়ে নেয়। কাজ ফুরিয়ে গেলে চলতে শুরু করে। একবার খুব বিপদে পড়েছিল। এক চায়ের বাগানে কাজ করতে গিয়ে তিন বছর এক নাগাড়ে খাটতে হয়েছিলো, পথ চলবার উপায় ছিলো না। ভুখনের ধারণা সেই সময়েই দুলারহিন্ সব চাইতে দূরে গিয়ে পড়েছে। তাকে একজন মুরুব্বি বলেছে দুলারহিন্ যে বছর হারিয়ে যায় সেবার প্রায় দু'তিন হাজার মেয়ে-পুরুষ

নাকি মরিসাস্ দ্বীপে কাজ করতে গিয়েছে। ভুখনের ইচ্ছা সে একবার মরিসাস্ দ্বীপটিও খুঁজে আসবে।

আসল ব্যাপার ঠিক এরকম নয়।

দুলারহিন্ পথে বেরিয়ে এক বুড়োর দেখা পেলো। বুড়ো তাকে প্রশ্ন করতেই দুলারহিন্ কেঁদে ফেলে তাকে বললো, সে ভাইকে সুখী করার জন্য পথে বেরিয়েছে।

—কি করলে সে সুখী হয়, বিটিয়া ?

—যদি অন্ততঃ ষাট সত্তর টাকা দিতে পারি তাকে।

—আচ্ছা, তুই আমার গোরুবাছুরের তদ্বির কর, দুধ দো, দুধ বেচ, আমি টাকা দেবো ধীরে ধীরে।

সেই বুড়োর কাছে থাকতে থাকতে বুড়োর ছেলে একদিন কেড়ে নিলো দুলারহিন্‌কে। বুড়ো খুব হুঁসিয়ার, সে ছেলে ব'লে রেয়াত করলো না। টাকা নিলো চার কুড়ি ছেলের কাছে বুঝে। সেই টাকা আঁচলে বেঁধে বুড়োর ছেলের ঘর ক'রছে দুলারহিন্। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আঁচলে-বাঁধা টাকা নিয়ে দুলারহিন্ অপেক্ষা করতে লাগলো। এ-লোক সে-লোকের মুখে সংবাদ দিয়েছে সে ভুখনকে ঘরে ফেরার জন্য। ভুখন ফিরলেই সে যাবে। লোকগুলো খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।

এখন দুলারহিন্ আর চট ক'রে যেতে পারে না কোথাও। মাটিতে শিকড় বসিয়ে দিয়েছে সে। তিন চারিটি ছেলেমেয়ে তার। তারা সবাই তার দেহকে এবং অধিকাংশ মনকে নিজেদের পরিবারে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন বড়জোর মনের একটা উন্মুক্ত অংশ তার ছোটবেলাকার গাঁয়ের দিকে বাতাসে বাতাসে আগ্রহের পল্লব মেলে ডাকতে পারে। প্রথম শীতের মাটির রসে কোন কোন গাছ যেমন শিউরে ওঠে—তেমনি কখনও অনুভব হয় তার ; শূন্যতা যেন শীত অন্ধকার একটা প্রবাহের মতো মাটি থেকে উঠে তার হৃদয় মূলকে শিথিল ক'রে দেয় কখনও কখনও।

আর ভুখন। বলো দেখি যে ব্যবধান এসে গেছে তাদের জীবনে সে কি মরিসাস্ দ্বীপের সাগরের চাইতে কম দুস্তর ? আর একটি পরিবারের দেহগুলোর ক্রমায়াত শৃঙ্খলের একটি বৃন্ত যার দেহ, তাকে কখনো ফিরিয়ে আনা যায়—পারতো তাই ভুখন, যদি জানতোও সে ? তার চাইতে মরিসাসের দূরত্ব-কল্পনাও ভালো।

কিন্তু ভুখন এখন আর দুলারহিন্‌কে খুঁজে বেড়ায় না। তবু কি খোঁজে একটা। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশায় দাঁড়িয়েছে। মরিসাসের কথাও বলে না। দু এক

বছর পর পর সহর বদলে কাজ ক'রে বেড়ায় সে। ভালো লাগে না অনেকদিন এক জায়গায় থাকতে। কিছুদিন সে বাঙলাদেশের গ্রামে মাটিকাটার কাজ ক'রে বেড়ালো পথের ধারে ধারে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোন কোনদিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে। তারপর শুধু গল্পটাই থাকবে।

ব্রজেন ওদিক থেকে ফিরে এসে এই গল্পটা বলেছে। সে জার্মানিতে কি ট্রেনিং নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে কি ক'রে এবং কেন মধ্য ইউরোপের অন্য এক রাজ্যে গিয়ে বাস করতে সুরু করেছিল, তা সে বলে নি। বোধ হয় ঝোঁকের মাথাতেই সে এই গল্পটা ব'লে ফেলেছে ; এ বিষয়েও তাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ ক'রে লাভ নেই, যা কিছু অস্পষ্ট তাকে সে কিছুতেই স্পষ্ট করবে না, কিছুতেই না, তা আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

গল্পটা উদ্বাস্তুদের নিয়ে। যুদ্ধের সময় যারা বাস্তুহারা হয়েছিল তাদের অনেক পরিবারকেই পুনর্গঠিত ইউরোপের এ নগরে ও নগরে পুনর্বসতি পেতে দেখা গিয়েছে। তাদের মধ্যে মনের দিক দিয়ে এমন অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাবে যারা ডিসপোজালের যুদ্ধ-উপকরণের মতো কিংবা পুরনো লোহার দোকানের ফুট-পাতে স্তূপ করে রাখা জাংকের মতো, কারণ মানুষ কখনো অতীতকে বিস্মৃত হ'তে পারে না! তা হলেও এরা বেশীর ভাগই পুরনো উদ্বাস্তু, ওদিকের রাষ্ট্রগুলো এদের সম্বন্ধে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় এসে গিয়েছে। এদের দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, মৃত্যু এ সব সম্বন্ধেই একটা না একটা ফরমুলা প্রচলিত হ'য়ে পড়েছে।

এ ছাড়াও এক রকমের উদ্বাস্তু আছে। যুদ্ধের অত বড় জোয়ার ভাটায় যারা অন্ততঃ বাসভূমির দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্থির ছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যেই কেউ কেউ যেন উন্মন হ'য়ে ওঠে। হ্যাভারস্যাকে কিছু সঞ্চয় নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে নিজেদের দেশের বাইরে অন্য কোথাও যেতে চায়। স্বভাবতই, কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি যেখানে বড়ো বড়ো ঘাস কিংবা অন্য ঝোপ ঝাড়ের আড়াল আছে, সীমান্ত পার হওয়ার জন্য সে জায়গাগুলোকেই বেছে নেয়া হয়। খরগোশের মতোই তারা নিঃশব্দ দ্রুততায় সীমান্ত পার হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু কখনও দেখা যায় বর্ডার আউটপোস্টের রাইফেল থেকে একটা নগণ্য শব্দ হয়, দেখা দেয় খানিকটা ধোঁয়া, যা মিলিয়ে গেলে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ঘাসগুলোর মধ্যে মুমূর্ষু খরগোশের মতোই একটা মানুষ উলটে পালটে আকুঞ্চিত হ'তে থাকে। অনেক সময়েই অবশ্য আউটপোস্টকে ফাঁকি দেয়াও সম্ভব হয়।

এই একক চেষ্টা কখনও কখনও দলবদ্ধ প্রয়াসে পরিণতি লাভ করে। এরকম

সময়ে কাঁটাতারের ওপারে সাহায্য করার মতো লোকও কিছু কিছু থাকে। আউট-পোস্টের পাহারাদারদের মনেও সম্ভবত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোন কোন জায়গায় কাঁটাতারের বেড়াটাই কারা ভেঙে ফেলে। তার পরে অবশ্য আউটপোস্টের পাহারাদারদের মধ্যে আরও কড়াকড়ি প'ড়ে যায়। রাইফেলের বদলে মেশিন গান আসে। বেড়ার এপারে ওপারে, বেড়ার গায়ে অনেক মৃতদেহ—শিশু বৃদ্ধ যুবক এবং নারীর—জমা হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেকে সীমান্তের ওপারে জঙ্গলে আগাছায় ঢুকেও পড়েছে। এরকম সময়ে বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব—এমন সব শব্দ রয়টারের মতো সংবাদ-বণিকরা সংবাদে ব্যবহার করে।

এরকম একটা নতুন উদ্বাস্তু দল কিংবা দলের ধ্বংসাবশেষ নিয়েই এই গল্প। কথাটা ও ভাবে বলা বোধ হয় ঠিক নয়। এটা এমন একটা দল নয় যারা একই সঙ্গে সীমান্ত পার হয়েছিল। সীমান্তের নানা অংশে নানা দলে পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল হঠাৎ, একাদিন বা দু-তিন দিন ধরে সে সব দলের থেকে ধরা পড়ার পরে, এবং মৃত্যুর পরে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা সকলে যু শহরে এসে পৌঁছেছিল। সেখানে খোলা আকাশের নিচে এই দলটি গড়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে দেখতে হ'লে দলটি অবশ্যই নতুন, কিন্তু অনুভূতির দিক দিয়ে এটা সত্য ছিল না, কারণ দলের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয় ছিল পূর্ব অবস্থার ধ্বংসস্তূপ। এমন কেউই ছিল না যার সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীদের দু-একজন সীমান্ত পার হ'তে ব্যর্থ না হয়েছে।

এ বিষয়ে ব্যতিক্রম বোধ হয় সেণ্ট সাইমন, সে একাই। তার মুখ দেখে তার মনের ভাব কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না, তার সম্বন্ধে এরকম ধারণা হওয়ার এটা কারণ হ'তে পারে। আর তার মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে না পারার একটা সহজ কারণ এই ছিল যে তার মুখটা ছিল মুখোশে ঢাকা। ফ্যান্সি ড্রেস বলে যে রকম কিম্ভূত মুখোশ পরা হয় তেমন কিছু নয়, বরং মুখোশটাকে মুখোশ ব'লে যাতে মনে না হয় প্রস্তুতকারক সে দিকেই নজর রেখেছিল। পাতলা হলুদ রঙের রবারের তৈরী। কাছে থেকেও প্রথম বারে ব্যাপারটা ধরা না পড়তে পারে কিন্তু দ্বিতীয় বার চাইলেই বোঝা যায়। চোখের নিচে থেকে চিবুক অবধি তার মুখের যে মোমের মতো মসৃণতা, যা চিন্তাতেও স্থির, এমন মানুষের মুখের ত্বক্ হয় না। দলে এ কথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, এখন সকলেই জানে। কে প্রথম বলেছে তা নিয়ে এখন আর কেউ আলোচনা করে না, এখন সকলেই চায় মুখোশ যেন সে না খোলে। ব্যাপারটা যুদ্ধের সময়ে ঘটেছিল। যা তার মুখ ছিল এখন হয়তো তা পোড়া কুঞ্চিত খানিকটা চামড়া, নাকের জায়গায় হয়তো দুটো গর্ত আছে যেমন কঙ্কালের থাকে। দলের সর্বসম্মত অভিমত এই যে সেণ্ট সাইমন মুখোশ প'রে

ভালই করেছে।

অন্য দিক দিয়েও সেণ্ট সাইমনের কাছে দলের সকলেই কৃতজ্ঞ বোধ ক'রে থাকে। লোকটি সব চাইতে কম কথা বলে, সব চাইতে কম হা হুতাশ করে। দলের প্রায় শেষে যেখানে সব চাইতে ক্লান্ত মানুষ কয়েকটি প্রায় দলের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া হ'য়ে চলে, পথের ধারে ব'সে পড়ে, যে কোন সরাইয়ে ঢুকে প'ড়ে পকেটের শেষ কয়েকটি ফ্রাঁর বিনিময়ে গাদা গাদা বিয়ার খায়, কিংবা সস্তা জুয়োর আড্ডার ধারে ঝুঁকে দাঁড়ায়, তখন সেণ্ট সাইমনকে তাদের কাছাকাছি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার ফলে রাস্তায় ব'সে পড়ার মোহ যখন কাটে, তখন দলের সেই পথভ্রষ্ট লোকগুলো তার সঙ্গে দলের ভিড়ে আবার ফিরে আসতে পারে। যদিও এটা সেণ্ট সাইমনের নিজের মুখোশের জন্য হীনমন্যতার ফলই হয়তো যে সে দলের শেষ দিকে চলতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।

নিনা, পুরো নাম নিনচ্‌কা, একবার এমন একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। অটমের মাঝামাঝি তখন, দুপুরে দলটি একটা গ্রাম পার হ'য়ে চলেছিল। সীমান্ত পার হওয়ার পরে তখন প্রায় পনরো দিন হ'য়ে গিয়েছে। ধুলো, তৃষ্ণা, পথের ধারে ধুলোয় ঢাকা সাইট্রাস। নিনা পিছিয়ে পড়েছিল। তার ক্যানভাসের জুতোও যেন পায়ের পক্ষে দুঃসহ। গরমের ফলে স্ট্র হ্যাটের নিচেও তার দুই চিবুকওয়ালা মুখটা গাজরের রং নিয়েছে। পথে তখন খড় বোঝাই ট্রাকগুলো চলেছে। তাদের একটিকে সে হাতের ইশারায় থামিয়েছিল। হিচ-হাইকিংএর পদ্ধতিতে চললে মন্দ হয় না। ড্রাইভার পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি কৃষক। নিনার ভারেই যেন ট্রাকটার গতি মন্থর হ'য়ে গেলো। পিছনের কয়েকখানা ট্রাক পার হ'য়ে গেল সেটিকে, আর পার হওয়ার সময়ে দ্ব্যর্থক ভাষায় নিনার ট্রাকের ড্রাইভারকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে গেলো, যদিও তখন দুপুর পার হয় নি।

বিকেলে পথের ধারে একটা সরাইতে ট্রাকটা থেমেছিল। জানলার ভাঙা কাঁচে কাগজ-সাঁটা, দরজার পাশে ফ্লাই পেপার ঝুলছে, টেবলে ভন ভন করে মাছি উড়ছে —সেই সরাইতে গিয়ে নিনা ট্রাক ড্রাইভারের টেবলসঙ্গিনী হ'য়ে বসেছিল। বিয়ার দিয়ে সুরু ক'রে, পুরনো কেক যার গন্ধটা পচা নাশপাতির মতো, আর কালো কফি যার স্বাদ অনেকটা রং করা চকের মতো তা দিয়ে তারা ক্লান্তি দূর করেছিল। আর তারপর হাঁটতে হাঁটতে তারা যেখানে ট্রাকটাকে পথ থেকে নামিয়ে নির্জন মাঠের মধ্যে একটা খড়ের গাঁজার পাশে রেখে গিয়েছিল ড্রাইভার, সেখানে পৌঁছালো। নিনার কাছে পুরুষ নতুন নয়। তার এক কামরার ফ্ল্যাটের নোংরা হলুদ রঙের সস্তা কাগজে মোড়া চার দেয়ালের সঙ্গে সোনালী লাল হ'য়ে আসা

খোলা আকাশের আবহাওয়াটাতেই যা পার্থক্য, আর অন্য নতুনত্ব বোধ হয় এই যে ট্রাক ড্রাইভারের ভাষা তার কাছে বিদেশী ভাষা।

কথা ছিল ট্রাক ড্রাইভার তাকে পৌঁছে দেবে দলের কাছে, কিন্তু নিনা যখন ট্রাকের কাছে এসে পৌঁছেছে, তখন সে সেণ্ট সাইমনকে দেখতে পেয়েছিল। নিনা বর্ণহীন হাসি দিয়ে—তার ফ্ল্যাটের দরজায় ক্রেতাদের যে হাসিতে বিদায় দিতে অভ্যস্ত ছিল—ট্রাক ড্রাইভারকে বিদায় জানিয়ে সেণ্ট সাইমনের পিছন পিছন হাঁটতে সুরু করেছিল। কিছুক্ষণ নিনার মনে বিদেশী যুবক ট্রাক ড্রাইভারটির দ্বিধাগ্রস্ত অকৌশলী আচরণগুলো রিমঝিম করতে লাগলো। সে ভাবতে চেষ্টা করলো, এমন কিছু সে অনুভব করেছে কিনা এরও আগে। তখন তার কম বয়সের পলিটেকনিকের ছাত্রদের কথা মনে পড়লো, যাদের একজনকে অশিষ্ট কৌতূহলের জন্য শাসন করেছিল সে এক দুপুরে। কিন্তু তারপর থেকে সে ছাত্রটির কাছ থেকে অনেকদিনই কিছু নেয় নি। এবং তার সন্দেহ হয়, পঁয়তাল্লিশ বছরের সাদা ও বাদামী রঙের চুলের মাথা ও দুটি চিবুক সমেত মুখ আঁকবার ছুতো ক'রে আর্ট স্কুলের যে ছাত্রটি সপ্তাহে একবারের বেশী তার ঘরে এসে বিকেল থেকে রাত দশটা অবধি কাটাতো, সে পলিটেকনিকের সেই ছাত্রটির কাছেই কিছু শুনে থাকবে। ছাত্রমহলেই তার পসার ইদানীং কিছু দিন ধ'রে বেড়ে উঠছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা অনুতাপের মতো কিছু নিনা অনুভব করেছিল, যেন শুক্রবারে সে মাংস খেয়েছে। যেন একটা পবিত্র কোন দিনে—সব জীবনেই এমন একটি পবিত্র দিন আছে, নিনারও ছিল নভেম্বরের সাতাশে, সেদিন তার মায়ের মৃত্যুদিন—যা উচিত নয় তাই সে করেছে। সে কি অ্যাভলনের সরাই-এর উদ্দেশ্যে যাচ্ছে না? নিনা লক্ষ্য ক'রে দেখলো কয়েক ধাপ আগে সেণ্ট সাইমন হেঁটে চলেছে। মাথায় ক্যানভাসের হ্যাট, গায়ে সাদা—এখন ময়লা মেটে রং-এর—পা পর্যন্ত লম্বা ঝুলের স্মক্ ফ্রক। খানিকটা দৌড়ানোর ভঙ্গিতে চ'লে সে সেণ্ট সাইমনের পাশে পাশে চলতে সুরু করেছিল, তারপরে এক সময়ে খুব হালকা ক'রে আঙুলের ডগাগুলো সেণ্ট সাইমনের আস্তিনের উপরে রেখেছিল। আর সেই সন্ধ্যাতেই নিনা আবিষ্কার করেছিল, অস্পষ্ট অন্ধকারে সেণ্ট সাইমনের ক্যানভাস হ্যাট এবং লম্বা ঝুলের স্মক্ ফ্রক পরা চেহারাটা কতকটা পাদরীর মতো দেখায়। নিনা সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে দলে ফিরে এসেছিল। ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যার হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে এলে অনুতাপের জ্বালাটাও ক'মে গেলো।

পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের দল। সংখ্যাটা অনির্দিষ্ট থাকার কারণ এই, একেবারে সামনে সামনে যারা চলেছিল আর একেবারে পিছনে যারা, তাদের

মধ্যে অনেক সময়ে ধুলোভরা গ্রাম্য পথের এক আধ মাইল ব্যবধান থেকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে বেশ কিছুদিন হ'লো সামনের এবং পিছনের মানুষগুলোর ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না, যে পথে সামনের লোকগুলি চলেছে সে পথেই একেবারে শেষের লোকগুলিও। আর অন্ততঃ দু একবার তারা একই জায়গায় একত্র বসেছে—একটা পরিত্যক্ত স্কুল ঘরের বারান্দায়, কিংবা একটা ওমনিবাস স্টেশনের সেডের নিচে।

দলের মাঝামাঝি যারা চলেছে তাদের মধ্যে একজন ছিল যাকে আমরা যোশেপ বলবো, কারণ এখন তার কৌলিক উপাধি অর্থহীন, যেহেতু তার একমাত্র পুত্র যে তার পরে সেই প্রাচীন কৌলিকতাকে জীবিত রাখতে পারতো, সে সীমান্তের কাঁটাতারের কাছেই একভলি সাব মেশিনগানের গুলিতে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে, এবং কারণ তাকে এখন আর প্রফেসর ব'লেও লাভ নেই, যেহেতু সে কোনদিনই আর কোথাও অধ্যাপনা করবে এমন সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে সে চিন্তাও করেছে। তার অধ্যাপনার বিষয়টাও কি নিরর্থক হ'য়ে যায় নি? তার লেখা বইগুলোতে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আছে তা সবই বন্ধ্যা প্রমাণিত হ'য়ে গিয়েছে। এক সময়ে তার ছাত্ররা তার মাথার পিছন দিকের মরচে আর সাদায় মিশানো ফাঁপা ফাঁপা চুলগুলো দেখে কল্পনা করতে ভালবাসতো ওই চুলগুলোর নিচেই অধ্যাপকের প্রকাণ্ড মস্তিষ্কটা থাকে। এখন তাকে কেউ হয়তো ফ্লাপি জো বলতে পারে তার দরুণ সস্তা কমরেডারি দেখাতে।

অধ্যাপকের সঙ্গে তার স্ত্রী আছে। তাকে দেখলে বরং অধ্যাপকের ছাত্রী বলে মনে হয়। তার বেশভূষাতেও বেশ একটা ছিমছাম বাবুয়ানার ভাব আছে। তার পায়ে যে ব্রাউন রঙের জুতো, তার গায়ে যে মসলিনের গাউন তা বেশ দামী। মনে হ'তে পারে অধ্যাপকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আসলে তা নয়। অধ্যাপকের প্রাপ্ত-বয়স্ক যে ছেলেটি কাঁটাতারের বেড়ার কাছে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়েছে তারই মা সে। ভুলটা হওয়ার প্রথম কারণ তার দেহের গড়ন, দ্বিতীয় কারণ অধ্যাপক সীমান্তের এপারে প্রথম শহরে পৌঁছে তার যথাসর্বস্বের একটা মূল্যবান অংশ ব্যয় করেছে স্ত্রীর পোশাকের জন্য যেন তা ক'রে, কিছুই হয় নি, যা হয়েছে তাকে সে গ্রাহ্য করে না—এমন কিছু প্রমাণ করা যাবে। অধ্যাপকের স্ত্রীর নাম রুথ।

যোশেপ এবং রুথের সঙ্গে অনেকেরই রোজ দেখা হয় না, সেণ্ট সাইমনেরও হয় না। এমন নয় তারা কাউকে এড়িয়ে চলে, কিংবা দলের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের রোজ দেখা হয়। সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে একবার তাদের দেখা হয়েছে, দলের এমন অনেকের সঙ্গেই দু-একবার তাদের দেখা হ'য়ে থাকবে. কিন্তু তার

সম্বন্ধে একবার তারা আলাপ করেছিল নিজেদের মধ্যে। যোশেপ বলেছিল—ওর পূর্বপুরুষ বোধ হয় ফরাসী দেশ থেকে এসেছিল আমাদের দেশে। ফরাসীদের অমন নাম হয়। রুথের মনে কৌতূহল ছিল, কাজেই যোশেপ প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে মধ্য ইউরোপে প্রচলিত কৌলিক উপাধি নিয়ে, কোনটা কোন দেশের পক্ষে স্বাভাবিক, সেটা অন্য দেশে গিয়ে কিভাবে উচ্চারণে ক্রমশ বদলে যায়—এমন সব আলোচনা ক'রে গেলো চলতে চলতে। রুথ তার পাশে পাশে হেঁটে যেতে যেতে বেশ মন দিয়েই শুনলো। কিন্তু এতে তার কৌতূহল মিটলো না। মিটবে এমন আশাও ছিল না। তার ধারণা হয়েছে সেণ্ট সাইমনের ছেঁড়া স্মক্ ফ্রকের নিচে অন্তত সে একবার একটা পিতলের তারা দেখতে পেয়েছে, যার গায়ে কলঙ্ক জমলেও, অস্পষ্ট আলোয় যা চিক চিক করছিল। কোন লিজিঅনের সভ্য হওয়ার চিহ্ন? অথচ এ নিয়ে আলাপ করতে তার সাহস হচ্ছিল না। এ রকম তারা এর আগেও সে দেখেছে ব'লে তার মনে হয়েছে। তার ছেলের বন্ধুদের, যারা অনেক সন্ধ্যাতেই আসতো তাদের ফ্ল্যাটে, কোটের বুকে লাগানো দেখেছে। তার ছেলে তারাগুলো নেহাত পিতলের তৈরী ব'লে রসিকতা ক'রে হাসতো। ছেলের হাসি ছেলেকেই মনে করিয়ে দেয়। আর তখন সব সাহসই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এখন তা হ'লে চলবে না, কারণ অ্যাভলনের সরাই কোথাও আছে এবং সেখানে পৌঁছুতে পারলেই ওরা আসবে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে। রুথ বুঝতে পারলো তার নিজের চোখের জলের স্বাদই সে পাচ্ছে। তা হ'লে সে ঠোঁট দুটোকে চেপে রাখতে পারে নি, তারা কাঁপছে।

অ্যাভলনের সরাই-এর দিকেই উদ্বাস্তুদের দলটি এগিয়ে চলেছে। পথ চলার শ্রম, এবং উদ্বাস্তু হওয়ার হাজার রকমের অসুবিধার কথা—এক কথায় অভিজ্ঞতা কম হয় নি বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে অন্যতম নির্ভরযোগ্য বক্তা বোধ হয় জন। জন নিজের শহরে রাজমিস্ত্রী ছিল। অন্তত তাই সে বলতো নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে। সে জানতো এটা তার দম্ভের অনুচিত প্রকাশ, এবং এই অনুচিতের বোধ থেকেই সে এমনটা বলতো তা সে জানতো না। কারণ রাজমিস্ত্রী হ'য়ে জীবন সুরু করে উদ্বাস্তু হওয়ার ঠিক আগে যেখানে পৌঁছেছিল সেখানে রুপোর কর্ণিক হাতে করেও তাকে ইট বসাতে হ'তো না। কিন্তু কিছুই সে সঙ্গে আনতে পারে নি, অন্য দিক দিয়ে সে যোশেপের চাইতে ভাগ্যবান। কারণ যোশেপের ছেলের পক্ষে যা সম্ভব হয় নি তার মেয়েদের—দুটি মেয়ে তার—পক্ষে সেই কাঁটাতারের সীমান্ত পার হওয়া সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এসবের মধ্যে এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যার জন্য সে পথের রোজনামচা রাখবে। এই একটা বিশেষত্ব ছিল সে

রোজনামচার যে তারিখ তাতে খুব কমই লেখা হয়েছে। তার ফলে এ রকম মনে হয় যে লেখকের কাছে সব দিনগুলি মিলে একটিমাত্র দিনে পরিণত হয়েছে। তা হ'লেও তার রোজনামচা, যা তার পুরনো নোট বই-এর এখানে সেখানে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই ফেলে রেখে আসা ব্যবসা সম্বন্ধে টুকিটাকি মন্তব্যের নিচে, পেনসিলে লিখে রাখা মতামতমাত্র; আমাদের আলোচনার দিক দিয়ে মূল্যবান, কারণ তা থেকে উদ্বাস্ত দলের পথপরিক্রমার একটা ধারণা করা যায়। উদাহরণ হিসাবে দু তিনটি দিনলিপি উদ্ধার করা যেতে পারে।

এই গ্রামের পথে ওমনিবাস পাওয়া যাবে ভাবা যায় নি। কোন বিশেষ গন্তব্য নয়, ড্রাইভার বলেছিল, এই হাই রোডের উপরেই মাইল পনরো পরে সে বাঁক নেবে, ততদূর সে পৌঁছে দিতে পারে। অনির্দিষ্ট থেকে আর একটি অনির্দিষ্ট বিন্দুতে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু হাত দিতে ঘৃণা করে, চড়তে ভয় হয় এরকম ওমনিবাস কাদের কাজে লাগে? গ্রামের কৃষকরা মেলায় যায়? উৎসবের মতো মনের ভাব থাকে তাদের তখন, বোধ হয়, তাই নিজেদের ঘোড়ার গাড়ির বদলে এই বাসটাকে ভাড়া করে। বাসের দু-একজন যারা যাত্রী ছিল, তাদের কারো কারো গলায় উৎসবের ভঙ্গিতেই রুমাল জড়ানো। বিশেষ কারো জন্যেই তারা বাসে ওঠে নি, শাশার পায়ে ফোসকা পড়েছে এটাকেই কারণ হিসাবে দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা কেমন হ'লো না? বাফ রঙের কনুই-ছেঁড়া পুরনো কোটপরা, গলায় হলুদে রুমাল জড়ানো, সেই যাত্রীটি নিজেকে বোধ হয় নিজের হারেমে উৎসবরত কোন তুর্কী সুলতানের মতো কিছু মনে ক'রে থাকবে। সে তার বিদেশী, সুতরাং জনের কাছে দুর্বোধ্য, ভাষায় চিৎকার করছিল, গান করছিল, শাশার উরুতে চাপড় দিয়ে রসিকতার মর্মটা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর জন তখন নিষ্ক্রিয়, কতকটা সুলতানী হারেমের খোজা পাহারাদারদের মতো, সেই বেহায়া ইতরতার সাক্ষী হ'য়ে বসে রইলো; কিন্তু ঠিক খোজা পাহারাদার তো নয় সে। তার মন থেকে উঠে একটা ভয়ঙ্কর কালো, ভয়ঙ্কর হিংস্র, তেমনি অসম্ভব অসহায় কিছু তার হৃৎপিণ্ডটাকে কামড়ে ধরেছিল। উদ্বাস্তদের পক্ষে যা সম্ভব তাই করেছিল শাশার মা। জনের গলার টাই খুলে দিয়েছিল, জলের বোতল থেকে রুমাল ভিজিয়ে জনের কপাল, ঘাড় মুছে দিয়েছিল। কিন্তু ওমনিবাস থেকে নেমেই ড্রাইভারের সঙ্গে যা ঠিক হয়েছিল তার চাইতে বেশী দু-এক ফ্রাঁ তাকে দিয়েছিল জন। তার হাত ধরে তাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়েছিল। আর শাশার মা তখন নিজেকে ধরে রাখতে না-পেরে শাশার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছে। ঠিক তখনই যেন কালো একটা ভয় জনকে মুহ্যমান ক'রে দিলো। কি আহাম্মক সে! হাসি এবং ভাবভঙ্গি দেখে মনে

হচ্ছিল পাসপোর্টহীন এই ভ্রমণকারীদের কথা লোকটির জানা আছে একরকম সহানুভূতিই বরং আছে তার—যা প্রায় ধর্মভাবের মতো। কি হয় কেউ যদি শাশার উরুতে চাপড় মেরে রসিকতা ক'রে থাকে? এ কেমন রাগ তার? এ কেমন বেহিসেবী রাগ?

অ্যাভলনের সরাই-এর দিকেই সকলেই চলেছে। কিন্তু সকলেই পৌঁছুবে এমন কথা নেই। ভ্যান ব্রনও পারলো না। সে যুবক ছিল, যোদ্ধা ছিল, লেফটানেণ্টের ইনসিগনিয়া তার প্রমাণ। কিন্তু হয়তো ক্ষয়রোগ ছিল তার। যুদ্ধ থেকে অনেকেই এমন রোগ নিয়ে ফিরেছে শত্রুপক্ষের বন্দীশালায় না-গিয়েও।

গ্রামটার নাম কারো জানার কথা নয়। যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ বিখ্যাত হ'য়ে উঠে যুদ্ধ চলতে চলতেই বিস্মৃত হয়েছে, এমন কোন গ্রামই হবে। দলের প্রায় সকলেই ক্রমশ এসে এসে কিছু দূরে দূরে ভাগ হ'য়ে হ'য়ে বসেছে বিশ্রাম করতে। কিন্তু এখনও অনেকদিন পরেও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজ করছে ব'লে মনে হয়। শহরের ধ্বংসস্তূপ যেমন হ'য়ে থাকে তেমন নয়। ছোট ছোট কয়েকটি বাড়িই ছিল এ গ্রামে তাদের ধ্বংসস্তূপ, ধ্বংসের ছবিতে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমন করেই সাজানো। গ্রামে ঢুকবার মুখে একটা ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ। তারপর কামানের গোলায় তৈরী গহ্বর সমেত পথটা যতই এগোতে থাকে, অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেক ধ্বংসের চিহ্নের মধ্যে অযত্নে পড়ে থাকা জীবনের স্মৃতিবাহী ছোটখাটো জীবনের উপকরণ ছড়ানো—একটা ভাঙা খেলনা, একটুকরো খবরের কাগজ, পথের পাশে একটা লাইটপোস্ট, যার গায়ে বিভিন্ন কোণে লাগানো কালো এনামেলের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা অন্য কয়েকটি নগণ্য গ্রামের নাম পড়া যায়।

এখানে তাদের ভালোই লাগছিল—তার কারণ এখানে তারা ছাড়া কেউ ছিল না। এমন কি তাদের দু-একজন যেন পথের ধারের সাইনপোস্টটাতে একটি নাম খুঁজলো—যে নামটা লিখিত অবস্থায় কোথাও তারা দেখে নি কিন্তু যা তাদের মনের মধ্যে যেন লেখা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সিনেমায় বা চিত্রে সাধারণত যা থাকে না তেমন কিছু ছিল। একটা ঘরের ধ্বংসাবশেষে—আগুন ধরে গিয়েছিল তা দেয়ালের কালিতে বোঝা যায়—একটা ঘোড়ার কঙ্কাল। মাটিতে প'ড়ে না থেকে একটু যেন খাড়া হ'য়ে আছে সেটা, দানা-দেয়ার টাবে আটকে যাওয়ার ফলেই হয়তো। আর সেই কঙ্কালের দাঁতগুলোতে বীভৎস হাসির মতো একটা হ্রেষা জড়ানো।

এটা দেখেই কি ভয় পেয়েছিল ভ্যান ব্রন? কিন্তু ভয়ের চাইতেও বড় ঘটনা ঘটেছিল। সে তার মার্কিন রিভলবারটা দিয়ে নিজের মাথার খুলি ফাটিয়ে দিল।

ভ্যান ব্রন খুব সম্ভবত ক্ষয়রোগীই ছিল ; (নতুবা আতঙ্ক রোগের কথা বলতে হয়, আর সে রোগের নাম কে কবে শুনেছে ?) তাদের আশা একটু বেশী স্পর্শকাতর হয়, সহজেই জ্বলে ওঠে, তেমনি সহজেই নিবে যায়। অবশ্যই সাইন-পোস্টের গায়ে কোন ফলকেই 'অ্যাভলন' লেখা ছিল না। সে কি খুব জোর দিয়ে আশা করেছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে বাঁকানো কোন ফলকে লেখা থাকবে—অ্যাভলন ৪২ কিঃ মিঃ ?

কিন্তু কান্না বোধ হয় সংক্রামক হ'তে পারে। হঠাৎ অনেকেই যেন কাঁদতে স্থরু করলো। ফুঁপিয়ে কেউ, কেউ রুমালে চোখ ঢেকে। অথচ ভ্যান ব্রনকে কেউ চিনতো ব'লে মনে পড়ে না। নিরর্থক, একেবারেই নিরর্থক শোকের দিক থেকে। উত্তর সমুদ্রের কোন শীতের রাতে শীলরা দল বেঁধে এমন কাঁদে বটে। যেন কোন অদ্ভুত উপায়ে সকলেরই বয়স ক'মে গিয়েছিল।

একদিন যেমন অনেকে কেঁদেছিল, কেন এবং কবে তা ঠিক মনে পড়ছে না (জনের), আজ আবার সকলে হাসছে। সবাই দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে প'ড়ে হাসছে তা নয়। প্রফেসর যোশেপের মুখে একটা হাসি খেলা করছে, তার চশমার উপরে প্রতিবিম্বিত আলোর শিখার মতোই। তার স্ত্রী কেরোসিন স্টোভে চায়ের জল ফোটাচ্ছে পথের ধারে ব'সে। সে কিছু ব'লে থাকবে, নিজে ব'লে নিজেই খুশী হয়েছে খুশীটা তার মুখে জড়িয়ে আছে। জনের দল—সে নিজে, শাশা, মিশা এবং তাদের মা—বসবার মতো জায়গা খুঁজে নিতে এগিয়ে চলেছে। যোশেপের কাছে পৌঁছানোর আগেই সে আরও দু-একটা উপদলের পাশ দিয়ে এসেছে। নিনা তার মাথায় সাদাপাড় টকটকে লাল রঙের রুমাল বেঁধেছে। সে দুটো গাছের ডালে দড়ি টাঙিয়ে জামা কাপড় মেলছে, গুন গুন ক'রে একটা স্থরও ভাঁজছে যেন। কিন্তু বুড়ো আইজ্যাকের হাসিটাই সব চাইতে স্পষ্ট। পুরনো স্টেশনের ধারে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের পিছনে, যে বুড়ো তামাকের একটা দোকান রাখতো, কতকটা তারই মতো, ছুঁচলো চিবুক সমেত তার টাক মাথাটা যেন একটা বড়ো ডিম যার উপরে তুলো লাগিয়ে ভুরু আঁকা হয়েছে। লম্বা লম্বা শুকনো হাতপা লটপট করে তার। সেই লটপটে ডান হাতখানা, যেন তা সাইনপোস্টের গায়ে লাগানো তেরছা ফলক, সামনের দিকে বাড়িয়ে দোলাতে দোলাতে খুঁত খুঁত ক'রে হাসছিল। এরকম মনে হ'তে পারে সে সামনের দিকে কিছু একটা দেখিয়ে দিয়েছে, আর তা সকলকেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে যেন রটেও গেলো—যেমন ক'রে ঝরা পাতা থেকে বসন্তের কথা রটতে থাকে—অ্যাভলনের কথা নতুন ক'রে কেউ বলেছে। কিন্তু কে

বলতে পারে? এমন কি সম্ভব অ্যাভলনের সরাইতে যারা আসবে তাদের দলেরই কেউ সমস্তটা পথ সঙ্গে সঙ্গে থেকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে? স্বভাবতই, তা হ'লে, সে নিজেকে গোপন রাখবে। এই প্রশ্নটাই যেন অনেকের মনে একটা আশ্বাসের ঢেউ তুলে চলেছে হাসির আড়ালে। এরকম সময়ে সহযাত্রীদের অনেকের মুখ নতুন ক'রে চিনতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। সে কি বুড়ো আইজ্যাক, কিংবা সেণ্ট সাইমন? সেণ্ট সাইমনের মুখোশের কাছেই প্রশ্নটা একটু বেশী কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। মুখোশ মাত্রেরই অমন কৌতূহল জাগাবার যোগ্যতা আছে অবশ্য।

কিন্তু কেউ যেন সত্যি বলেছে অ্যাভলন আর বেয়াল্লিশ কিলোমিটার।

জনের রোজনামচায় বুড়ো আইজ্যাকের কথা আছে। এতদিন প্রায় নিঃশব্দে চলেছে সে অনুল্লেখযোগ্য ভাবে। এই পাহাড়টার কাছাকাছি এসে সে যেন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অথচ পাহাড়টা খুব একটা উঁচু কিছু নয়, যদিও পথে এই প্রথম পাহাড় ব'লে তাকে কিছু সম্ভ্রম না দেখালে চলে না। আইজ্যাকের পায়ের তলা শির শির করে উঠছে এই ভেবে—চূড়ায় উঠতে সে হয়তো পারবে, কিন্তু সেখানে গম্বুজের মতো জায়গাটায় চোখ খুলে দাঁড়াতে সে কি পারবে? ইদানীং নিজের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে তার মাথা ঘুরে উঠতো নিচের দিকে চাইলে। এটা একটা ক্রাইসিসের মতো কিছু ব'লে মনে হচ্ছে। আইজ্যাক বলার মত স্পষ্ট ক'রে ভাবলো. কিংবা বলা এবং চিন্তা করাকে যেখানে পৃথক করা যায় না, সেখানে শব্দ দুটি শোনা যাচ্ছে—আভে মারিয়া, আভে মারিয়া।

কিছুদিন থেকে কিছু একটা যেন সে অনুভব করছিল তার বুকের মধ্যে এখন তা উঠে এলো। অনেক সময়ে পুরনো শ্লেষ্মা বুকে আটকে শরীর অস্থির করে, পরে সেটা উঠে গেলে শান্তি পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে বুড়ো বয়সে আইজ্যাক এটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। খানিকটা কাশি ফেললো সে। আভে মারিয়া! তা কথাটা প্রায় চল্লিশ বছর পরে উঠে এলো মনের তলা থেকে। আইজ্যাক মিট মিট করে হাসলো যেন খুব একটা আবিষ্কার করেছে সে।

সামনের পাহাড়টার চূড়ায় একটাও গাছ নেই। খয়ের রঙের পাহাড় আর তার গায়ে ছাই রঙের পথ, যেখানে পাহাড় ভেঙেছে সেখানে পাথরের রং সাদা দাঁতের মতো ধারালো।

একটা তুলনাই যেন আসছে তার মনে যে জন্তে তার ধারণা হচ্ছে, চল্লিশ বছর আগেও সে একবার যেন উদ্ভ্রান্ত হয়েছিল। অবশ্য এখন কিছু আর এসে যায় না, যদিও সে পরে জানতে পেরেছিল, রেবেকার ক্ষয়রোগ ছিল আর তার সন্তানও

কোনদিন হয় নি। কিন্তু একদা সে ধর্ম এবং সুতরাং সমাজ থেকে উদ্বাস্ত হ'য়ে রেবেকার বাবার তামাকের দোকানের পিছনে সেই ছোট ফ্ল্যাটটায় পৌঁছেছিল এক সন্ধ্যায়, যেখানে রেবেকার আপত্তি ছিল না শেমিজ প'রে তার সামনে দাঁড়াতে। তার পর থেকে দশ বারোটা বছর—এই মোটামুটি সময়টা, নিচের তামাকের দোকান আর দোতলার শোবার ঘরের বাইরে যায় নি সে, কারণ সেখানে রেবেকা ছিল, সবুজ শেমিজ পরা, লেসের শেমিজ পরা, লাল শেমিজ পরা, লাল, সোনালী, সবুজ মদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শেমিজ পরা, হাতীর দাঁতের তৈরী রেবেকা।

ধর্ম আর সমাজ এক না হ'লেও তাদের গণ্ডি দুটো সমকেন্দ্রিক বৃত্তদ্বয়ের মতো। আর তখন—পঁচিশ বছর বয়সেই—একটা ধর্মীয় ক্রাইসিসের অভিজ্ঞতা হ'য়ে গিয়েছিল আইজ্যাকের। যদিও ধর্ম বিষয়টাই যৌবনের পক্ষে আকর্ষণীয় নয়, সভ্য সমাজে যুবকদের চার্চে যাওয়ার রীতি থাকলেও। উপরন্তু সে তখন ন্যাশনাল আর্মির এক সাবল্টার্ন, আর তার চোখের সামনেই একটি একুশ বছরের মেয়ে বিরাজ করছে। তার বেলায় কিন্তু যৌবনই, অর্থাৎ এই মেয়েটিই, ক্রাইসিসটাকে টেনে এনেছিল। আইজ্যাক আবার হাসলো—বুড়োটা একটা বুড়ো শেয়ালই ছিল।

কিন্তু এখানে আসল কথা হচ্ছে—রেবেকাকে দুই বাহুর উপরে তুলে নিলে পবিত্র কিছু মনে হ'তো না ?—যদিও তা একটা উষ্ণ নারী দেহ। উদ্বাস্ত হ'লেই অপবিত্র কিছু হয় না। কে জানে মারিয়া রেবেকার মতো হালকা গড়নের ছিল কি না।

এখানে আসল কথা এই নয়—সাইনাগগ আর চার্চের মধ্যে যে পথ তা পাহাড়ী পথের মতো ঢালু, যে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে মহত্তম মাতা মারিয়ার কথা মনে হবে। আইজ্যাক পবিত্রতা কথাটাকেই আবার অনুভব করলো।

এর একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চায় আইজ্যাক। নিনার জন্যই—যদিও সে নিমিত্ত মাত্র হ'তে পারে, মনে আসছে এ সব কথা। নিনা নোংরা মেয়েমানুষ, তা বোঝা যায়। এবং তখন বিশেষ ক'রেই বোঝা গিয়েছিল রুথের নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে, যখন নিনা যোশে-পকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পাহাড়টা পেরোলেই সত্যি একটা রেল স্টেশন পাওয়া যাবে কিনা, যে রেল স্টেশনে কয়লা টানার ফ্রেট কারে তাদের জন্য জায়গা হবে। গৃহিণী মেয়েরা ওদের দেখা মাত্রই বুঝতে পারে। তাছাড়া নিনার বাদামী-সাদায় মেশানো চুলে, খয়েরী চেক সুতোর গাউনে এমন একটা সুস্থ পশুর ভাব আছে, যা থেকে ওর শরীরটার কথাই মনে হয়।

কিন্তু রাত্রিতে আইজ্যাক চাপা গলায় একটা মৃদু রিনরিনে আওয়াজ শুনতে

পেয়েছিল। সেটা অবশেষে একটা প্রার্থনার রূপ নিলো। মহান মাতা মেরির কাছেই কেউ প্রার্থনা করছে। মাথা তুলে এদিক ওদিক চেয়ে সে দেখতে পেলো নিনাই যেন —নিনা ছাড়া আর কে—প্রার্থনা করছে। একটা ক্ষীণ মোমবাতি জ্বলছে একটা পাথরের উপর। অস্পষ্ট ছায়ার মতো কেউ যেন এগিয়ে এলো সেই আলোর দিকে। যেন অতিকায় একটা পুরুষ, যার গায়ে রোমান চার্চের পাদরীদের মতোই পোশাক, যদিও সে ধোঁয়াটে অন্ধকার এবং মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় তৈরী। মোমবাতি নিবে গেলে নিনা শুয়ে পড়েছিল, আর সেই আবির্ভাবটাও মিলিয়ে গেলো। মিলিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা আইজ্যাকের বিশেষ ক'রে মনে আছে। কেউ দাঁড়িয়ে থেকে তার পরে বসলে যেমন পা দুখানা প্রথমে অদৃশ্য হয়, তেমন ক'রে যেন দৃশ্যটা মিলিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ আগে নিনা, সেণ্ট সাইমন, জনের পরিবার পর পর তাকে পার হ'য়ে চলে গিয়েছে পাহাড়ের দিকে। সে সেণ্ট সাইমনকেই জিজ্ঞাসা করেছিল—গাড়িটা পাওয়া যাবে তো?

আইজ্যাক এবার হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়টার দিকে চলতে সুরু করলো।

সকালে উঠে সে মনে করেছিল উৎকণ্ঠায় তার ঘুম হয় নি, খুব সকালে সকলের আগেই সে উঠে পড়েছে, কিন্তু সে দেখতে পেয়েছিল নিনা ইতিমধ্যে উঠেছে, খয়েরী একটা নেটে সে তার বাদামী-সাদা চুলগুলোকে জড়াচ্ছে, আর তার কিছু পিছনে নিজের বাঁধা বিছানার উপরে ব'সে সেণ্ট সাইমন কফি খাচ্ছে।

আভে মারিয়া। আইজ্যাক হাসলো খুঁত খুঁত ক'রে। কয়লার গুঁড়ো থাকবেই ফ্রেট কারে, আর ভিড়ও হবে। হয়তো সীমান্ত পার হওয়ার সময়ে—কি জানি আর একটা সীমান্ত পার হ'তে হবে কিনা—লোহার দরজাগুলোও এঁটে দেবে ওরা। কিন্তু এখানে আসল কথাটা—একটা ক্রাইসিস নয়? ধর্মের ক্রাইসিসেও একটা যন্ত্রণা থাকে।

পাহাড়ের উপরে ইতিমধ্যে কাউকে দেখা যাচ্ছে, তার চেহারাটা আকাশের গায়ে কেটে বসেছে যেন। অবশ্য কাল রাত্রিতে সেণ্ট সাইমনই হয়তো নিনার প্রার্থনার জায়গার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পাহাড়টাকে লক্ষ্য ক'রে থাকবে।

পাহাড়টাকে পার হয়েছে উদ্বাস্তুদের প্রথম দল, আর প্রথম দলেই নিনা পাহাড়তলির ছোট রেল স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। তার আগে যারা এসেছে তাদের মধ্যে সেণ্ট সাইমন আর জনের পরিবার আছে।

নিনা দেখতে পেলো, জন ইতিমধ্যে নিজেদের বসবার জায়গা খুঁজে নিয়েছে

পুরনো একটা পিয়ার গাছের নিচে, আর সেণ্ট সাইমন লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে যেন লাইনটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যেখানে তারা বসেছে তার থেকে দূরে, বরং বিকেলের আলোয় বাদামী হ'য়ে ওঠা একটা বনের কাছাকাছি, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ব'লে মনে হচ্ছে। অনেকটা দূরে চ'লে যাওয়া গাড়ির শেষে গার্ডের কামরা যেমন দেখা যায়। নিনা ভাবলো—আজই ব্যাপারটা প্রমাণ হ'য়ে যাবে। অন্য সকলে এসে পৌঁছানো পর্যন্ত এখন অপেক্ষা করা চলছে, কিন্তু সকলে পৌঁছে যাওয়ার পরেই যে গাড়িটার দিকে যাওয়ার জন্য প্রথমে উঠে দাঁড়াবে, সেই যে প্রকৃতপক্ষে এই দলটিকে নিয়ে চলেছে তা বোঝা যাবে। কিন্তু কে হবে সেই লোকটি? প্রফেসর, আইজ্যাক, জন কিংবা সেণ্ট সাইমন? নিনা হাসলো মনে মনে আর সেই হাসির প্রভায় তার মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও সে এ সুযোগটাকে নষ্ট করবে না, বরং চোখ খোলা রেখে সে দেখে নেবে, যদিও উত্তেজিত হ'য়ে কোনদিকে লক্ষ্য না রাখবার যথেষ্ট কারণ থাকবে।

স্টেশনটা খুব ছোট এবং একেবারেই নির্জন। স্টেশনের ঘর বলতে একখানিই ঘর আছে, আর তার দরজাতেও একটা মরচে ধরা তালা ঝুলছে। স্টেশনের সীমাটাকে চারিদিকে দৃশ্যপট থেকে আলাদা করাব জন্য যে লোহার বেড়া ছিল তা অনেক জায়গাতেই নেই, যেখানে আছে সেখানে রংচটা, সুতরাং মরচে ধরা, লোহার গায়ে শুকনো লিকেন। চোখে দেখা এই খুঁটিনাটিগুলো বিড়বিড় করে আওড়ালো সে, যেন আগে থেকে জানা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছে। তার পরে সে ভাবলো, কিন্তু গাড়িটা হয়তো ওখানেই থাকবে, আর উদ্বাস্তু দলটিকে ওখানে গিয়ে উঠতে হবে। ব্যাপারটা তো প্রকাশ্য কিছু নয়। ডানদিকে পাহাড়টা এখন গাঢ় বাদামী হ'য়ে উঠেছে, আর এখান থেকে পাহাড়ের গায়ে একটা গ্রাম চোখে পড়ছে—গ্রাম ঠিক নয়, বাদামী পর্দার মধ্যে দিয়ে দেখা দু-একটা বাড়ির সাদা দেয়াল, লাল ছাদ। নিনা অনুভব করলো, ওই গ্রামটার নিচেই, কিংবা আড়ালেই হয়তো, কয়লার সেই খনি যেখান থেকে কয়লা নেয়ার জন্য এই স্টেশন।

শুকনো পিয়ার গাছটার নিচে একটা পুরো সংসারই যেন গুছিয়ে নিয়েছে জন—শাশা, মিশা আর তাদের মাকে নিয়ে। ইতিমধ্যে ওরা খাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। তাদের যুক্তি এরকম হ'তে পারে, যে হঠাৎ কখন গাড়িটা এসে থামবে, আর তখনই তাড়াতাড়ি ক'রে উঠতে হবে সেই গাড়িতে। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় ওরা বুঝতে পারে নি। নিনা ভাবলো। যদিও এটা নিনার আন্দাজ মাত্র, এবং তার পক্ষে এ সব বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলার মতো কোন অভিজ্ঞতাই নেই; যদিও

সে বারোয়ারী স্নানের ঘরে মিশাকে স্নান করতে দেখেছিল অনেকক্ষণ ধ'রে—এক সপ্তাহের স্নান একদিনে। অন্যদিকে শাশাকে যুবতী বললে মিশাকে কিশোরী বলতে হয়। জনের স্ত্রীর নিশ্চয়ই বুঝতে পারা উচিত, কিংবা সে হয়তো বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তার ঠোঁটের দুপাশে চিন্তার চিহ্নের মাঝে মাঝে দুঃখের মেছেতা আছে—তার ফলে নতুন কোন চিন্তা-ভাবনার ছাপ আর স্পষ্ট ক'রে ফোটে না। অথবা—কথাটা নিনার মনে হঠাৎ নির্লজ্জ সাহস নিয়ে ফুটলো—হয়তো জনও জানে, কিন্তু এটাকে ওরা হয়তো নতুনের সূত্রপাত বলে মনে করেছে। ওপারের প্রথম নতুন মানুষ। সম্ভবত এ ব্যাপারে মিশার অপরপক্ষ সীমান্তের ওপারে থেকে গিয়েছে, সুতরাং পুরনো বীজ থেকে নতুন চারাগাছ। মিশা এত ছোট, হয়তো তখন তার মৃত্যুও হ'তে পারে, ভগবান না করুন। কিন্তু নতুন প্রাণটুকুকে জনের স্ত্রী হয়তো বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এ যেন প্রার্থনার মতো পবিত্র কোন কথা। কিন্তু কেন মন জুড়ে যাচ্ছে এ কথায় তা সে বুঝতে পারছে না।

চোখ তুলতে সেণ্ট সাইমনও আবার চোখে পড়লো। সে তখন রেল লাইন থেকে সরে এসেও দূরের রেল লাইনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখে, নিনা চিন্তায় যা খুঁজছিল তার যেন একটা অবলম্বন পেলো, মনে পড়লো, তার মায়ের মৃত্যুর পরে কফিনের ধারে যে প্রার্থনা করেছিল, সেই পাদরীর মুখেই পুরনোর বীজ থেকে নতুনের জন্মের কথা কিছু শুনেছিল।

ওদিকে পিয়ার গাছটার নিচের সংসারে তখন শাশা চর্বিতে কিছু ভাজছে, আর পাশে ব'সে মিশা চায়ের জল ফোটাচ্ছে। তার মা জনের এক জোড়া মোজা হাতে নিয়েছে সারতে। শাশার চাটু থেকে পোড়া পোড়া একটা মিষ্টি গন্ধ উঠছে ধোঁয়ার সঙ্গে। জনের স্ত্রীর হাতের কাঁটা দুটো মৃদু দ্রুত শব্দে চলছে। জন তার হ্যাভারস্যাক থেকে তামাকের কৌটো আর পাইপ বার করলো। তা করতে গিয়ে রোজনামচার বইটাও চোখে পড়লো তার। এখন কিছু লিখলে চলে—এরকম একটা আয়াসের ভাবও এলো তার মনে। পাহাড়টার দিকে সে চাইলো পাইপে তামাক ভরতে ভরতে। সমতল মাটির উপরে বাঁধানো পথ এবকম দেখা যায় না, পাহাড়ের গায়ের পথটাকে যেমন দেখা যাচ্ছে—যেন তার নিজের অতীত বলতে যা বোঝায় তারই একটা অংশ। কিন্তু প্রফেসরকে নামতে দেখলো জন। লোকটা মোটা, পিঠে হ্যাভারস্যাক, একটা বোঝাও। পাশে রুথ, তার হাতে একটা লাঠি। তার পিঠেও একটা বোঝা। কষ্ট হচ্ছে, ওদের নামতে দেখেই বোঝা যায়, হয়তো ওদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। কষ্টের শেষটাই সব কষ্টের চূড়ান্ত হ'য়ে থাকে। স্টেশনে পৌঁছুলেই তখন আবার সাহস ফিরে আসবে, এখন যদিও এ পথটুকু নামতে আর

ঘণ্টা লেগে যাবে হয়তো। আর এক জন প্রফেসরের পক্ষে বাত হওয়া, অসম্ভব নয়, হয়তো বা আছেও তা যোশেপের। পাইপে আগুন ছোঁয়ালো জন।

স্টেশনটা খুবই ছোট—তাই ব'লে সে নিজের শহরের নতুন স্টেশনটার মতোও কিছু আশা করে নি—আর সম্ভবত এ সব ব্যাপারে এমন স্টেশনই উপযুক্ত, এবং এ বিষয়ে তার পূর্বের অভিজ্ঞতা যখন নেই তখন মেনে নেয়াই ভালো।

কিন্তু কিছু লিখবার কথা সে ভাবছিল—এই চিন্তায় ফিরে এলো সে। রোজ-নামচার খাতাটাকে বার করলো। কয়েকটা পাতা উলটে একটা সাদা জায়গা সে দেখতে পেলো। ঠিক সাদা নয়—উপরের দিকে লেখা আছে। ফার্মের বুড়ো অ্যাকাউন্ট্যান্ট ম্যালিঞ্জারকে বেরিয়ে আসার কয়েক দিন আগে বিদায় দিয়েছিল জন। লেখা আছে ম্যালিঞ্জার রিটায়ার করবে। সেই সভায় ম্যালিঞ্জার কেঁদে ফেলে বলেছিল—তাহ'লে আমি আজ থেকে ফার্মের কেউ নয় আর? যদিও সে মাইনে-করা কর্মচারীই শুধু। কিন্তু দেখো নিনা কেমন সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে—গলাটা সামনের দিকে বাড়ানো। ওকেই উদ্‌গ্রীব হওয়া বলে। কিন্তু পথের পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছেও যেন সে। তা'হলেও এটা স্বাভাবিক—একটা জীবনের হিসাব ক'রে করা পরিশ্রম—যা আদর্শের মতো পবিত্র ছিল—তা যদি একদিনেই নিরর্থক শূন্যতা হয়, তাহ'লে কষ্টের কারণ হয় না? তবু তো ম্যালিঞ্জার কর্মচারী ছিল। কিন্তু সময়েই সব হয়—এই স্টেশনটা পাওয়ার পরেও সময় ভবিষ্যতের দিকেই চলবে আরও অনেকদিন। ওপারেও বাড়িঘর আছে—কেমন কিনা?

কি ভাজছে আজ শাশা? জন মুখ তুললো—ভারি সুগন্ধ চর্বিতে ভাজা এই শাকটার।

আইজ্যাক তখন আর হামাগুড়ি দিয়ে চলছে না বরং সামনে হাত রেখে টাল সামলাতে সামলাতে সোজা হ'য়ে চলার চেষ্টা করছে। যোশেপের দলে লোক বেশী নেই ব'লেই যেন আইজ্যাক তার সঙ্গে ভিড়েছে, যদিও আসল কারণটা এই আইজ্যাক একা চলতে পারছিল না তার স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য, আর যোশেপ অন্যদিনের তুলনায় ধীরে চলেছিল, যেহেতু সংসারের সমস্ত বোঝা স্ট্র্যাপে বেঁধে অনভ্যস্ত পিঠে ঝুলিয়ে পাহাড়ে উঠতে সে সহজে পারছিল না। সে ভাবছিল আরথ্রাইটিস নামে যে রোগটা আছে তা সংক্রামক কি না, অথবা তা কি আকস্মিক, আর এ ভাবতে গিয়ে তার কপালে ঘাম ফুটে উঠছিল। কিন্তু পাশে রুথ যার মুখ ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে। অবশেষে যোশেপ তার গলার মধ্যে কিছু অনুভব করতে লাগলো, কপাল বেয়ে গাল বেয়ে যে ঘাম কপালের মধ্যে দিয়ে

ঘাড়ের উপরে নামছে, তার মতোই কিছু, যেন তা চোখের জল হ'তে পারে।

ঠিক এই সময়ে আইজ্যাক আলোচনাটা সুরু করেছিল: ফ্রেট কারে আলো থাকবে না, আর তা কয়লার গুঁড়োতে ময়লা হবে। বেশ খানিকটা সময় তারা এ নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছিল—কখনও গম্ভীর হ'য়ে, কখনও লঘুস্বরে, খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে মূল্য দিয়ে দিয়ে। অবশেষে তারা দুজনে একমত হয়েছিল ফ্রেট কার তার কয়লার গুঁড়ো এবং গুমট অন্ধকার নিয়ে যুদ্ধের সময়ে যে সব ট্রেঞ্চে তারা কাটাতো শহরে বাস করেও, তার চাইতে খারাপ হবে না। এ আলোচনাটা পথ চলার ব্যাপারে তাদের অনেকটা সাহায্যও করলো।

অবশেষে যখন রেলের লাইনটা চোখে পড়লো তখন তারা হঠাৎ স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এইটাই তো প্রত্যাশার বিষয়, অথচ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। রেলজোড়া তখনও এক কিলোমিটার দূরে এবং তখনও তাদের সম্মুখে এক কিলো-মিটার হাঁটুর জোড়া খুলে দেয়া উতরাই। আইজ্যাকের হঠাৎ মনে হ'লো, পিছনে যারা আসছে তারা কত পিছনে তা যেন দেখা দরকার। একটা অধীরতাই সে সম্ভবত বোধ করলো, ট্রেনটা খুব দেরি না করতেও পারে। যোশেপ, অবশ্য, রুথের দিকেই তাকালো। তার বিবর্ণ মুখে যেন একটা চিন্তার ছায়া নড়ছে। যোশেপ অনুভব করলো সে রুথকে বলতে পারবে—আমরা তাহ'লে পৌঁছে গেলাম দেখো।

এখানে আমরা রুথের কথাও বলতে পারি, কারণ অদ্ভুত রকমে এক বিস্মৃতি তার মনে কাজ করছিল। তার মন অনুভব করতে পারছিল না, যে প্রশ্নটা তার মনে একটা আকুঞ্চিত বেদনার সহযাত্রী হিসাবে দেখা দিয়েছে তা বিশ বছরেরও অতীত এক বিকেলের স্মৃতি। গভীর রাত্রির ব্যাপার যদি হয়, তবে তা হবে একটা পরিপূর্ণতার প্রতীক, দিন যেহেতু রাত্রিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে; আর যদি খুব সকালের দিকে ঘটে, তবে সেটা হবে আগন্তুক আশার ইশারা। এর পরে তার মনে পড়লো—এসব কথাই সে লজ্জায়, আশায়, আনন্দে, বেদনায় ক্লিনিকের সেই পোর্সিলেনের দেয়াল দেয়া ঘরে নার্সের সঙ্গে আলাপ করেছিল যেদিন তার ছেলে হয়েছিল।

মাথাটা নেড়ে সে যেন অস্বীকার করলো, না, না, একথা সে ভাবতে চায় নি, ভাবে নি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো সে, চোরা চোখে যোশেপকে দেখলো, যাচাই করতে চাইলো তার কাছে তার চিন্তা ধরা পড়েছে কিনা। এ ব্যাপারটাকেই বিস্মৃতি বলা যেতে পারে এ জন্য, যে রুথ গোড়ায় ভাবছিল ফ্রেট কারটা গভীর রাত্রিতে ছাড়বে কিংবা খুব সকালে।

চিন্তায় ফ্রেট কারটাকে ফিরে পেয়ে সেটাকেই তার মন আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু চোখের জল তার গালের উপর ঘামের সঙ্গে একাকার হ'য়ে গেলো। সন্তানহারা কোন মা—সেই যেন সব আশার প্রতীক—এরকমের একটা বক্তব্যকে, যা প্রার্থনার মতো পরিপূর্ণ এবং বহু পরীক্ষিত, তার মন স্মৃতিতে খুঁজতে লাগলো। যেন অন্ধকার হ'য়ে আসা কোন ক্রুশের নিচে কোন মা, সে মা-ও কি আশা করছে না কোন এক সরাইয়ে পৌঁছে ছেলেকে ফিরে পাবে, কিংবা সেই শেষ সরাই-ই তার ছেলে।

নিনা আজ রান্না করতে পারলো না উৎকণ্ঠায়। এমন উৎকণ্ঠা তার একারই নয়। সন্ধ্যার পরে রাত্রি আসছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে ততক্ষণে সব উদ্বাস্তুই এসে পৌঁছেছে। অল্প আলোকিত আকাশের নিচে তারা বিশ্রাম নিতে বসেছে। ক্লান্তিতে কেউ নিজের হাঁটুর উপরে মাথা রেখেছে, কেউ পুঁটুলির উপর শরীর ছেড়ে দিয়েছে, যেন মরুভূমির প্রান্তে বিশ্রামরত ক্লান্তিতে অঋজু একদল শান্ত মেষ। কখন গাড়িটা এসে যাবে তার ঠিকানা নেই। কেউ শোয়ার কথা ভাবতে পারে নি।

নিনা একটা চাদর বিছিয়ে বসেছিল তার উপরে। দৃষ্টি কখনও কিছুক্ষণ আগে যেখানে রেল লাইন জোড়া দেখা যাচ্ছিল, কখনও যেদিক থেকে গাড়িটা আসতে পারে, সেদিকে ঘুমের পর্দা সরিয়ে সরিয়ে চলেছে। তখন কথাটা আবার তার মনে এলো ফিরে। সব ব্যবসায়ের মতো তার দোকানদারিতেও প্রতিযোগিতা আছে এবং প্রতিযোগিতা থাকলে যা হয়, সব দোকানেরই বিশেষ আকর্ষণ আছে নতুবা সব ক্রেতাই এক দোকানে যেতো। তা যায় না। নিনার কাছে ছাত্ররা আসতো, পাশের বিক্রেতা তাকে একদিন রসিকতা করে বলেছিল—নিনার ছেলেরা; আর পলিটেকনিকের সেই ছাত্রটা একদিন যা বলেছিল নিনাকে, বেশ মায়ের মতো দেখায়। এটাই হয়তো আকর্ষণ, এই মায়েদের মতো গাম্ভীর্য তার দোকানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কথাটা নিশ্চয়ই লজ্জার, কিন্তু ছাত্রদের আদর তার ভালো লাগতো না এমন নয়, এবং শেষের দিকে ছাত্রদেরই ভিড় হ'তো। কিন্তু সে এই চিন্তায় পৌঁছেছে মিশার কথা চিন্তা করতে গিয়ে, মিশা মা হবে—এই চিন্তা থেকে সুরু করেছিল সে। সকলেই কি তা পারে—এই নতুন হ'য়ে ওঠা? একেবারে যেন প্রথম যৌবনে ফিরে যাওয়ার অব্যক্ত উচ্ছ্বাসের মতো। নিনা এই ভাবলো, কিন্তু প্রশ্নটার উত্তরের দিক দিয়ে সে নিরপেক্ষ নয়, বরং খুব ছোট একটা সলজ্জ হ্যাঁ শুনতেই যেন তার পক্ষপাতিত্ব। অ্যাভলনের ডাক্তাররাই, কিংবা নির্বিশেষে ডাক্তারী বিদ্যাই যদিও এ বিষয়ে শেষ কথা বলার পক্ষে উপযুক্ত, তা সত্ত্বেও এখন এরকম বলা যায়—নিনার সেই অনেক ছাত্ররা নয়, নিনার একমাত্র ছেলে পরে যে

এক সময়ে ছাত্র হবে, আর মায়ের মতো গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ এই শরীরটা যার প্রাণের অপব্যয়ের হেতু না হ'য়ে, প্রাণ হবে, স্নেহ হবে। রেল লাইন জোড়াও অনেক দিনের অপব্যবহারে মলিন কিন্তু তার সম্বন্ধে সেটাই শেষ কথা নয়। মিশা নতুন হ'য়ে উঠবে, যদিও সে পুরনো বীজই বহন করছে। স্বপ্নের মতো একটা অব্যক্ত আবেগের পরিমণ্ডল—পরম সার্থকতার প্রতীকের মতো একটা উষ্ণ শূন্য আলিঙ্গনে নিনা মগ্ন হ'য়ে রইলো। নিনার মনের বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে, একটা অপরিচিত আশার মতো, যেন বাক্যটা মুক্তি পাবে। আমিই রেসারেকসন। এই কথাটাকেই নিনা মনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো ; তা না পেরে এই অনেকগুলো কথায় সে ভাবলো।

কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই কেউ কথাটা ব'লে থাকবে, হয়তো নিঃসংশয়ে নয়, হয়তো অস্ফুট স্বরে, হয়তো ক্লান্ত কোন শ্রমিক যার উচ্চাশা কোনদিন নিরঙ্কুশ উচ্চতায় পৌঁছুতে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু বলেছে কেউ।

ঠিক যখন প্রফেসরের চিন্তাটা পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছে, সে স্থির করেছে প্রায়—হয়তো আর একখানা বই-এ এই অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যের কাছাকাছি কিছু বলতে পারবে সে, এখনও হয়তো তার জন্যে কিছু সময় অবশিষ্ট আছে, তখনই যেন কথাটা সোচ্চার হ'য়ে উঠলো। কোথায় ফ্রেট কার ? একে কি রেল লাইন বলে ? দিনের আলোয় প্রকাশ পেলো, যেন কাল দিনের আলো ছিল না, কিংবা শ্রমিকরা যখন তাদের ক্লান্ত দেহ টানতে টানতে এখানে এসে পৌঁছেছিল তখন দিনের আলো অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, এখন দিনের আলোয় তারা বুঝতে পেরেছে যাকে পাহাড়ের গায়ে কয়লার খাদ মনে করেছিল তারা, সেটা ডিনামাইটের গর্ত। হয়তো কোন কালে পাহাড় ফাটিয়ে পাথর নেয়া হ'তো, হয়তো বিশ বছর আগে, হয়তো তখন ফ্রেট কার আসতো। দেখছো না মরচে ধরা লোহার রেল দুটোর নিচে প্লেট নেই।

মিশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ; আর দিনের উত্তাপ যত বেড়ে উঠতে লাগলো, উদ্বাস্তর দল হাঁপাতে লাগলো তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে, যেন কাল এমন তাপ ছিল না দিনের। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে তারা, তা থেকে যেন অব্যক্ত একটা সাবধানী বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে,—ভ্যান ব্রনের মতো ক'রো না, কেউ যেন ভ্যান ব্রনের মতো ক'রো না।

এটা কি মরুভূমি ? রেল লাইনের ওপারের নেড়া পাহাড়ে ওগুলি কি ক্যাকটাস্ সত্যি সত্যি ?

সাত দিন হ'য়ে গিয়েছে প্রাচীন ক্ষীয়মান একটা প্রস্ত উপত্যকায় বাঁক ঘুরেছে উদ্বাস্তুর দল। কোন এক সময়ে সবুজ ছিল এই পাহাড়ের গা—এখন ধূসর, ধূমল। কোথাও মনে হয় আগ্নেয়শিলার চাঙড়াগুলো ভেঙে পড়বে নিশ্বাস পড়লে, কোথাও মনে হয় পায়ের তলায় গোল ক্ষয়িত শিলাগুলো পিছলে যাবে, আর সবটা মিলে পাথরের গুঁড়োর আঁধিতে তারা পথ হারিয়ে ফেলবে। নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছাই-এর গুঁড়োর মতো পাথরের গুঁড়ো আসছে নাকে, মুখে জমা হচ্ছে।

এখনও ফেরেন্স হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলেছে। অনেকটা ঢালু উঠতে হচ্ছে। এতক্ষণ হাতের লোহা বাঁধানো লাঠিটা সে পাথরে ঠুকেছিল, তারপর হঠাৎ মনে হয়েছে বৃথা শক্তিক্ষয় হচ্ছে। ফেরেন্স থুথু ফেললো। থুথুটাও আঠার মতো, মুখ থেকে সহজে সরতে চায় না। যে রকম মনে হচ্ছে, ঝরনা বা নদীর দেখা না পেলে কাল সারা দিন জলের খোঁজেই কাটাতে হবে। হাত দুটো মুঠ হ'য়ে উঠলো ফেরেন্সের। একটা হতাশ নিরুপায় ক্রোধ চাপা প'ড়ে প'ড়ে অবশেষে স্থায়ী খিটখিটে মেজাজে পরিণত হবে ব'লে মনে হয়েছিল। এখন সে সামনের দিকেই যেতে চায়। ফেরেন্সের মুখটা কালো, আরও কালো দেখাচ্ছে ময়লার জন্যে, শুধু তার চকচকে ধারালো চোখ দেখে, যা মাঝে মাঝে নিষ্প্রভতাকে কাটিয়ে উঠছে, আর তার চিবুকের কাঁচা পাকা গোটি দেখলে মনে হয়, সে হয়তো নিছক শ্রমিক নয়।

কিন্তু এই পাহাড়ের চূড়াটা এখানে থাকবে পথের উপরে, দিন যখন ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত, তা এতক্ষণ বোঝা যায় নি। ফেরেন্স ঝোলাটা পিঠের উপরে ঠিক ক'রে নিয়ে হাত আর পায়ের সাহায্যে উঠতে লাগলো। প্রথম দু মিনিটেই তার হাতের তালুটা একটা ধারালো পাথরে কেটে গেলো, ছাই ঢুকে জ্বালা করতে লাগলো।

নিনাও আবার চলেছে। পা টিপে টিপে চলার মতো ভঙ্গি তার। তার একমাত্র তুলনা হ'তে পারে ধর্ষিতা একটি নারীর সঙ্গে, তেমনি সর্বস্বলুণ্ঠিতা, তেমনি ভবিষ্যৎ মুছে যাওয়া; তার চোখে মুখে ধুলোর আস্তরণ, তার পোশাক ছিন্নভিন্ন। যদিও তার সম্বন্ধে, মনে হ'তে পারে, এ কথাটা বলার খুব বেশী মূল্য নেই।

দুদিনের পথে ছড়িয়ে প'ড়ে উদ্বাস্তুরা আবার চলেছে, যেন শামুকের মতো ধৈর্য তাদের। যোশেপ বা আইজ্যাক অথবা সপরিবারে জন কোথায়, আগে না পিছনে তা সে জানে না। সকাল থেকেই তার সামনে একজন চলেছে, তাকে দেখে যদিও সে বুঝতে পারছে না সেও উদ্বাস্তু কিনা, তাকেই সে অনুসরণ করে চলেছে, কারণ কাউকে অনুসরণ না করলে যেন সে আর চলতেও পারবে না।

এখন আর ভেবে লাভ কী? (এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে চেষ্টা

করছে নিনা)—দলের চেহারাটাও বদলে গিয়েছে—এ যেন অন্য কোন দল। কিন্তু তাতো নয়, পুরনো সেই দলটাই এমন হয়েছে। অবশ্য তার একটা বাস্তবসম্মত কারণও প্রত্যক্ষ—যোশেপ, জন, আইজ্যাক নেই, তাদের বদলে, গ্যাংম্যান সিমার, ট্রাক্টর ড্রাইভার ফ্লিন্ট আর ফেরেন্স আছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষর আড়ালেই যেন এই পরিবর্তনের কারণটা লুকিয়ে আছে, এ রকম অনুভব করছে নিনা আর সেই কারণটার এমন অপ্রাকৃত প্রভাব থাকা সম্ভব, এটা মেনে নিতে গিয়ে অবাক হ'য়ে যাচ্ছে। তখন সেই রেল লাইনের ধারে নিনা গিয়েছিল প্রফেসর যোশেপের কাছে—প্রফেসরের মতো কে আর এত জানতে পারে—যেন প্রবঞ্চনাটাকে তখনও সে যাচাই ক'রে নিতে চায়, যদিও প্রবঞ্চনার দিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে তখন তৃষ্ণার্ত একটা জ্বালাময় সন্ধ্যায় পৌঁছে গিয়েছে, তখনও তবু যেন যাচাই করার মতো কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু প্রফেসরের স্ত্রী রুথ তখন যেন বার বার তার গায়ে জ্বলন্ত কোন অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল। তার কথাটার পিছনে হয়তো বিশ্বাসের জোর ছিল, হোক তা ভুল বিশ্বাস, আর কিছুক্ষণ নিনাও যেন সেই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছিল, কিংবা সেই বিশ্বাসই তাকে মুহ্যমান করেছিল, আসল কথা একটা অনুভূতির অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে সে ভেবেছিল, তার অপবিত্রতাই এ প্রবঞ্চনার কারণ। কথাটা অ্যাসিড নয়, বোধ হয় বিষ, আর তখন মানুষগুলি যেন বঞ্চনার জ্বালায় সরীসৃপের মতো ছুবলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। নিনার ক্ষেত্রে বলা যায় সে নিজেকেই শতবার দংশন করেছিল, আর সেই রাত্রিতেই সে নিজের হাতে নিজের পুতুল ভাঙার মতো প্রমাণ করেছে, সেণ্ট সাইমন তার অন্য অনেক ক্রেতার মতোই একজন সাধারণ মানুষ, যে উদ্বাস্তুও বটে। সে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে সেণ্ট সাইমনের কাছে প্রার্থনা করার মতো অনুতপ্ত মন নিয়ে গিয়েছিল কি না—এখন এ প্রশ্ন অবান্তর। অথচ এই ঘটনাটাই যেন স্বপ্নে পাশ ফেরার মতো কোন ব্যাপার, যার ফলে দলটাই বদলে গিয়েছে ব'লে অনুভব করছে নিনা।

চলতে তার কষ্ট হচ্ছে এই পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠতে, যদিও তার হতাশার মধ্যে একটা যান্ত্রিক একগুঁয়েমি আছে এখনও। পাহাড়ের গা ধ'রে ধ'রে সে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলো, কিন্তু সামনে না-চেয়ে পিছনে চাইলো সে। ফেরেন্সকে সে দেখতে পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে একটা পাথরের উপরে ব'সে পড়লো।

রেলের গ্যাংম্যান সিমারই হয়তো সেই লোক যে প্রথমে কথাটা বলেছিল—প্রবঞ্চনার কথা, অন্ততঃ তার পক্ষেই তা স্বাভাবিক কারণ পরিত্যক্ত রেলজোড়ার অবস্থা দেখে সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, তার উপর দিয়ে ভবিষ্যতের সব আশার

প্রতীক সেই ক্রেট কারটার আসা সম্ভব কিনা। কিন্তু অসীম ধৈর্যের মতো কিছু—যাকে সে অনুভব করছে অন্ধকার রাত্রির কানায় কানায় ভরা কালো জলের মতো, সে নিজের বুকের মধ্যে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করছে। সে ইতিমধ্যে স্থির করেছে ফেরেন্সের সঙ্গে এখন কয়েকটি দিন দেখা যাতে না হয় তেমন ভাবেই সে চলবে। ততদিনে তার চিন্তাটা শীতল হওয়ার সুযোগ পাবে। জারোর পাশে পাশে কাল সে হেঁটেছিল আর তখন জারো বলেছিল বোশাম্পের কথা। জারোর কাঁধে যেখানে মেশিন গানের গুলিটা ছুঁয়েছিল সেখানে মাংসে পচন ধরেছে ব'লে সন্দেহ হয় গন্ধ থেকে। জারো হয়তো তা জানে না। আর জারো আরও কিছু জানে না। ফেরেন্স এর আগে সিমারকে বোশাম্পের কথা বলেছে—তা এই যে বোশাম্প স্কুলের ফরাসী ভাষার মাস্টার আর ফেরেন্স কাস্টমস্-এর কেরানী হ'লেও তারা দুজনে এক সঙ্গেই একই কোম্পানিতে থেকে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, এবং একদিন এমন হয়েছিল কোম্পানির মৃতাবশেষ তিন জনের মধ্যে তারা দুজন ছিল, আর সেদিনই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম বোশাম্পের জামার নিচে ব্যাজটাকে দেখতে পায় ফেরেন্স। জারো যা বলেছে তা সুতরাং ফেরেন্সকে বলা যায় না অন্ততঃ এখন বলবার মতো স্থিরতা নেই সিমারের, হয়তো তার মুখটাও কালো হ'য়ে উঠেছে, আর নিজের মুখের মধ্যে যে লোনা আর তরল কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যাকে রক্ত বলে মনে হয় হয়তো, তা তার মনের উপরে জারোর গল্পেরই ফল, যেহেতু জারো বলেছে রেল-স্টেশনের ছোট কফি হাউসেই বোশাম্পকে তার নিজের রক্তে স্নান করানো হয়েছিল, রসুইকরই সুরু করেছিল ব্যাপারটা আগুন খোঁচানো লোহা দিয়ে। অথচ সে লিসার কথাই ভাবতে গিয়েছিল।

সিমার লিসার কথা ভাববে তা আশ্চর্য নয়। ইউনিয়ানের হলে গিয়েছিল তারা যাত্রার আগে শেষবারের মতো সমবেত হওয়ার জন্যে, কিন্তু ব্যারাকের কাছে ফিরে সিমার এবং তাদের মতো অনেকে দেখতে পেয়েছিল, ব্যারাকের দরজা-গুলোয় তালা ঝুলছে, আর সেই বন্ধ দরজাগুলোর সামনে স্টেনগান হাতে পাহারার সারি। উদ্দেশ্য খুব সহজে বোঝা গেলো। যাতে ব্যারাকের ঘর থেকে শ্রমিকদের স্ত্রীরা, ছেলেমেয়েরা বাইরে আসতে না পারে। ব্যারাকের একটা তালাবন্ধ ঘরে সিমারের স্ত্রী লিসা থেকে গিয়েছে। সিমারকে দেখতে পেয়ে জানলার গরাদে মাথা ঠুকে কাঁদছিল সে তখন।

সিমারের মুখটা কঠিন হ'য়ে উঠলো, সে দেখতে চেষ্টা করলো ফেরেন্সকে দেখা যায় কিনা, কিন্তু সে আগ্নেয় শিলার কালো একটা স্তূপকেই দেখতে পেলো, আর তখন উঠবার পরিশ্রমেই যেন সে হাঁপাতে লাগলো কারণ পথটা চড়াই।

নিনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কয়েক পা চলেও ছিল, কিন্তু আবার প'ড়ে গিয়েছে। হাত দিয়ে সামলেছে ব'লে চোট লাগে নি, কিন্তু ভস্ম কিছু গিলে ফেলেছে। অবাক হ'য়ে সে ভাবলো এত অন্যমনস্ক সে হয়েছিল কি ক'রে ? যেন তার মন একটা গভীর গহ্বর যা থেকে স'রে যেতে গিয়ে সে প'ড়ে গেল। কিছু একটা ভাবতে গিয়েই এমন একটা ধাঁধা তৈরী হয়েছে মনে। তারপর সে অনুভব করলো, একটা অযৌক্তিক অসম্ভব কিছু ক'রে বসেছে সে—প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে কারো কাছে থেকে পালোনোর জন্যে সে এই পিছল পথে ছুটছিল অন্য যাত্রীদের বিশ্রামের সময়ে, আর যার কাছে থেকে পালানোর এই চেষ্টা সে যেন মৃত কেউ।

কিন্তু আসলে ভস্ম নয়, নিনা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো যেন সে-ই এই প্রথম দেখছে ব্যাপারটা, যতই সে ধ'রে নিয়ে থাক সাময়িকভাবে লাভার ভস্মে ঢাকা উপত্যকায় সে ছুটেছে, ধুলোর মতোই হালকা তুষার যা কাল থেকে পড়ছে। আর আসলে দলের সকলের আগে এই এখানে সে ছুটে এসেছে। নিজের কাছে থেকে পালানোর জন্যেই, যেন নিজেকেই খুব ভয় পেয়েছে সে, কিন্তু একটা প্রশ্ন তাহ'লে থেকে যায়, ভয়ই বা পেলো কে ? হাত দুখানা যেন মচকে গিয়েছে এরকম ব্যথা করছে, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে সে হাত দুটোকে সহজ করার চেষ্টা করলো। তা হ'লে এই দাঁড়ায়, ভাবলো নিনা, তার জীবনের সবগুলি রাত্রি মিলে একটা মৃত্যু, কিংবা সেই মৃত্যুগুলির প্রতীক তার দেহ। জীবনের আধারে মৃত্যু। এরকম কোন কথা হয় নাকি ? আর তার কাছে থেকে পালাচ্ছিল সে ?

ফ্লিণ্ট কাল পর্যন্ত ভেবেছিল বরফপড়ার মতো উঁচু পাহাড়ে উঠে পড়েছে তারা, কিন্তু আজ সকাল থেকে হিসেব ক'রে নিজেই সে বুঝতে পেরেছে পরে, উঁচু বটে, অনেক উঁচুতেই তারা, বিশেষ ক'রে এই শেষ তিন দিনে, কিন্তু তুষারপাতের কারণ প্রথম শীতের অবতরণ। শীত এসে পড়েছে তা হ'লে।

হ্যাঁ, এখন থেকে এসবই দেখবে সে, ঋতুর পরিবর্তন, পাহাড়ের বাঁক, আকাশের চেহারা। এসব মিলে এমন একটা কিছু হ'তে পারে, যা একটা গোলকের মতো, যার মধ্যে বাস করা যায়। এ ব্যাপারে তার মস্তিষ্কও সায় দিচ্ছে। মস্তিষ্কের যেন লেবুর মতো একটা ত্বক্ আছে, সেই ত্বক্‌টাই যেন এখন স্পর্শ পাচ্ছে ; ভিতরের কোমল অংশটুকু যা সার, যার অনুভূতি আছে তা যেন শুকিয়ে গিয়েছে—স্মৃতি এবং যুক্তি সমেত। অর্থাৎ একেবারে নিকট এবং বর্তমান যা, স্থান ও কালের দিক দিয়ে, তার বাইরে সে যাবে না। কাল একটা নিউট্‌কে দেখে একটা বিকেল সে কাটাতে পেরেছে। আজ এই তুষার নিয়ে কাটাতে পারে সময়।

ফেরেন্স এই তিনদিন ধ'রে সিমারকে বোশাম্পের কথা বোঝানোর চেষ্টা

করেছে, সিমারের কাছে বোশাম্পের পরিণতির কথা শুনবার পর থেকেই, কিন্তু কাল যখন রাত্রির বিশ্রামের জন্য তারা বসেছে পথের ধারে, তখন কিন্তু ধোঁয়ার মতো অস্পষ্টতার মতো কিছু একটা তার চিন্তাকে ঢেকে দিচ্ছিল, আর তারই ফলে বোশাম্প সম্বন্ধে সে এতদিন যা বলেছে এবং ভেবেছে, তা সবই যেন নতুন ক'রে ভেবে দেখা দরকার হ'য়ে পড়েছে। তুলনাটা এই হ'তে পারে বোশাম্প অনেক আশা নিয়ে চলেছিল, অন্য অনেকেই তাকেই অনুসরণও করেছিল, কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকারের রাত্রিতে শহরের এমন একটা অংশে পৌঁছেছিল, যেখানে পথ তার অপরিচিত আর গলির সংখ্যাও অগণ্য। দু-তিনবার সে বলেছিল—এই পথ, এই পথ, আর প্রতিবারেই সেই একই চেহারার প্রায় নিবে যাওয়া ল্যাম্প-পোস্টটার নিচে এসে পৌঁছেছিল সে, এবং তখন লজ্জায়, হতাশায়, আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করার তাগিদে সে নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিল, তখন সম্ভবত পোকারের আঘাত-গুলোও সে বুঝতে পারছিল না। তখন রাজপথে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, হতাশ মানুষরা বেরিয়ে পড়েছে, তাদের মুখ কঠোর একটা হিংস্রতায় কালো, কারণ তারা অনুভব করেছিল কেউ তাদের ঠকিয়েছে, যে পথ নিজের জানা ছিল না সে পথেই তাদের টেনে এনেছে।

ফেরেন্স আরও কয়েক ধাপ হাত ও পায়ের সাহায্যে উঠে মুখ তুলে দাঁড়ালো, যেন কিছু একটা তখনই ভেবে নেয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে, যদিও এই তুষারে পিছল ঢালু পাহাড়ের গায়ে পথ ছাড়া আর কিছু চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত নয়। এমন কি হ'তে পারে, বোশাম্প ঠিক মূল কথাটাকে জানতো না? আর এই প্রশ্নটাই যেন সেই বিষয় যাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করবার জন্যে সে চোখ তুলে চেয়েছে। হয়তো জানতো না, যার ফলে অনেক যুক্তি যা মূল কথাটার দিকে এগিয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল, তার কাছে প্রকৃতপক্ষে সেগুলো বন্ধ-গলি। যে জানতো সে সম্ভবত বোশাম্পকে অথবা বোশাম্পের মতো অনেককে চলতে নির্দেশ দিয়ে দূরে দূরে থেকেছে, কিংবা নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মগোপন করেছে। এই চলার পথ যেমন একটা প্রবঞ্চনায় শেষ হ'তে পারে, তেমন কিছু হয়েছে তাদের যারা অনুসরণ করেছিল। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই উপত্যকার অনেক কষ্টের পথ চলার মতো বোশাম্পের ধৈর্য ছিল। যন্ত্রের মতো ভঙ্গিতে চড়াইটাকে বাগে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো তখন ফেরেন্স, যন্ত্রের মতোই আশা আর হতাশার অতীত হ'য়ে রইলো তার হঠাৎ উদাস হওয়া মন।

সাতদিন ধ'রে বরফ পড়ার পর আজ আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে আবার, অবশ্য সাতদিনে আর তিনদিনে কি তফাত এখন? কাঁধের ঘা-টার পক্ষে এই

তুষারটাকে বরং ভালো মনে হচ্ছে জারোর কাছে। সেজন্তেই সে কাল অনেক তুষার দিয়েছে কাঁধে, থাবা থাবা তুষার তুলে তুলে। কিন্তু জারো নিজেকে শোনালো কথাটা, এখন সে পথের উপরে কাজেই প্রশ্নটা যা দাঁড়াচ্ছে তা এই পথ নিয়েই বলা যেতে পারে: অ্যাভলনের সরাই ছাড়া অন্য কিছুই হ'তে পারে না। আর এটা যেমন খাঁটি কথা তেমনি আর একটি ব্যাপারকেও মানতে হবে: এই অপরিচিত পথে পথ চেনে এমন কেউ হয়তো আছে, নতুবা অ্যাভলনের সরাই থেকে আগে তারা যেমন দূরে ছিল তেমনি আছে। কিন্তু এখন আর ব'সে থাকাও চলে না, কারণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে আর সকলে, এমনকি সেই কৃষকটিও যাকে দু-একজন এখন সেণ্ট সাইমন ব'লে ডাকে। কৃষক কিংবা মেষ-পালক, তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? স্মক্ আর তোবড়ানো ক্যানভাসের টুপি দেখে তাকে অন্য কোন দলে ফেলা যায় না, যদিও তার এই ঝুলঝুলে আলখাল্লার মতো স্মকৃটায় রঙের মিস্ত্রীর মতো এখানে ওখানে রং লেগে আছে ব'লে মনে হয়। এ থেকেই ভাবতে অবাক লাগে তার সেই দূরগ্রামে, যেখানে কোন কৃষকের মজুর ছিল সে হয়তো, কিংবা সেই পাহাড়ের উপত্যকায়, যেখানে হয়তো সে মেষ-পাল চরাতো, সেখানেও রাজধানীর এই ওলোটপালটের সংবাদ গিয়েছিল। অবশ্য তার মুখোশ দেখে তার মনের কথা জানবার উপায় নেই, যেমন সব মুখোশের বেলাতেই হ'য়ে থাকে, এমনকি এমন দু-একজনও আছে মুখোশ ছাড়াও যাদের চেনা যায় না, যেমন নিকোলা। জারো এই সময়ে এদিক ওদিকে তাকালো যেন কেউ তাকে দেখে ফেলেছে। আসলে ব্যাপারটা এই, নিকোলার কথাটাকে মনে না আনার জন্তেই সে নিজের কাঁধের ব্যথা দিয়ে এবং অ্যাভলনের আশা দিয়ে মনকে ভ'রে তুলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে এখন অনুভব করলো নিকোলার দামী স্যুট, সোনার চশমা, আর মসৃণ আলাপ থেকে তাকে ভুল চেনা হয়েছিল, যেন তা একটা মুখোশের আড়ালে ব'লেই—একথাটা প্রকৃতপক্ষে সেণ্ট সাইমনকে দেখেই তার মনে হয়েছে আজ সকাল থেকে।

কিন্তু এখন আর থামলে চলবে না, কারণ সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছে আর শ'দুয়েক ফুট উপরেই পাহাড়ের মাথা, তার ওপারে পথ নিচের দিকে নেমেছে উপত্যকায়, এবং হয়তো তা এমন কিছু যা আশার অতীত, অন্ততঃ ওদিকে সম্ভবত তুষারের এই দুঃসহতা নেই।

নিনা এখন চোখে খুব কমই দেখতে পাচ্ছে, চোখের উপরে হাত রেখে তুষারের উপর ঠিকরে আসা আলো থেকে চলবার চেষ্টা করেছে সে দুদিন থেকে। উদ্বাস্তু-দের পায়ে পায়ে নরম তুষারের উপরে যেন লাঙ্গলের চাষ পড়েছে, তুষার সরে

গিয়ে কাদা বেরিয়ে পড়েছে—পিছল কাদা বা তুষার আর লাভার গুঁড়োয় তৈরী। কাল, তখন সন্ধ্যা হবে, হঠাৎ জোরে জোরে আলাপ করা কয়েকটা কথা সে শুনতে পেয়েছে, যদিও এমন হ'তে পারে তা তার মনের মধ্যেই কেউ ব'লে থাকবে; এ সব কথা কে বলে তা অনেক সময়েই ধরাও যায় না অবশ্য; কিন্তু কথাটা এই, পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা গিয়েছে একটা সবুজ অধিত্যকা, সবুজ অধিত্যকায় আইভির লতা সমেত। আইভি ছাড়া আর কি? যদি তা আঙুরের না হয়। বাড়ি ঘর, হলুদ দেয়াল, লাল ছাদ, আর তাদের একপাশে সাদা গম্বুজের চার্চ। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল তা থেকে কিছু নিচে, হয়তো পৌঁছুতে একদিন লাগবে, তা হ'লেও অ্যাভলনের সরাই। এবার আর প্রবঞ্চনা নয়, যদিও এ সংবাদ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি সংবাদ এসেছে, এবং তা আইজ্যাক সম্বন্ধেই; সে নাকি পথ হারিয়ে নয়, বরং তা ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে কোথাও নেমে গিয়েছে, কবে তা কেউ জানে না। কতকটা প্রত্যাশিত কারণ অনেক পিছনে থেকেও সে আর চলতে পারছিল না, তাহ'লেও হঠাৎ যেন দেখা যাচ্ছে সে নেই। কালো ফোলা ফোলা ঠোঁট দুখানা বাঁকা ক'রে ক'রে সে নিশ্বাস নিলো থেমে থেমে আর তখনই স্মরণ করলো, প'ড়ে গেলে চলবে না, এর আগে কোথাও সে শুনেছে এরকম অবস্থায় প'ড়ে গেলে কেউ ওঠে না। এখন কাছাকাছি কেউ নেই। চার পাঁচ দিন আগে সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে তার একটা বাঁক ঘুরতে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। নিনার মনে এমন একটা ভাব এসেছিল যা বহু অভিজ্ঞ একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায় অস্বাভাবিক, একটা থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি যা কতকটা লজ্জার মতো। কিন্তু সেণ্ট সাইমন যখন চ'লে যাচ্ছে, নিনা স্পষ্ট ক'রে তার নাম উচ্চারণ করে ডেকেছিল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার শরীর দুটোর পরিচয়ও এক রকমের কমরেডারি তৈরী করতে পারে যেন, নতুবা সেণ্ট সাইমন তার পুরনো শক্ত রুটিটা ছিঁড়ে খানিকটা নিনার দিকে এগিয়ে ধরবে কেন? এখন আবার কাদা কাদা তুষারের দিকে চোখ পড়লো নিনার. যাত্রীদের পায়ে পায়ে পিছল ভস্ম শিলার গুঁড়োয় কালো যে তুষার। কিছু পেলে সে অবশ্য খেতে পারতো, আর এ পথে আসবার পরে সেণ্ট সাই-মনের সঙ্গেই সে রুটি ভাগ ক'রে খেয়েছে। নিনার ফুলে-যাওয়া কালো ঠোঁট দুটো কিছু খাওয়ার ভঙ্গিতে নড়তে লাগলো মৃদু মৃদু। তারপর আবার থেমে থেমে নিশ্বাস নিলো সে। কিছু একটার কারণ দেখালো সে—কারণ কথাটা শেষ পর্যন্ত তার মনের ছবি না হ'য়ে কারো কাছে হয়তো সে শুনেছে। এবার আর প্রবঞ্চনা নয়।

জারোর কথায় আবার ফিরতে পারি আমরা, যেহেতু জারো বেশ স্বচ্ছ ক'রে চিন্তা করার চেষ্টা করছে। জারো বসেছিল, উঠে দাঁড়ালো একটু সামনের দিকে

ঝুঁকে, যদিও এভাবে হাঁটতে কষ্ট হয় কাঁধে, এ ছাড়া অন্য কোন ভাবে সে চলতেও পারছে না। শেষ দিকে নিকোলাও এমন ক'রে ঝুঁকে চলতো।

পার্লামেণ্টের সেই সময়ে কিন্তু সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সভ্যদের মাথার উপর দিয়ে তার তর্জনী দেখা যাচ্ছিল যার সাহায্যে স্পীকারকে সে অভিযুক্ত করছিল তার শেষ বক্তৃতায়। কিন্তু মেজরিটির টেবলের মাইকগুলো থেকে বিশ্বাস-ঘাতক, সমাজদ্রোহী ইত্যাদি শব্দের ঝড়ের মধ্যে তার গলা শোনা যাচ্ছিল না, তার উপরে তার টেবলের মাইকটার তার কেউ ছিঁড়ে দিয়েছিল। নিকোলার গাল বেয়ে ঘাম আর চোখের জল ঝরে পড়ছিল। পার্লামেণ্টের স্টেনো লিখে রেখেছিল —তার বক্তৃতা কিছু শোনা যায় নি। খুব স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু নিকোলা পার্লামেণ্টে এসেছিল ব্যাপারটা জেনেই, মেজরিটি সভ্যদের আসনে পার্টির বিশেষ সভ্যরাই থাকবে যাদের কাছে সংবিধানটাই ছিলো প্রতিক্রিয়াশীলদের, একটা অর্থহীন আইনের খসড়া, নিকোলা জানতো বিরোধী দলের পঁচাত্তরজন সদস্যের একজন তাকে সেদিন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হবে। তা সত্ত্বেও সে পার্লমেণ্টে গিয়েছিল। আর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল পবিত্র সংবিধানের নামে সে স্পীকারকে সম্বোধন করছে।

হয়তো কাঁধে একটা অপারেশন দরকার হবে, আর সেটা অসম্ভবও নয়, কারণ এখন তারা আশা করতে পারে, ন্যায়সঙ্গতই সে আশা, অ্যাভলনের সরাই আর দূরে নয়। এবং এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যেন নিকোলা এবং বোশাম্পের পরে আর একটা পথ আছে যা অ্যাভলনের দিকে চ'লে গিয়েছে।

কিন্তু নিকোলার সাহস ছিল, হ্যাঁ। তাকে সাহস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, যেহেতু সে জানতোই এমন ব্যাপার হবে, এমন কি পার্লামেণ্টের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে যখন তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বিদ্রূপ করেছিলো কোন কোন সদস্য, তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল।

যে কথাটা জারো ভাবতে চাচ্ছে তা এই : নিকোলাকে কিন্তু বর্তমানে বিশ্বাস-ঘাতক প্রমাণ করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে নি ওরা, বরং মানবতার নামে এই অভিযোগ করা হয়েছিল, নিকোলার বন্ধুপ্রীতি অস্বাভাবিক, যাতে তার অতীতের যুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপারটা লোকে আর মনে না রাখে, আর সেই দলিলে নিকোলার আবাল্যবন্ধু জারো স্বাক্ষর দিয়েছিল। কিন্তু কিছুই কি এসে যায় কারো এখন? যদিও জারো যে উত্তাপটা অনুভব করছে হয়তো তা নিকোলার সাহচর্যের অভ্যস্ত স্মৃতি। এসে যায় না কিছুতেই আর, কারণ যদিও তিন দিন ধ'রে ধ'রে চ'লে চ'লেও অ্যাভলনের অধিত্যকায় নামার পথটা পাওয়া যায় নি, এটাও সত্যি

পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছেই দেখা যায়, পর পর তিন দিন পথ বদলে চলেও দেখা গিয়েছে, অ্যাভলন যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে, খুব দূরেও তারা স'রে আসে নি।

ব্যাপারটা ফ্লিণ্ট অভ্যাসে আনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে তার স্বাভাবিক দৃষ্টিই যেন নষ্ট হওয়ার উপক্রম। খুব কাছে দৃষ্টি আটকে রাখতে গিয়ে সে কিই বা দেখবে আর সহযাত্রীদের পোশাক, কিংবা তাদের মুখ দেখা ছাড়া, কারণ এখানে এই তুষারে নিউট্ নেই, ক্রোকাস ফোটাও সম্ভব নয়। এখন একথাটা সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছে, অ্যাভলনের শহরটাকে দেখা গিয়েছে, যদিও এক সপ্তাহ হ'য়ে গেলো তারা তাকে কেন্দ্র ক'রেই এক পাহাড় থেকে আরও পাহাড়ে উঠে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে নেমে ঘুরে ঘুরে চলেছে। আকস্মিক ভাবে, এবং প্রবল ভাবেও বটে, অনুভূতিটা হ'লো তার, কতকটা কৌতুকের সঙ্গে মিশানো কৌতূহল : ফেরেন্সের বুদ্ধি? কিংবা কাঁধ নুইয়ে চলেছে যে জারো, অবশ্য সেণ্ট সাইমনের মুখোশের কথাও আছে, কারণ তার আড়ালে ফেরেন্সের চাইতেও দৃঢ় চিবুক আছে কিনা কে বলতে পারে নিশ্চিত ভাবে। কিন্তু ওরা যেন অ্যাভলনের দিকে না-চেয়ে পথের দিকেই চোখ রেখে চলে, যেহেতু তাতে অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালকে এড়িয়ে চলা যায়, বিশেষ ক'রে এই কর্দমাক্ত শীতের তুষারে ক্রোকাস যখন ফুটবে না। অথচ ব্যাপারটা কি অভ্যস্ততায় তারই এসেছে? বরং অভ্যাসটার আবরণ ভেদ ক'রে ভিতরটা আবার আজ ফুটে উঠতে চাচ্ছে, এবং হয়তো তা অ্যাভলন সত্যি হ'তে চলেছে ব'লেই। ভিতরের অনুভূতি যা ভুলতে পারে নি তা এই : ফ্লিণ্টের বড়ো ভাই, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, রাজপথের উপরে একটা ট্যাঙ্কের তলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে, আর তার মার তলপেটে, যা একটা সন্তান বহন করছিল, একটা বেয়োনেট বিঁধেছিল সীমান্তের তারের বেড়ার কাছে। কিন্তু অ্যাভলনে পথের ধারে হয়তো ক্রোকাস ফুটতেও পারে, ক্রোকাস ফুটতে পারেও হয়তো।

আবার একদিন সিমারই প্রথম, সেই গর্জন ক'রে উঠলো, যেন আনাড়ী কশাই-এর ছুরিতে বেঁধা ষাঁড়ের মতো। পাহাড়ের একটা খাঁজে সে ব'সে পড়েছিল [এখন দুপুর হ'তে চললো] সকাল থেকে চ'লে চ'লে, যদিও বরফে পাহাড়ের গা পিছল হ'য়ে গিয়েছে এবং তীব্র শীতে যাত্রীদের হাত পা অসাড় হ'য়ে আসছে। একশ' ফুট উপরে পাহাড়ের মাথা, যদিও এখন বাতাস তুষার ব'য়ে আনছে। ন' দিন হ'লো আজ, ঠিক ন' দিন—একরশি পথ এগিয়ে আসে নি অ্যাভলন, যদি পিছিয়ে গিয়েও না থাকে। এই মাথার দিকে আর কেউ চেয়ো না, মুখ ফিরিয়ে নাও, মুখ ফিরিয়ে নাও। আবার কেউ তাদের প্রবঞ্চনা করেছে, যে হয়তো বোশাম্পের মতো রাজ-

নীতির চোরাগলিতে পথ চেনে না।

উদ্বাস্তুরা এখন নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। কে বলেছে তা কেউ বুঝতে পারছে না, হয়তো পরিবেশ তাদের সকলের মনেই চিন্তাটাকে এনে দিয়ে থাকবে, আর ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কারো কথায় চিন্তাটা রূপ পেয়েছে। কথাটা এই, ক্রিটের গোলকধাঁধার চাইতেও ভয়াবহ এই বিপদ থেকে স'রে যেতে হবে, যদিবা পাহাড়ের নিচে কোন পথ আছে, যে পথ অ্যাভলনের পথের দিকে ধীরে ধীরে উঠেছে, উচ্চাশার পাহাড়-চূড়ার চাইতে যা নিচে নিচে চলে।

নিনার মনে হয়েছে এই মৃত্যু—যে পচনশীলতাকে সে দীর্ঘদিন বহন ক'রে এনেছে, যার কাছে থেকে এক দিন সে পালাতে চেয়েছিল, ফুলে অসাড় হ'য়ে যাওয়া আঙুলগুলো দিয়ে যাকে সে ধরতে যাচ্ছে, অনেক রাত্রির জীবন প্রতিষ্ঠার ব্যঙ্গ প্রতিধ্বনি দিয়ে যে পচনশীলতা সব রেসারেকসনের অতীত হ'য়ে তার দেহের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন দিনকে আর বোঝা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট একটা আকাশ শুধু মাথার উপরে। উদ্বাস্তুরা আবার থমকে দাঁড়িয়েছে, দুশ্চিন্তায় কালো হ'য়ে উঠেছে তাদের মুখ। আবার কেউ খবর এনেছে সামনে গভীর কনিয়ন। সেতু? দড়ির একটা কিছু আছে বটে এপারে ওপারে বিস্তৃত। ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো যাত্রী দল। আবার: অ্যাভলনের গুজবের, যা অর্বাচীন কোন রাজনৈতিক স্বপ্নদ্রষ্টার ছড়ানো ব'লে বোঝা যাচ্ছে, এটাই পরিণতি—পঞ্চাশ বছর আগে যদি কেউ এ দড়ির সাহায্যে ওপারে গিয়ে থাকে এখনও যেন এক উদ্বাস্তুদের পক্ষে তা সম্ভব হ'তে পারে।

খবরটা উদ্বাস্তুরা এখন সকলেই জানতে পেরেছে, দড়ি ধ'রে যে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে সেণ্ট সাইমন। তা হ'লে এমন কি হ'তে পারে সে-ই নেতৃত্ব ক'রে দলটিকে এনেছে এতদূর? আর তা যদি হ'য়ে থাকে, তবে সে তার যোগ্য কাজই করেছে, এ সাহসও তবে তাকেই দেখাতে হবে, অর্থাৎ অনেক সময়েই নেতাকে যেমন দেখাতে হয়।

ফেরেন্স হাঁটুতে চিবুক রেখে ভাবছে। তুষার পড়ছে এখন, কিছুক্ষণ পরে অনেক কিছুই তুষারে আবৃত হ'য়ে যাবে।

নিনা কিন্তু পাগল হ'য়ে গিয়েছে, অন্ততঃ তার বিড়বিড় ক'রে বকা দেখে তা অযুক্তির মনে হবে না। সেণ্ট সাইমন যখন দড়িটা ধরে চলতে স্বরু করবে তখন সে কাছে ছিল, আর তখন সেণ্ট সাইমন তার মুখোশটাকে খুলে ফেলেছিল, স্মক্ ফ্রকটাকে গুটিয়ে নিয়েছিল। বিপজ্জনক পথে যাত্রার উদ্যোগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু কি দেখেছে তখন নিনা? সেণ্ট সাইমনের মুখে নাকের বদলে শুধু দুটো গর্ত ছিল।

উরুণ্ডীকে ইদানীং শহর বলা হচ্ছে তলে তলে, আর শোভা তা জানে। হয়তো আগে তা বলা হতো না।

কথাটা জাতীয় সড়ক নম্বর চৌত্রিশ। কালো পিচের পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা। কোথাও বেশ চকচকে পালিশ তোলা, অনেক জায়গাতে বসে যাওয়া, টুকরো পাথর, ঘুটিংএর দাঁত বার করা। সেখানে ট্রাকগুলো, হাটুরে বাসগুলো লাফায়, ধাক্কা খায়, ড্রাইভাররা মুখ খিস্তি করে ওঠে। সেই সড়ক বরাবর পাঁচ-সাতশ' গজ আর সড়কের দুপাশে কোথাও তিনশ' গজ, কোথাও দেড়শ', অন্য কোথাও ষাট-সত্তর গজ পর্যন্ত—এই উরুণ্ডীর আয়তন।

অবশ্য প্রাইমারি পরীক্ষায় এরকম অঙ্ক দেয় না। এর ক্ষেত্রফল বার করতে এমন কি নিতাইও পারবে না যে নাকি উরুণ্ডী প্রাইমারি স্কুল থেকে এবার বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দেবে। নিতাই পরীক্ষা দিচ্ছে এটাও একটা প্রমাণ যে এখানেই থামা গেল।

ঠিক সমতল নয় পথের দুপাশে জমি কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। উত্তর বরাবর সড়কের মাথায় মেঘ যেখানে জমে তার নিচে নীল নীল যা দেখা যায় তা নাকি পাহাড়, আর পশ্চিমে মাঠগুলোর শেষে যেখানে মেঘ নেমেছে মনে হয় সেটা নাকি বন, ফরেস্ট।

তিন চারদিন গেল কেউ নজরে আনল না, তিন চারদিন বেড়ে এক মাস হলো কেউ ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল না। আর এখন তো ছ-মাস হতে চললো। এখানেই নাকি? ক্ষতি কি তাই যদি হয়? অবশ্য বৃদ্ধিই বা কার কোথায় কল্পনায় ছিল? বাহান্ন জনের বাইশ জন অবশিষ্ট।

ট্রাকটা তা হলে আর এগোলো না। চায়ের দোকানগুলোর সামনে এক পাক ধুলো উড়িয়ে থামলো। ওটাকেই বাজার বলা হয়। ওখানেই সড়ক বেশ খানিকটা বসা, বেমেরামৎ, এই শুকনোর দিনেও কাদা, মোটরের তেলভাসা জল আর বাজার-ঝাঁটানো আবর্জনা। ওটাই বাজারের রোঁয়াওঠা ঘেয়ো কুকুরটার আড্ডা।

রাস্তার এপারে ওপারে কাঠ আর টিনের ময়লা চেহারার ছাপড়ার নিচে কয়েকটি দোকান। তার মধ্যে একটি চায়ের আর একটি মিষ্টির। আর একটি চায়ের

দোকান ইতিমধ্যে উঠেছে। সেটা গজুর। মিষ্টি দোকানের উল্টো দিকে উরুণ্ডী পোস্টঅফিস। জংধরা চিঠির বাক্সটাই তার প্রমাণ। আর তার সামনে পুরনো রং-চটা গদি ছেঁড়া খান তিন-চার সাইকেল-রিক্সার দাঁড়া। এখানেই সড়ক থেকে যে গলিটা নেমে গিয়েছে তার শেষদিকে এখানকার বেশ্যাপল্লী।

এই বাজারের ওপারেই করাতকল। হ্যাঁ রীতিমত চিমনি চোঙ্ বসানো। চারিদিকে কাঠের গুঁড়ি ছড়ানো। আর তারই কাছাকাছি পথের উল্টো দিকে উরুণ্ডী হাট। সপ্তাহে তিনদিন হাট বসে। হাটের উত্তরদিকে যে গলি তার উপরের টিনের বেড়া টিনের ছাদের ঘরগুলো ব্লক ডেভ্‌লপ্‌মেণ্ট অফিস। ওটাই নাকি সাবেক বাড়ি করাতকলওয়ালার।

হেল্‌থ সেণ্টারটা অবশ্য শোভার বাড়ি থেকে দেখা যায় না। মৌজা হিসাবে সেটা নাকি উরুণ্ডীর মধ্যে নয়। সরকারি কাগজপত্রে উরুণ্ডী হেল্‌থ সেণ্টারই নাম সেই রোদে পোড়া হলুদে বেঁটে বেঁটে ঘরগুলোর। কি রোদ কি রোদ। একটা গাছ দেখবে না। ন্যাড়া মাঠেই উঠেছিল বাড়িগুলো। আর এখন গাছ লাগানোর কথা ভাবাই যায় না। কারণ নাকি মাথার উপর দিয়ে আকাশছোঁয়া লোহার গম্বুজের মাথায় মাথায় হাইডাল প্রোজেকটের যে তার গিয়েছে তা থেকে বিদ্যুৎ নামবে। তখন নাকি বাজারেও বিদ্যুৎ আসবে। আর হেল্‌থ সেণ্টার যে উরুণ্ডীর মধ্যে তার প্রমাণ ওদিকেই করাতকলের মালিকের ধানকল উঠছে।

অবশ্য এসব নাম দেয়ার ব্যাপারে স্নেহ ভালোবাসাই বড় কথা। উরুণ্ডীকে, আমরা যারা ভালোবাসি না, তারা গ্রাম বলতেও দ্বিধা করবো। কিন্তু আমাদের ভ্রূ কপালে উঠলেও, উরুণ্ডীকে গোপনে আড়ালে শহর বলে এমন লোকও আছে। উত্তরে পাহাড়ের ছায়া, পশ্চিমে বনের আভাস, মাথার উপরে হাইডালের তার আর পিচের সড়ক।

এখানেই থামা নাকি? আশ্চর্য। তা তোমার কলকাতা পৌঁছালেও মনে হবে এরই এত নাম? আশ্চর্য। কিংবা হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়ালেও এরকমই মনে হয়।

আর থামা যে তাও বোঝা যাচ্ছে। কয়েক মাস হয়ে গেল তাদের ঘরগুলোরই বয়স। নিতাই প্রাইমারি বৃত্তির জন্য তৈরি হচ্ছে দেখো। নরেশের ছেলে নিতাই। দলের ছ-টি শিশুর একটি। কিন্তু কথাটা কি? শোভা ভাবলো। কলার পোয়া। তা কি হবে? কলার পোয়া রোদে ভরা মাঠে গেরস্থ যা লাগায়। তা কি জন্যে? তারপর কথাটা শোভার মনে এলো শিশুদের একজন অন্তত এই মাটিতে শিকড় ছেড়েছে। আর তার মানে—শোভার মুখ হাসি হাসি দেখালো।

তারপর থেমে দাঁড়ালো দলটা। বাহান্ন জনের তখন বাইশ জন আছে।

শোভা জানলা দিয়ে দেখলো গজু আর ভাসান এগিয়ে আসছে। কিন্তু এটা আশ্চর্য স্থরেন যে খবর এনেছে।

কিন্তু…এটা ভারি আশ্চর্য।

খুব আশ্চর্যের কথা নয় যে সরলা মাসি যার চাপে পড়ে শোভা…সে কোথায় থাকলো। জায়গাটা শোভার মনে আছে, অন্য কারো কারো থাকবে। এক হাঁটু জলের এক নদীর ধারে ডাঁটসার বনতুলসী ঝোপের আড়ালে মুখে আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে দলটা হাঁটতে শুরু করেছিল। সে আগুনে কতটুকু দাহ হলো কেউ জানে না। অবশ্য সারা পৃথিবীতেই তখন দাউ দাউ করে আগুন জলছিল দুপুরের। দলের আর কোন মেয়েছেলে আগুন জ্বালানোর কথাটাও জানে না। শোভা জানে, কারণ তাকে যেতে হয়েছিল, কারণ সরলা তার মাসি ছিল। কিংবা জায়গাটা বলা ঠিক হল না। সেটা কোথায়? কিন্তু আগুনটা মুখে দিতে হয় কেন?

কিন্তু কি মজা দেখো সরলা মাসিই প্রথম স্বাভাবিক মৃত্যু দলের। তাকে যে মরতে হবে পথের ধারেই তা কেউ কখনও ভাবেনি। অথচ তারই জন্য, তারই চাপে পড়ে, কথাটাও কি দেখো—ওকে ধরে রাখতে হবে না?

—কাকে? শোভা হতভম্ব।

—কাকে? খিঁচিয়ে উঠলো মাসি। পুলিনকে। বোঝ না? সারাদিন কার পাশ পাশ হাঁটে তা দেখো না?

—পুলিনদা কি চলে যাবে বলছে? জিজ্ঞাসা করবো।

জায়গাটা আড়াল আবডাল ছিল। শোভা একটু থেমে বললো, গেলেই বা তাকে আটকাবে কি করে? আমাদের মধ্যে তার আপন কে আছে?

মাসি সেদিন বোধহয় তার সেই জ্বরের নেশায় বেহুঁশ কথা বলছিল—দু-মাস ধরে পাশে চলে চলে পুরুষকে তাতিয়ে তুললে আর বোঝ না কেন সে বিরক্ত?

দরজা খুললো শোভা।

—কি ভাসান? শোভা এগিয়ে এসে বললো।

—কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকমে ঘটেছিল। মাসির কথা তাকে…

ভাসান বললো, কখন যাবে ঠিক করলে?

—খবর-টবর নিলে?

—বিকেল বেলা মিটিং, গজু বললো, ইস্কুলে। আর স্থরেন বললো সামনে নাকি ইলেক্শান, তার তোড়জোড়।

—তাতে আমাদের কি?

—স্থরেন বলে এই ফাঁকে পারো কিছু আদায় করে নাও।

—তাতে সুরেনের লাভ? শোভা হাসলো এখন কোথায় যাবে তোমরা নেত্যের বাড়ির দিকে। যাও আমি ভাত নামিয়ে যাচ্ছি।

শোভা তার ঘরের বাইরের দিকে দরজা বন্ধ করলো।

নেত্যের বাড়ির দিকে তাকে জল আনতে যেতেই হতো। টিউবওয়েলট ওখানেই। সুরেন বোধহয় একেবারে ভুল খবর আনে না। এই টিউবওয়েলট ধরো। বিডিও অফিসে চেষ্টা চরিত্তির করেছিল সেই, তারও আগে খবর এনেছি এদিকে দু-তিনটি টিউবওয়েল হবে।

···মাসির কথা তাকে পুলিন সম্বন্ধে সচেতন করেছিল। কিন্তু তারপর কতদিন বা মাসি টিকলো।

কিন্তু উনুন থেকে বরং লাকড়ি টেনে বার করলো শোভা ডালটা নামাতেই ফিরে এসে ভাত ফুটিয়ে নিলেই হবে।

এমন এক সময় এসেছিল যখন ঘরে বসে আবার ভাত ফোটানো যাবে তা কে আশা করতে সাহস পাচ্ছিল না। অনেক রকমভাবে কথাটা বলা যায়। শোভ নিজেই গজুকে একরকম বলতো যার সঙ্গে তার ধারণা মেলে না। কালো, কয়লা আঁচ দিলে যে রকম ধোঁয়া তেমন কালো, আর তার মধ্যে তেমন নানা জন্তু আকৃতি। সে শুধু ভয়ের কথাই বলে, অন্তত আতঙ্কের উপরে জোর দেয়। তার ও থেকে এমন প্রমাণ হতে পারে অন্য কারো কারো ধারণা ভাসানের সঙ্গে মিলতে পারে, আর সেই কালো জন্তুগুলো তাড়া করছে, যাকে ভালো করে দেখা যায় না চেনা যায় না···

আবাম্, মবাল। তারা ভয়ে মবাল।

মবাল কথাটা কিংবা তেমন একটা শোভাই বানিয়েছিল। সময় কাটানো খেলা সেটা একটা—চলতি জানা শব্দগুলোকে ভেঙেচুরে জোড়া লাগিয়ে আবা একটা শব্দ তৈরি করা। পুলিনের পাশে চলতে চলতে এরকম শব্দ তৈরি করতে সে। কিন্তু তখন খেলা ছিল না।

—মানে কি হবে? পুলিন জিজ্ঞাসা করলো।

—মুখে কথা না যুয়ালে বোবা বলি। কারো মন যদি কোন শব্দ খুঁজে না পা চিন্তা করার মতো তাকে বলা যাবে আবাম্ আবাম্।

আতঙ্ক, ভয়, জন্তু এসব সম্বন্ধে মনের তবু একটা ধারণা আছে। কিন্তু তাদে অবস্থায় মন ধারণা করার মতো শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। পুলিন যেমন একদি বলেছিল, কথা ভাঙায় কথাটা খানিকটা খেলা ছিল, খানিকটা তা ছিল না। প্রকা করার চেষ্টা ছিল।

শোভা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। আজ না হয় এবেলা নাই খাবে। শোভা নেত্যের বাড়ির দিকে চললো। পথে ভাসানের বাড়িও পড়বে।

কথাটা একদিন পুলিনই বলেছিল। শব্দটা ইংরেজি—এক্সোডাস্।

—কি মানে?

—বহির্গমন, বেরিয়ে পড়া···

—এত সোজা নাকি? কিন্তু তখন তারা বেরিয়ে পড়েছে।

মাঠটা সড়ক থেকে উঁচু শুকনো। শুকনো ঘাসে ঢাকা। মাঝেমাঝে ঝোপ, এখানে ওখানে দু-একটা গাছ। সন্ধ্যার পর খানিকটা আলো ফুটেছে। পুলিন একটা গাছতলায় বসেছে। শোভাও বসেছিল এতক্ষণ। ধীরে ধীরে পা ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়লো। দুপুর পর থেকে তারা এই মাঠটায় বিশ্রাম করছে। মাসির রান্না শেষ করে দিয়েছে শোভা কিছুক্ষণ আগে।

—এত সোজা নাকি?

পুলিন বললো—ফারাও ছিলো মিশরের রাজা। তার অত্যাচার থেকে এক দল লোক বেরিয়ে পড়েছিল পিতৃভূমির খোঁজে। তাকে এক্সোডাস্ বলা হয়ে থাকে।

হাত বাড়িয়ে পুলিনের হাঁটুর উপরে হাত রাখলো শোভা।

আধময়লা কালো ফিতেপাড় ধুতি শোভার পরনে। তেলের অভাবে রুক্ষ চুল। স্বাস্থ্যটা মোটামুটি ভালো। এরকম একবেলা না খেয়ে থাকা অনেকদিনের অভ্যাস তার। বিশ থেকে এই ত্রিশ—দশ বছর তো বটেই। সেই এক্সোডাসের আগে থেকেই।

ভাসান বললো, কোথা যাও। জল? এর মধ্যেই রান্না শেষ?

—ও আর এবেলা না করলাম। ভাসানের পৈঠার নিচে দাঁড়ালো শোভা।

—তা তুমি পারো। গজু হাসলো।

—কিন্তু কি বলা যাবে যে আসবে তাকে, আর বললেই বা শোনে কেন সে? ভাসান বললো।

সুরেনকে জিজ্ঞাসা করলে হয়। শোভা হাসলো। একটা কথা বলা যায়। আর খান-তিনেক তাঁত হলে তোমাদের ভালো হয় না?

—তিনখানা তাঁতে কতটাকা তা জানো? ভাসান হাসলো।

—আর কেউ আসবে নাকি? বিপিন ওরা?

—আসবে নিশ্চয়, না হয় কোথাও বসলে খবর দেবে গজু বললো।

একটু ভাবলো শোভা।

—নিতাইদের ইস্কুলে তাহলে মিটিং!

—তাই শুনছি।

—গজু কিছু ধার পেলে কাটা কাপড়ের দোকান দিতে পারে। শোভা ভেবে ভেবে বললো।

—আশ্চর্য! ভাসান বললো।

—কি আবার আশ্চর্য দেখলে এরই মধ্যে।

—মানে এখানেই, এই উরগুীতেই। কি স্ববাদে বলতে পারো? অথচ এখানেই। কেমন যেন আশা হয় না।

কালো প্লাস্টিকের চুড়িপরা হাত দুটো সামনের দিকে মেলে আড়মোড়া ভাঙলে শোভা। বললো—পুলিন বলতো একে ইংরেজিতে নাম দেয়া যায়।

ভাসান অবাক—ইংরেজদের আবার কবে এ দশা হলো?

—ইংরেজদের না। মিশরে হয়েছিলো। এক্সোডাস্। আমার কি মনে হয় জানো, মাসির সেই জায়ের ছেলে পুলিনই ছিলো মূলে।

—মেসোর কিছু খবর পাও?

—কি করে পাবো?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো ভাসান। বাহান্ন জনের এখন বাইশ জন আছে। আর কি করে মরে ছেলেমেয়েরা! তা তোমার মাসিরও কিছু মনের জোর ছিল মাসিও বটে গোড়ায়। গজু বললো, ইংরেজি কথাটা কি যেন বললে?

—এক্সোডাস্।

—হাঁস ওড়া দেখছো? সেটাই কিন্তু এ রকমই। গজু বোকা বোকা মুখ করে হাসলো।

—দেখি নাই।

—প্রথমে একটা ওড়ে, তারপর আর একটা, তারপর দেখাদেখি আর সবগুলে ঝাঁক বেঁধে উঠে পড়ে। গজু দুহাতে ঢেউ তুলে হাঁসদের ওড়া দেখালো।

—কিন্তু তুমিই বলো তুমি কি আগে জানতে এখানেই থামা হবে? শোভা বললো।

—দেখো,…এই বলে ভাসান থামলো, তারপর আবার বললো, এটা এক মজাই। পরশু না কবে রাত্তিরে হঠাৎ মনে পড়লো। বুঝলে? ভাবতেও অবাক লাগে জায়গাটা যেন ঠিক করাই ছিল—এই উরুগুী।

—কিন্তু আমাদের আর তখন চলার উপায় ছিল না। দু-তিন দিন জিরিয়ে নিতে থামা…। শোভা বললো।

—তারপর গতর ভার হয়ে গেল? তাও হতে পারে। গজু বললো—কিন্তু

তাহলে প্রথম হাঁসটা কিন্তু পুলিনদা।

ভাসান বললো, আসল কথা কি জানো, এর মধ্যে অনেকটাই পুলিনদার সাহস। ওনার মত ওরা মেনে নেয় না। নরেশ বলে, আমারও তা মনে হয়, কিছু-তেই মেনে নেব না এই রকমই একটা ভাব ছিল পুলিনদার। কিছুতেই না, কিছুতেই না, কিছুতেই না।

—নরেশ তাই বলে নাকি? শোভা বললো। খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো সে।

—জানো না নরেশের ঘরে পুলিনদার একটা ছোট ছবি টাঙানো আছে। গজু বলে।

শোভা বললো, তুমি তাহলে ইস্কুলের মিটিংএ যাবে?

—তা যাবো। নরেশ আর গজু সেদিন আলাপ করছিল তা থেকেই শুনলাম। পুলিনদা যে কত শক্ত হতে পারে আন্দাজ করো? শক্ত না হলে বাহান্ন কমে বাইশ তবু চলছে—এ হয় না। আর তখন মাসিও নাই। কিন্তু তা না। তুমি জানো বোধহয়।

—কি?

—সেই সরকারের লোককে গুলি করে মারা। ভাসান চোখ ঠেরে গোপনতার ইঙ্গিত করলো।

—জানি, কার কাছে শুনছি মনে নাই। এখন সকলেই জানে। তারপর অনেক-দিন ফেরার আর তারপর আমাদের সামনে এসে দলের মাথায় দাঁড়ালো।

ভাসান হেসে বললো, তা না হলে কে সাহস পেত দলের মাথায় দাঁড়াতে? কিন্তু নামেব কি রকম মিল দেখো। আমাদের ধানকলের মালিকও আর এক ব্রজ চক্কোত্তি কিন্তুক।

শোভা হাসলো। আশ্চর্য কি। চক্কোত্তির কি লেখাজোখা? আর নাম? আমার শোভা নামটাই কি উরুণ্ডীতে আর পাঁচজনের নাই মনে করো। কেন বিপিন সেনই আর একজন আছে না? ওষুধের দোকান যার? কিন্তু আমাদের বিপিন, এখন কেউ আসবে না। কলতলাও খালি, স্নান করে নি'।

ভাসান বললো, তা করো। তোমার এখনও কিন্তু পথের অভ্যাস যায় নাই।

—যখন তখন স্নান করার কথা বলো?

—খাওয়ার কথাও। কোনোদিন দিনের বেলা, কোনোদিন সন্ধ্যা পার করে দিয়ে। আমরা একটু ঘুরেই আসি। বাজারের দিকেই যাব।

ভাসান আর গজু চলে গেলে শোভা কলতলায় গেল।

কি মিষ্টি জল উরুণ্ডীর। কি ঠাণ্ডা! আর কি মিষ্টি!

সেটা তখন স্বাভাবিকই ছিল, কিংবা সেটাই স্নানের একমাত্র উপায়। পুকুর, কুয়ো, কল মানুষ নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে, কাজেই চোখ চোখ করে রাখে। বাকি থাকে নদী। আর নদী তোমার পথে নির্দিষ্ট একটা সময়ে রোজ দেখা দেবে আশা ঘোর পাগলেও দু-একবারই করতে পারে। কাজেই নদী পেলেই চান। তার আর সময় অসময় কি? শুধু ঘাট বাঁচিয়ে আর আড়ালে আবডালে।

আর খাওয়া···

বেশ অনেকটা সময় ধরে স্নান করলো শোভা। তারপরে ভিজে কাপড়েই ঘরে ফিরে এল। গা মুছতে মুছতে নিজের পায়ের দিকে তাকালো। পায়ের ঘাটা কিন্তু একেবারেই সেরে গেল। শুধু বুড়ো আঙুলের নখটা আর কোনোদিন ভালো হবে না।

শুকনো কাপড় পরে, বেড়ায় গোঁজা আয়না চিরুনি নামিয়ে এনে মেঝেতে মাদুর পেতে চুল আঁচড়াতে বসলো শোভা। সিঁথি করে না সে। চুলটা কপাল থেকে মাথার পিছনে ঠেলে দেয়। বিশ বছরেই সিঁথি মুছে ফেলতে হয়েছিল তাকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো শোভার।

এখন পড়ছে বটে এমন নিঃশ্বাস, তখন?

আবার সেই শব্দটাই মনে এলো—আবাম্, মনস্থক। মন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়, কোন শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে।

—মাসি বলছিলো তুমি নাকি দল ছেড়ে চলে যাবে?

শোভা মাথার নিচে দুহাত জড়ো করে ঘাসের উপরে শুয়ে।

পুলিন বললো, তুমি এমন করলে কেন?

শোভা প্রায় নিঃশব্দে হাসলো। অনুতাপ হচ্ছে?

—আ শোভা মাসি···

—একটু ঘুমিয়ে নাও। সকালেই আবার হাঁটতে হবে। বড় নদীটা পার হতে হবে। আকাশে দেখো ওটা কালপুরুষ। চেনো? চিনতে পারলে না?

—তুমি অনুতাপ বলে ঠাট্টা করছো কিন্তু তুমি কি আমার মনকে আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারবে?

—আ, পুলিন, আচ্ছা, এখন ভোর হয়ে আসছে। কাল সকালে হাঁটতে হাঁটতে তখন চেষ্টা করো ভাবতে। শোভা হাসলো। আর কাল সন্ধ্যাতেও আমার জন্য একটা জায়গা পছন্দ করে রেখো।

অথচ পরদিন সকালেই মাসি বললো—তোরা কিছু খেয়ে নে যা হোক। আমার জ্বরটা আবার বেড়েছে। হাত ধরে তুলে বসালো মাসিকে শোভা। জ্বরে

গা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো লাল। আর সেই চোখের প্রান্তে জল। মাসি কি উঠতে পারবে, হাঁটতে পারবে! নিঃশ্বাস নিতে পাঁজরা ফোঁপাচ্ছে। শোভা একসময়ে বলে ফেলেছিল, পুলিন আর কখনও দল ছেড়ে যাবে না, তুমি দেখো। কষ্ট করে ওঠো।

আর তার সাতদিনের মধ্যে কোথায় গেল মাসি দল ছেড়ে। আর একজন মারা গেল দলের? অ্যাঁ! অবশিষ্টেরা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো, যেন খুঁজছে আর কারো মুখে মৃত্যুর চিহ্ন দেখা দিয়েছে কি না। আর তার পনেরো দিনের মধ্যে মেসো আর তার ছেলে ফিরে গেল—তাকেই হার মানা বলে চূড়ান্ত হার। মরার চাইতেও হার। মরাটা হারা নয়। যেন দড়ি ধরে খাদের উপরে ঝুলে থাকতে থাকতে হাত ভেরে গেল। আর্তনাদ করতে করতে খসে পড়লো।

অনেকেই গিয়েছে। গোপীদের পরিবারটা সেই রেলস্টেশনেই বসে পড়লো। মরণচাঁদ আর বিমলির সঙ্গে কয়েকজন পিছিয়ে পড়তে পড়তে একদিন দল ছাড়া হয়ে গেল। আর তারও আগে হিরণ আর যোগেন মরলো বিলটার ধারে, বিল পার হওয়ার পথ করতে গিয়ে। যোগেনের মৃতদেহটা সেই আমবাগানে ফেলে আসা ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না। গোরুমোষের মড়া নিয়ে শেয়াল-কুকুরের টানাটানি দেখেছো বটে কিন্তু মানুষের শরীর নিয়ে?

চুল আঁচড়াতে দু-পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট। শোভা আয়না চিরুনি বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখলো।

পুলিন ছিল বলেই দলটা তবু ক্রমাগত চলেছে। নরেশের ঘরে পুলিনের ছবি আছে। ছবি না থাকলেও পুলিনকে মনে থাকবে না এমন নয়। বরং ছবিতেও যাদের সুন্দর দেখায় তেমন নয় পুলিন। সুন্দর অথবা জাঁকালো। আর তখন তো পথের কষ্টে অনাহারে, রুক্ষ, শীর্ণ, মলিন।

এটা যদি চৈত্রের মাঝামাঝি হয়, ঠিক এক মাস আগেই সে আর একবার এসেছিল।

—কেমন আছো তোমরা দেখতে এলাম।

শোভা বললো, সকলের সঙ্গে দেখা হলো? বসো।

—নরেশ আর বিপিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাজারে। কাল সকালে আর সকলের সঙ্গে দেখা করবো।

—ব'সো। আগে উনুন ধরিয়ে দি।

—এত রাতে।

রাত তখন এগারোটা হবে। তা উরুণ্ডীর পক্ষে একটু বেশি রাত বৈকি। আর তখন শোভার মনে হয়েছিল হঠাৎ পুলিন তার চাইতে বয়সে কিছু ছোটই হবে। আর তাকে ধরে রাখাও যাবে না।

—আচ্ছা, পুলিন, আমরা তো এখানে থামলাম। তোমার কোথাও থামতে নেই নাকি?

—এত রাতে সত্যি তুমি রাঁধতে বসলে, মাসি?

—আমার কথার জবাব দিলে না?

পুলিন হাসলো।

সে রাতেও খায় নি শোভা, কারণ দিনে সে খেয়েছিল। দিনে রাতে একবারই খায়।

কিন্তু আজ যদি সে রান্না না করে এ বেলা, বাজারে গজুর দোকানে যেতে পারে, সেখানে ভাসান আর গজু ছাড়াও আর দু-একজন হয়তো এসেছে এতক্ষণ। আজ একটু নড়াচড়া করতে হবে বৈকি। সুরেন যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়—শোভা হাসলো।

বাজারে পৌঁছাতে নরেশের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয়। রাস্তা থেকেই শোভা দেখতে পেলো ঘরের মধ্যে নরেশ কার সঙ্গে কথা বলছে। নরেশ তাকে দেখতে পেয়েছিল। সেই ডাকলো, মাসি কোথায় যাও? এদিকে আসো।

ঘরের মধ্যে নরেশ ছিল। নিতাই ছিল। নিতাইএর সামনে বই খোলা। তৃতীয় জন প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার।

—পড়াশুনা হচ্ছে নাকি?

মাস্টার বললো, না। দশটা বাজে। স্কুল বসবে না আজ। তাই ভূগোলটা একটু দেখিয়ে দিলাম। এখন যাই, নরেশবাবু

কিন্তু আলাপটা এতক্ষণ ভূগোল নিয়ে হচ্ছিল না তা বোঝা গেল। নিতাই ছেলেমানুষের চেরা গলায় বললো, মাস্টারমশাই শোভা মাসিকে জিজ্ঞাসা করেন। নরেশ হেসে বললো, তুই থামতো।

মাস্টার বললো, বেশ তো এখন তাদের কথা বইয়ে লেখা হচ্ছে! এখন গোপন করার কিছু নেই। তোমাদের পুলিনদাও যদি তা হয়ে থাকে কেউ না কেউ লিখবে তার কথা।

মাস্টারমশাই হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো।

শোভা বললো—নিতাইএর লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?

মাস্টার বললো—মোটামুটি ভালোই। পুজোর পর থেকে আর একটু জোর

করে ধরবো।

মাস্টার চলে গেল।

নরেশ বললো—বসো মাসি।

শোভা বললো, শুনেছো নাকি ?

—হ্যাঁ ভাসানরা বলে গেল। তুমি নাকি আর খানতিনেক তাঁতের কথা বলতে বলেছ। নরেশ হাসলো।

তুমি কি বলো ?

—তিনের বদলে এক পেলেও···। নরেশ বললো। কিন্তু অন্য একটাও আছে। আমরা যেখানে বসেছি এ সব জমি সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হয়। স্বত্ব ঠিক করতে হয়।

—বলো কি! শোভা হাসলো।

কিন্তু নিতাইএর সব কথা ভাল লাগছিল না। ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, আচ্ছা মাসি, পুলিনদাদের দলের হাতে যে বেজ চক্কোত্তি আর তার ছেলে মরেছিল তারা সরকারের লোক ছিল না ?

নরেশও লাজুক মুখে শোভার দিকে চাইলো।

শোভা বললো, মাস্টারমশাই তো বললো। যাবে নাকি বাজারের দিকে ?

—তাই যাই চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে নরেশ বললো, এখন আর গোপন করার কিছু নেই তাই না ? আমাদের যে বাইশ জন আছে তারাও কিন্তু সকলে জানে না।

এটা এখনও হয়তো স্থানীয় লোকদের চোখে নতুন লাগে যে-কোন সময়ে শোভার এই রকম বাজারে আসা, পুরুষদের মাঝখানে বসে কথা বলা হাটে-বাজারে। কিন্তু এখন অন্তঃপুরিকার চালচলনে ফিরে যেতে চাওয়াই বাড়াবাড়ি হবে। অন্য অনেকে জানে না, এই লোকগুলোর সঙ্গে কত দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে শোভা।

তখন গজুর দোকানের চায়ের জলের উনুন নিভন্ত, আর সেখানে বিপিন ভাসান মাধব তিনজনেই বসেছিল, নরেশ আর শোভা গিয়ে দেখতে পেল।

মাধব বললো, এই যে শোভাদি আসছে, আমাদের গজুর ফক্কুড়ি শোনো।

—কি এমন ? নরেশ এগিয়ে গেল।

—শোভাদি নাকি বলেছে ইংরেজদেরও এমন নাকি হয়েছিল আমাদের মতো। আর তার নামও নাকি একটা আছে। সত্যি কিনা বলো।

সে আবার কবে ? নরেশ অবাক হয়ে শোভার মুখের দিকে চাইলো।

গজু বললো—কেন একশদাস্ বললে না ?

—আ, গজু, এরই মধ্যে আবার ভুলে গেলে। ভাসান হাসলো।

কথাটাকে মনের গভীরে নিতে যতটুকু সময় লাগে তারপরে নরেশ বললো, বুঝলাম। তা শোভা মাসি ঠিকই বলেছে। নিতাইএর বই দেখে। তা আমাদের এই বেরিয়ে পড়াকে একশোডাস্ বলতে পারো।

—কেমন বলি নাই ? গজু বললো মাধবকে।

মাধব বললো, অহো! এই বলে সে আনন্দে সারা গায়ে ঢেউ তুললো। এটা তার একটা বিকট মুদ্রাদোষ, এই গা ঝাঁকানো। কিন্তু তাকে খুশির ঢেউও বলা যায়।

বিপিন সেন বললো গলা নিচু করে, দেখো ছ-সাত জন রয়েছি, একটু চা আনাই শোভাদিদি। শোভা ইতস্তত করতে করতে ভাসান বললো, আনাও ভাই, আনাও। ভাবো এই দুপুরে চা নিয়ে আড্ডা—একি কখনও ভেবেছিলে ?

শুধু ভাসান নয়। তার কথাটা যেন সকলের চোখে ফুটে উঠলো।

—আর বাতাসটাও কি মিষ্টি দেখো। কেউ একজন বলে ফেললো।

আবার মাধব বললো, অহো, তার হাস্যকর বিকট মুদ্রাদোষ ফুটিয়ে।

নিভন্ত উনুনে কাঠের চাঁছানি গুঁজে দিয়ে গজু বললো—এখনও খানিক দূর।

—আস্তে, আস্তে।

—কিসের কথা বলো ? নরেশ জিজ্ঞাসা করলো।

—এই আমাদের পাকাপাকি হয়ে বসা। ভাসান বললো। কিন্তুক একটা কথা ভাবি। আচ্ছা বিপিন স্যান, মনে করো পুলিনদা যদি একদিন···তুমি পারতে না দলটাকে নিয়ে তার মতো চলতে ? ভাসানের মুখটা বোকা বোকা দেখালো।

উত্তর দিতে গিয়ে খানিকটা মাথা চুলকে নিল বিপিন সেন। বললো, ও আর কি কাজের কথা ? রাম মরলে কি অচল ? কিন্তু রামের পর ছিয়াশি হাজার রাজা হলেও রাম কিন্তুক···

—ওই একটাই। বিপিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নরেশ বললো। এখন ভাবি, বিপিন···সেই বিমলি আর মরণচানের হারায়ে যাওয়ার কথা ভাবো ? তার-পর দিন কি হাঁটতে পারা যাবে মনে হয়েছিলো ? কিম্বা সরলা মাসিকে যেদিন পুড়ানো হলো। সেদিন কার চোখে জল পড়ে নাই ? সকালে দেখি মাসির মড়া ঘিরে সকলে কাঁদে। শব্দ নাই, কিন্তু সে কি কাঁদা। আর শুকিয়ে মাসি কি হয়ে গিয়েছিল। কি মানুষটা কি হইছিলো। কি জর। কি শক্ত ছিল মানুষটা ভাবো। খানিক দূরে গাছতলায় বসে পুলিন। মোটা এক সূচ দিয়ে ভোক্‌রা ভোক্‌রা

সেলাই করে জামা রিফু করে। বললাম। বললো, শুনেছি। তারপর জামা রেখে উঠলো। তারপর তো সবাই জানো। আগুন জ্বলে উঠলে বললাম—এখন?

—হাঁটো। বললো পুলিন।

—কিন্তু সে কথা যাক, বিপিন বললো হাসিমুখে, এখন এই সমিস্যের কি করা? যে আসছে তার ট্যাকা আছে। কিন্তু চেনা নাই জানা নাই তার সামনে দাঁড়ালেই কি ট্যাকা দেবে? তা কেউ দেয়?

—স্বরেন যে বললো ইলেক্‌শান, ভাসান বললো, ভাবো কি, ফাঁদ?

কাচের গ্লাসে চা ঢেলে এগিয়ে দিতে দিতে গজু বললো, কিছু যদি নাই পাও, এই অবেলায় চা খাওয়া মন্দ কি?

মাধব বললো, চেষ্টায় ক্ষতি কি? ফাঁদ যদি বা হয়।

নরেশ বললো, আমার তো মনে হয় দরখাস্ত লিখে শোভা মাসির হাত দিয়ে পাঠানো যায়। তা বলে এই চা খাওয়াও মন্দ নয়।

গজু বললো, মাধু, আর একবার আহো বলবে নাকি ভাবো।

মাধবের গা প্রায় নেচে উঠেছিল। সে বললো, সব সময়ে ফক্কুড়ি নাকি? এটা এখন কাজের কথা হচ্ছে দেখো না। চোখ কোঁচকালো সে।

মাধবের ভঙ্গিতেই বরং না হেসে পারা গেল না।

প্রায় দু-ঘণ্টা পরে আড্ডা ভাঙলো। পায়ের তলায় জাতীয় সড়কের পিচ ততক্ষণে গরমে দল্‌দলে। ধুলোর ঝাপটা উঠছে থেকে থেকে। কিন্তু কি শান্তি।

ফাঁদ যদি বলো, আর কি ফাঁদ হবে? ফাঁদ তারা কেটে এসেছে।

বিকেলের দিকে নিতাইদের স্কুলে একটা ছোট সভা বসলো। স্বরেন ঠিক খবর রাখে—জেলা পরিষদের ইলেক্‌শান। উরুণ্ডী শহর বটে, কিন্তু তার চাইতেও বড় শহর আছে। দু-খানা গাড়িতে চার-পাঁচজন এসেছিল তারা।

সভা শেষ হলে বিপিনই স্বরেনের নির্দেশ মতো একজনকে দিল তাদের দরখাস্তখানা। সে দরখাস্ত পড়লো, হাসলো, বিপিনের দিকে তাকালো। বুড়ো ভদ্রলোকের গায়ের রং বেশ ফর্সা, হঠাৎ তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠলো। পাকা চুলের জুলফি পর্যন্ত। অবশেষে সে বললো, সন্ধ্যার পরে দেখা করো। তারপরে স্বরেনের কারিগরি। দেখা হবে করাতকলের অফিসে। রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে।

সভা থেকে ফিরতে ফিরতে নরেশ বললো, এবেলা তো উপোসে কাটালে, সন্ধ্যাতেই কিন্তু খেয়ে নিও শোভা মাসি।

গজু বললো, কিছু যদি নাও হয়, তাও ভালো নয়। বেশ খেলা খেলা।

কিন্তু সব কিছু পরিকল্পনা মতো হয় না।

ভর সন্ধ্যায় কেউ রান্না করে না, খায়ও না। সন্ধ্যা গড়াতেই রান্নার যোগাড় করে রেখে শোভা কল থেকে জল আনতে গেল। উরুণ্ডীর জল এমনি ঠাণ্ডা, এমনি মিষ্টি, কিন্তু নতুন তোলা জল আরও ঠাণ্ডা তাতে সন্দেহ কি ?

...অবশ্য, শোভা হাসলো, এসবই খেলা হতে পারে আজ রাতে করাতকলে যাওয়া। আর তা নিয়ে নিয়ে স্থরেনকে টোকা যাবে ?

জল তুলতে তুলতে আবার স্নান করার লোভ হলো শোভার...আর কি কষ্ট সেই পথে। কি ময়লা, পুরুষদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর মেয়েদের চুলে জট, আর নিজেদের গায়ের গন্ধ বিশেষ করে বৃষ্টিতে ভেজার পরে কিন্তু সে সবই এখন দেখা যাচ্ছে না উত্তুরে নীল নীল ত্রিভুজের মতো পাহাড় যদি সড়ক বরাবর চাও আর পশ্চিমেও গাঢ় নীল. সেটা ফরেস্ট, আর মাঝখানে এই উরুণ্ডী...অবশ্য এখন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না বলেই কি রোজ সারাদিন যা দেখা যায় তা মিথ্যা হবে ? আর যেন ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার যখন ধরা পড়লো তখন মানবো না মানবো না আর গজু বলেছিলো হাঁস ওড়া। কবিতার মতো না ? তা তুমি বলতে পারবে না সকলে কবি না হয়ে কেউ একজন কেন কবি হয় ; অনেকে যখন মানে, মেনে নেয়, কেউ একজন কেন উঠে দাঁড়ায়।

সেই অন্ধকারে শোভার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

ঘরে ফিরে শোভা অবাক হয়ে গেল। শিকলতোলা দরজা খুলে পুলিন ঘরে ঢুকে মাদুরের উপরে কাত হয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

—কখন এলে ?

—এই মিনিট কয়েক।

—চা খেয়েছো ?

—হ্যাঁ গজুর দোকানে।

—পায়ের চপ্পল খোলো। একহাঁটু ধুলো তো।

পুলিন কাৎ হয়ে শুয়ে থেকে খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে ঘষে চপ্পল খুললো।

কাজেই পরিকল্পনাটা বদলে গেল। এ তো আর একার জন্য চাল ফুটানো নয়। ভাসানের বাড়িতে গেল শোভা আবার। কিছু আনাজ তরকারি দরকার।

ভাসান শুনে বললো, কেন তা জানি। গজুর দোকানে চা খেয়েছে তা শুনেছি। কে আবার ? আমরা খেয়ে উঠে তাহলে তোমার ওখানেই ঘুরে যাবো। কিংবা এখন থাক, বিরক্তি করার দরকার নাই। বোলো সেবারের মতো রাত

থাকতে উঠে না চলে যায়। কাল পরামর্শ করবো। আর তোমারও করাতকলে যাওয়ার দরকার নেই।

শোভা ঘরে ফিরে এলো। জল নামিয়ে রেখে, কাপড় ছেড়ে পুলিনের দিকে এগিয়ে এল।

আশ্চর্য এই সেই মানুষটি। চেহারা যদি বলো বিপিনকে অনেক বেশি মজবুত দেখায়। যদি সৌন্দর্যের কথা তোল, রোদে পুড়ে জলে ভিজে সবাই এখন চোয়াড়, কিন্তু তুলনায় এখনও ভাসানকে সুন্দর বলতে হবে। এই লোকটার কথা সারাদিন আলাপ করা হয়েছে।

পুরনো কথাটাই আবার মনে হলো শোভার। অনেক অনেক লোকের মধ্যে একজন কবি হয়, একজন দার্শনিক হয়, তেমনি আর একজন বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে পড়ে।

মাদুরের একপাশে বসলো শোভা।

সে বললো, আজ ওরা হাঁস ওড়ার কথা বলছিল।

—এদিকে হাঁস আছে নাকি ?

শোভা হাসলো। না। তোমার বেরিয়ে পড়ার কথা। ধীরে ধীরে বললো সে।

পুলিন অনুভব করলো কথাটাকে। তারপর বললো—তা হলে তোমরা এখানেই থিতু হলে ?

হাত বাড়িয়ে আঁচল দিয়ে পুলিনের কপাল মুছে দিল শোভা।

বললো, হ্যাঁ এই তো ভালো। তাই নয় ?

কিন্তু তখনই শোভা উঠে দাঁড়ালো। বললো, আগে তোমার খাওয়ার যোগাড় করে নি। ভাসান বলেছিল কাল সকালে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবে। কাল সকালে দেখো সড়কের মাথায় উত্তরে নীল নীল পাহাড় দেখা যায়।

উনুনের ধারে বসে তরকারি কুটতে শুরু করলো শোভা ভাত চাপিয়ে দিয়ে··· এখন অবশ্য সরলা মাসি নেই। জরের ঘোরে বলা তার সেই তীব্র তাড়নাও নেই। আর তখন রক্ত মাথায় উঠেছে—পুলিন দল ছেড়ে যাবে। তা হলে এখন ?

পলকের জন্য নিজের হাঁটুর আড়ালে মুখ নামালো শোভা।

সে বললো, আমার কিন্তু দেরি হবে না। হাতমুখ ধুয়ে কাপড়জামা ছাড়ো। সে ভাবলো, তা ছাড়া মানুষ তো একটা ধারণা মাত্র হতে পারে না। কবিরা খায় না ? দার্শনিকরা ঘুমায় না ? তখন হয়তো তাদের নাকও ডাকে। আর তা ছাড়া এটা কি দুর্বলতা ?

পুলিন বললো, স্নান করলে হয়। কলটা আছে ?

—আছে। এত রাত।

—কত আর। ন-টা। আগে, মনে আছে, গভীর রাতে একবার আমরা স্নান করেছিলাম চুরি করে।

পুলিন উঠে বসলো। সিগারেট ধরালো।

শোভা ঘরের আর এক কোণ থেকে টিনের একটা ছোট স্যুটকেশ খুলে তার নিজের জন্য কেনা নূতন একখানা ধুতি বার করে আনলো।

পুলিন হেসে বললো—অবস্থা ভাল হয়েছে দেখছি।

—একগাছা বালা ছিল। সেটাই একমাত্র যা ওই পৃথিবী থেকে এসেছে। সব প্রায় খরচ করেছি এর মধ্যে। জোর জোর নিঃশ্বাস নেয়া যদি তাই বলো।

—ওই পৃথিবী? পুলিন আবার হাসলো। বেশ বলছো হাঁস ওড়া, ওই পৃথিবী, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়া। তখন কিন্তু বলতে শব্দ করে ভেঙেচুরে ছিঁড়ে খুঁড়ে নতুন কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা করা ভাল। আজকাল তোমরা এরকম ভাষাতেই কথা বলছো নাকি?

—আচ্ছা, ওঠো। স্নান করে এসো। শোভাও হাসলো।

আর তফাৎটা নতুন করে তার অনুভবকে ছুঁয়ে গেল আবার।

পুলিন যাচ্ছি যাচ্ছি করেও উঠলো না। বরং আর একটা সিগারেট ধরালো, আরাম করে টানলো বসে। সে যখন স্নান করতে গেল তখন বেশ রাত হয়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোভা দেখলো দূরে দূরে দু-একটা ঘরে আলো জলছে। বাজারের কাছে খানিকটা কুয়াশা ঢাকা আলো। তার কারণ বোধহয় এখন মিষ্টিওয়ালা আগুন দিয়েছে তার ভিয়ানে। আর এটা তো এতদিন নজরে পড়েনি, ওটা বোধহয় করাতকল। ততো উজ্জ্বল ইলেকৃট্রিকেরই হতে পারে। বারান্দাটা অবশ্য অন্ধকার।

আর তা ছাড়া...কারণ সমধর্মীকেই মানুষ ভালবাসতে পারে। সে হয়তো রাজহাঁসকে উড়তে দেখে উঠে পড়েছিল তাই বলে নিজে রাজহাঁস নয়। আর এটা হয়তো দুর্বলতাই তার—যা তাকে বরং বিশ্বাসযোগ্য করে।

শোভা হাসলো। আর অবশ্য এটা তার ভুল ধারণাই, কে আর তাকে এমন দুর্বল দেখেছে শোভার মতো, অসাড় সাপের মতো তাকে, ভুল ধারণাই যে তাকে, কম বয়সের একজন মনে হয়। ভুল ধারণাই কারণ সে শোভার সমবয়সী হবে। শোভা হাসলো। তা ছাড়া এটা...পুরুষদের এটাই নিয়তি সব জায়গায়, সময়ের কাছে, মাটির কাছে—কথাটা হাত পাতা বলতে পারো, আর তখনই তাকে দেখে মায়া হয়। নিজের চাইতে কমবয়সী মনে হয়।

বেশ লাগছিল দেখতে শোভার। অন্ধকারের মধ্যে বাজারের কুয়াশা ঢাকা আলোর মহলের মধ্যে ফুটে ওঠা সার্চলাইটের মতো করাতকলের উজ্জ্বল আলো। পায়ের শব্দে একটু চমকে উঠলো শোভা।

এরই মধ্যে হলো? কে? ও! ভাসান? এসো। ওদিকে দেখা হলো? শোভা হাসি হাসি স্বরে বললো।

ভাসান বারান্দার কাছে সরে এলো। পুলিনদা কোথায়? ঘরে?

—না, কলে গেল স্নান করতে। বসো। বলো শুনি কি হলো। প্রতীক্ষার হাসি দেখা দিল শোভার মুখে। অন্ধকার বলে তা দেখা গেল না।

—ভালোই। নরেশের ধানকলের চাকরি হবে পাকাপাকি। আর তাঁতের কথা বলেছিলে না? তা পাবে।

—তারপর।

—তারপর আর কি? একটা সেলাই কল তো? সেই ভদ্রলোক বললো আজ-কাল সরকার থেকে ধার দেয়। তদ্বিরের ওয়াস্তা। আর সুরেন তা করবে বলেছে।

—এত সংক্ষেপ কেন? খুলে বলো। ছোট ছোট খুশির ঢেউ লাগলো শোভার স্বরে। করাতকলের ভদ্রলোক তা হলে বাজে নয়। কিন্তু তোমার যেন আর কিছুতেই মন নেই। যা পাওয়ার সব পেয়ে গেছ।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসা লণ্ঠনের আলোর ম্লান কালটায় ভাসানকে কিছুটা মাত্র দেখা যাচ্ছে। দরজার ছায়াটা তার মুখে পড়ে বরং তার মুখটাকে থমথমে, আর লম্বাটে দেখাচ্ছে। আর তা এখনই। দেখো কি রকম মজা।

সে বললো, পুলিনদা তো স্নান করতে গেল তাই না? ভারি মজা কিন্তু। করাতকলের কাছে ধানকল হবে। আর তার মালিক কিন্তু সত্যি ব্রজ চক্কোত্তি।

—এমন নামটা যে তারও তা তো আগেই জানতে। শোভা ভাবল সব দিক দিয়ে আজ দিনটা ভরে উঠেছে।

—না। কই আর জানতাম। আলাপ শেষ হলে সে বিপিন স্যানকে বললো তোমাকে চেনা চেনা লাগে। মিরানি গ্রামের কুস্তির আখড়া কবেছিলে সে তুমি, না তোমার ভাই?

—বলো কি ভাসান।

বিপিন অবাক।

—বলো কি।

বিপিন অবাক। বিপিন বলে, আপনি? সে বলে তোমাদের পাশের গাঁয়ের

ব্রজ চক্রবর্তীর নাম শোন নি? আজ দশ বৎসর গ্রাম ছাড়া। আর সে বলে, পুলিনকে চিনতে? পুলু? তোমাদের বয়সেরই। আর সে বলে, বাপ মরা সেটাকে মানুষ করেছিলাম হে, আর হাসলো শোভা, একটি খুঁটি চেপে ধরলো, হাতের কাছেই পেয়ে। ভাসানও একটু পিছিয়ে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে। আলোর ফালিটা তার হাঁ করা মুখের দাঁতগুলোর উপরে পড়লো। কি কদর্য মানুষের হাঁ করা বোকা বোকা মুখ।

—তা হলে এই ব্রজ চক্রবর্তী সেই ব্রজ চক্রবর্তীই। আশ্চর্য! মানে পুলিন যাকে নিতাই বলেছিল না সকালে। সেই? তা হলে?

আমি যাই এখন? ফিস্‌ফিস্ করে বললো ভাসান।

—কিন্তু। খুঁটি ছেড়ে শোভা এগিয়ে এল। কিন্তু। শোভা ঢোক গিললো। কিন্তু···এ কি ভালো না? বলো? এই উরুণ্ডী। এ কি ভালো না বলো? কি যেন আর সেই হাঁস ওড়া···। এটাও কি মিথ্যা গল্প এই উরুণ্ডী? মানে প্রবঞ্চনা?

—আমি যাই এখন। অ্যাঁ! ভাসান আর একটু পিছালো। যাই এখন। অ্যাঁ? যাই? অ্যাঁ? ভাসান তার বাড়ির রাস্তার দিকে আর একটু সরে গেল। আচ্ছা, সে কাল। যাই এখন? অ্যাঁ।

অবশ্য মনস্তাত্ত্বিকরা বলতে পারেন পুলিনকে মানুষ করার দরুণ তার কাছে ব্রজ চক্রবর্তী ফাদার ফিগার ছিল কি না। আর তা বললে আক্রোশমূলক প্রচার, গল্প চৌর ইত্যাদিকে ক্ষমার যোগ্য বলা হয় কি না। তা আমাদের গল্প নয়।

কিন্তু অন্ধকারে আরও দু-চারজন লোক আসছিল করাতকলের দিক থেকে খুশিতে হাসাহাসি করতে করতে।

অন্ধকারে কি বোঝা যাচ্ছে এখন সড়কের উত্তর মাথায় নীল নীল পাহাড়ের আভাস। আরে বাপু, অন্ধকারে তুমি দেখছো না বলেই কি গাছগুলো লোপ পায়। ওটা নিশ্চয়ই মাধব যে আহো বল্লো বেশ জোরেই। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে কিন্তু তা শুধু অন্ধকারের দরুণই, শব্দটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে তার সারা গায়ে খুশির দোলানি দিয়ে তবে কথাটা বার হলো।

এখন বেতের চেয়ারের উপরে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছে সৌম্য, কনুই দুটো উরুর উপরে রাখা। হাত দুটো এইমাত্র অনেক কথা বলেছে, যার সঙ্গে মুখের কথার মিল ছিল না। অন্তত তাই ধারণা হচ্ছে এখন ক্রমশ : অন্তত এই শেষ দু' মিনিট ধরে ; আর তারই প্রমাণস্বরূপ যেন সে লক্ষ্য করছে ; হাতের তেলো দুটো যেমন লাল, আঙুলগুলো তার তুলনায় অনেক বিবর্ণ।

হাসল সৌম্য। বলল, "স্বয়ং রবিঠাকুর খেদ করে বলেছেন কাছাকাছি একটা ভদ্রগোছের ভালুকও ছিল না। বর্তমান জীবন এমন ঘটনাহীন যে তাকে ঘোলা জলের ডোবা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।" এই বলেই সৌম্য থামল। আর তার নিজের কাছেও কি পানসে লাগল হাসিটা ?

শমিতা সৌম্যর মুখের দিকেই চেয়েছিল। সে লক্ষ্য করল সৌম্যর চোখের প্রান্ত দুটিতে এলোমেলো কয়েকটা কোঁচকানো দাগ পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটা কি রসিকতার চেষ্টার ফল, অথবা—। অথবা প্রকৃতপক্ষে সৌম্যকে সে যত তরুণ মনে করে নিয়েছে তা হয়তো নয়। আর ভেবে দেখো কেমন বদলে যায় সেই পরিচিত বসবার ঘর। এখন কটা বাজে কে জানে, অনেকক্ষণ থেকেই বিকেলের আলোটার যেন পরিবর্তনই হচ্ছে না। যদিও এটা ভাবা অযুক্তির হবে যে সূর্য হঠাৎ কোথাও থেমে দাঁড়িয়েছে, অথবা আরও আধুনিক ভাষায় পৃথিবীটার পাক খাওয়াতে ঢিলেমি লেগেছে।

সৌম্য উঠে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুককেসের মাথায়, টেবলে, দেরাজে কি খুঁজল, ফিরে এসে চেয়ারটাতেই বসলো আবার।

শমিতা বলল, "তুমি কিছু খুঁজছো ?" সে গালের তলায় হাত দিয়ে ঝুঁকে ছিল, সোজা হয়ে বসল এবার। "ও, এই যে," সৌম্য বললে। সামনের টিপয়ের উপর থেকে সিগারেটের কেসটাও তুলে নিল সে। যেন সে সেটাকে খুঁজছিল। সিগারেট কেসটাকে পকেটে রাখল সৌম্য যেন বেরুবে এখন। কিন্তু চেয়ারের পিঠে হেলান দিল বরং। বলল, "মালার্মের কথা বলেছিলে। এখন কি তা হবে ?"

শমিতা অনুভব করল শিষ্টতার মতো কিছু যেন, গত পাঁচ মিনিটে এই দু বার হল না ? রবিঠাকুরের ভদ্রগোছের ভালুকের কথা শুরু করে মালার্মে উচ্চারণ করল

সৌম্য এবার।

শমিতা লক্ষ্য করল সৌম্যর হাতের আঙুলগুলোকে রক্তহীন দেখাচ্ছে। নখ-গুলো সুন্দর, ম্যানিকিওর করা যেন। তা সত্ত্বেও আঙুলগুলোর বিবর্ণতা চোখে পড়ছে। আর কাঁপছেও যেন সেগুলো।

শমিতা মনে মনে বলল, "আ সৌম্য, তুমি হয়তো কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজছো। কিন্তু নাটক নভেলে ঘটনার কারণ খুঁজতে হয়, কোনো ঘটনাকেই হঠাৎ আনলে পাঠক সেটা মেনে নেয় না, আর সব চাইতে ভালো হয় যদি ঘটনাটার বীজ চরিত্রে নিহিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নাও হতে পারে। বরং মেনে নাও ঘটনার পিছনে কারণ নাও থাকতে পারে।"

শমিতা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, "তোমাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না?"

"বরং—।" বলল সৌম্য।

আর তারপর সে ভাঁজ করা হাতের মণিবন্ধে চিবুক রাখল। এই প্রথম। এটা গভীর করে চিন্তা করার ভঙ্গি তার, শমিতার চাইতে তা আর কে বেশি জানে।

শমিতা ভাবল, "যদি তা বল তবে একটা ঘটনাকে টেনে টেনে অন্য যে কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগ করে দেয়া যেতে পারে। কানাডার সেই এম. পি. যে খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গেও যুক্ত করে দেয়া যায়। আর সে ঘটনাটার কথা আজকের কাগজেই আছে। বিটলদের সঙ্গে সে ব্রাকেটেড হতে চায় নি। কিন্তু তা কি এক রকম আতিশয্য নয় মনস্তাত্ত্বিকতার?"

শমিতা উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আর ফুলে ফুলে ময়ূরের মতো চঞ্চল গুলমোরটাকে দেখতে পেলো সে। কিন্তু তক্ষুণি সে সরেও এলো। সৌম্যর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল, একটু তাড়াতাড়ি করে বলল, "চা করি এখন—তাই নয়।"

অদ্ভুত ফাঁকা শোনাল তার প্রস্তাব?

"কিন্তু কখনও কখনও মনের সূক্ষ্ম চিন্তাকে অবহেলা করতে হয়।" এই ভাবল শমিতা। "হ্যাঁ, এটাকে সে অন্তর থেকেই বিশ্বাস করে। জয়েস পড়তে এবং পড়াতে সেটাই তার এক নম্বর আপত্তি। এমন কি চিন্তাশীল ডেনকে যদি চেতনা তরঙ্গে যুক্ত কর, চরিত্রই লোপ পেয়ে যাবে। অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের যা পড়িয়েছি তাতে চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছি, তাই নয়।

"তবে ইদানীং আমার মত বদলেছে। কিংবা মতটা আগেই ছিল এখন তাকে বিবৃত করতে পারি। সংক্ষেপে, চরিত্রকেই একমাত্র মনে করা ভুল। এবং এমন কি একটা ঘটনা ঘটিয়ে চরিত্র এঁকে ফেলা কৌশল হতে পারে, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয়

না চরিত্রটা স্থির কিছু হয়ে মানুষটার গায়ে এঁটে বসল চিরকালের জন্যে। অন্য-দিকে চরিত্র, ঘটনা সংস্থান, কাব্য সব মিলেই নাটক।”.

শমিতা বলল, একটু জোরে বেশ স্পষ্ট করেই বলতে পারল সে, “চা করেই আনি। আর তারপর মালার্মেও শুনব। প্রস্তাবটা আমি করেছিলাম, আজ বিকেলেই করেছিলাম ; আর লক্ষ্য কর যদি, সেই বিকেলটাই এখনও রয়েছে।”

বেশ দৃঢ় পদক্ষেপ করে করে শমিতা পাশের ঘরে চা করতে গেল। স্টোভ ধরাল সে। একটু কাৎ করে মাথা বার্নারের সমতলে এনে পিন করল। কেটলি বসাল। ছোট রেফ্রিজারেটারটা খুলল। এখন সময় নয়, তা হলেও কিছু দেবে সে সৌম্যকে চায়ের সঙ্গে। রেফ্রিজারেটার বন্ধ করে সে ফিরে এলো চায়ের টেবলের সামনে। স্টোভটা টেবলে বসানো। দাঁড়িয়ে কাজ করতেই পছন্দ তার। চায়ের ক্যাডি, কাপ-প্লেট, চামচ, ছাকনি টেবলের উপরেই ছিল। সেগুলোকে সাজালো শমিতা টেবলের উপরে। তাদের প্রত্যেকের পৃথক আকৃতিগুলোকে লক্ষ্য করে করে দেখল। স্টোভে সাইলেন্সার দিলেও শব্দ হয়। সে শব্দটাও, তা ক্ষীণ হলেও, শুনতে পেলো শমিতা। যেন মনোযোগই দিল সেদিকে।

খুক্ খুক্ করে কাশলো যেন কেউ। আচ্ছা ? তা হলে— । অবিশ্বাস আর স্বস্তির মাঝামাঝি এনে শমিতার মনে এই শব্দ কয়েকটি। পায়ের থেকে ক্রেপ-সোলের নিঃশব্দ চটিটা খুললো সে। ঠিক পা-টিপে চলা নয়, সেটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে ? শব্দ যাতে না হয় এমন ভাবে চলে চলে বসবার ঘরের সামনের বারান্দায় এলো ঘরে না ঢুকে। নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নেয়ার ভঙ্গিতে আবার সে উঠে দাঁড়াল। এবং তারই মধ্যে সে দেখেও নিতে পেরেছে। সৌম্য সিগারেট ধরিয়েছে —এতক্ষণে। আর তার চেয়ারের পাশের বেতের টেবল থেকে একটা কিছু তুলেও নিয়েছে—হয়তো খবরের কাগজটাই আবার, অথবা জর্ন্যাল, অথবা—সে যা কিছুই হোক। কিছু একটা যে তাই যথেষ্ট।

চায়ের স্টোভের কাছে ফিরে এলো শমিতা। ছোট একটা বেতের চেয়ার এ ঘরেও আছে। শব্দ না করে সেটাকে তুলে আনল সে টেবলের কাছে। একটু বসে নেবে সে। চায়ের জল হতে হতে এবং চা ভিজিয়েও খানিকটা চিন্তা করে নিতে পারে—অবশ্য, এটাকে এমন দুশ্চিন্তার বিষয় করা কি উচিত হচ্ছে ?

ব্যাপারটা যে ভাবে ঘটলো পর পর দেখে গেলেও হয়। ঠোঁটের কোণে একটা আঙুল রেখে, তার ডগাটাকে কোমল করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সে। লোকে বলেছিল : প্রত্যয় করা কঠিন। কেউ বললো শিব-শিবানি, অন্য কেউ বলল ম-ঝুসৎ, অন্তত একজন বলেছিল রবিঠাকুরের লাবণ্য-অমিত। লাবণ্য-অমিত

রবিঠাকুরের প্রচণ্ড কৌতুক কিনা এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, অথবা ম-ঝুসৎ এই যৌগ শব্দটি একটা অপপ্রয়োগ—তা হলেও ভাবটা বোঝা যায়। এ সবই তাদের বিয়ে নিয়ে। যারা উত্তেজিত হয় নি তারাও ঠাণ্ডা খুশিতে বলেছিল বিধিকে যদি না মানো বলে। অ্যাক্সিডেন্ট—যেহেতু কোনো সামাজিক-অর্থ নৈতিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না—এমন একটি চমৎকার বিয়ে। কৃশমধ্যা, পীনোন্নতা, সুগৌরী শমিতার—(শমিতার গালে লাল লজ্জা দেখা দিল, সে টেবলের উপরে চামচটার গায়ে আঙুল ঘষল, সে জানে তার বাস্টটা এত ভালো যে সিনেমা অভিনেত্রী বলে দু একজন ভুল করেছে।) আর সৌম্য, নর্ডিক বলতে ঝোঁক আসে। কিন্তু নর্ডিক বলতে আমরা জার্মানদেরকেই বুঝি. আর তারা বেশ একটু গাঁট্টাসোট্টা। বরং ভরতকে, ভরতচন্দ্রকে নর্ডিক বলা যায়। বিয়ের সময়ে খাটুনি-খাটা, এমন কি কনের পিঁড়িধরা, অন্যদিকে পুলিশের সাব-ইন্‌সপেক্টরের চাকরি করা —এ সবই ভরতচন্দ্র তার নর্ডিক গড়ন নিয়ে বেশ সমাধা করতে পারে। সৌম্যকে কি বলা যাবে? কিছু বলা দরকারই বা কি? একটু দোহারা সোনালি রঙের শরীর; চোখে চশমা বটে, তাতে চোখের দীপ্তি ঢাকা পড়ে না। ইন্টেলেক্‌চুয়াল কথাটা দিয়ে শমিতা চিন্তা করে, বাংলা ভাষার প্রতিশব্দগুলোকে তেমন শানানো মনে হয় না। বাকি থাকে অর্থ: উচ্চ মধ্যবিত্ততায় অভ্যস্ত সৌম্য নিজেও এডুকেশন সার্বিসের ক্লাস ওয়ান অফিসর। শমিতা এখনও ক্লাস টু বটে, ডক্টরেটটা হলে সেও প্রোমোশন পাবে—এটা ধরে নেয়া যায়। দু বছর হল তারা সংযুক্ত হয়েছে। শমিতার ডক্টরেটটাই তাদের প্রথম সন্তান হবে। ইতিমধ্যে তারা অত্যন্ত লম্বা গড়নের সাদা লালে রাঙানো একটা অটো কিনে ফেলেছে। (অটো মানে যাকে আমরা মোটরগাড়ি বলি।) কিন্তু আসল অথচ ছোট্ট একটা কথাও আছে। বিয়ের কথা যখন অগ্রসর হয়েছিল তখন দেখা হয়েছিল স্যোসিয়েলে। পরবর্তী বক্তার নাম যখন ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হল তখন সেই পরিচিত নামটি দেখে শমিতা ভেবেছিল ফাঁকি দিয়ে দেখে নেয়া যাবে মানুষটাকে। সৌম্য যখন উঠে দাঁড়াল তখন শমিতা লাল হয়ে উঠেছিল। সে কি খুশিই হয়েছিল। যা সে কল্পনা করেছিল তার চাইতেও ভালো। কিন্তু ব্যাপারটা একতরফা হয় নি। সৌম্যও সুযোগ পেয়েছিল। তার একজন সহকর্মী স্টেশনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ইনি শমিতা রাহা, আমাদের নতুন অধ্যাপিকা। সৌম্য, এত ভালো বক্তা সৌম্য, নির্বাক হয়েছিল। শমিতা যত খুশি হয়েছিল সে কি তার চাইতেও বেশি খুশি হতে পেরেছিল। গাড়িটা চলে গেলে সৌম্য বলেছিল, "আমি সব জানি, আপনিও শুনে থাকবেন। আপনার মত বলুন।" শমিতা বলল, তার আগে তার গাল লাল হয়ে উঠল আবার, হাতের

ব্যাগটাকে খুঁটতে খুঁটতে সে বলল, "আমার আপত্তি নেই।" সৌম্য বলল, "আমি আর একটু এগিয়ে যেতে চাই—সৌভাগ্য বলব আমার। আবার দেখা হয় না?" শমিতা একটু ভেবে বলল, "কাল সাড়ে ছটায় মিউজিয়ামের দরজায়।" বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে কর্তারা তিন মাস সময় নিয়েছিল—আর সেই সুযোগে, তাকে পূর্বরাগই বলা উচিত। ঠিক একটা স্বপ্নে দেখা ব্যাপার নয়।

কোথায় যাওয়া যায় পুজোর ছুটিতে? কারগিল, স্কার্দ, ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর, সিমলা, অথবা উটি? এসেছে দেউগিরিতে। নামের জন্য? দুধ খাঁটি? মুরগি সুপ্রচুর? না। পিস, শান্তি। শান্তি, ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে লিনেটের ছোট-ছোট পাখা থেকে। দেউগিরি অবশ্য একটা জায়গা, কিন্তু তাদের ইচ্ছামূলক চিন্তা এবং অনুভূতিতে গড়া দেউগিরি কোনো সারভে ম্যাপেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথবা শমিতার শরীর কি সসাগরা একটা মহাদেশ নয়? কিম্বা সৌম্যর প্রশস্ত উঁচু কপাল কি হিমালয়ের কোনো চূড়ার মতো নয়। খানকয়েক মাত্র বই এসেছে, মাত্র খানকয়েক।

গেটের পাশে বিলেতি গাবগাছ। ছোট একটা বাগান, তারপরেই বাংলো ধরনের লাল রঙের বাড়ি। বাগানের কোণে গুলমোর। বাসায় ঢুকবার দরজার পাশে দেয়ালে উঠেছে এমন একটা লতা। শমিতার ধারণা সেটা আঙুরলতা, যদিও সেটাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে। 'আঙুর' এই শব্দটি অনন্য নয়? আঙুর, দ্রাক্ষা, গ্রেপ—সব কয়েকটি শব্দ সুশ্রাব্য, সুস্বাদ: এমন কি ক্রিপারের মধুর উচ্চারণ যথেষ্ট নয়, ভাইন। শমিতা আর একটু এগিয়ে যায়, দক্ষিণ ফরাসী দেশেব, বিশেষ করে প্রোভেসের কথা নাকি তার মনে আসে।

ঠিক যেন রবিঠাকুরের সাজানো গল্প।

কিন্তু এ কথাগুলো এখন মনে হচ্ছে কেন? টিপটে চামচ মেপে চা দিতে গিয়ে হাতটা একটু কাঁপল শমিতার। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু করতে গিয়ে প্রথম অঙ্কের সার উদ্ধার করার মতো—অথবা, ডাক্তারের হাতের হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের মাথা থেকে শেষ বায়ু-বুদ্বুদের সঙ্গে ওষুধের প্রথম কিছু গড়িয়ে পড়লে ছোট্ট এক টুকরো ভয়ে চোখের পাতা যেমন বার দুয়েক কেঁপে ওঠে তেমন করে কাঁপলো শমিতার চোখের পাতা, অথবা কি কি ঘটে ঘটে শেষে এই চূড়ান্ত ঘটনায় পৌঁছুলো তারা তারই হিসাব নিচ্ছে সে? ছি ছি। কেটলি থেকে টিপটে জল ঢালল শমিতা। বাষ্পটা চায়ের সুগন্ধ বহন করে উঠে এলো টিপট থেকে। হঠাৎ এক বিন্দু জলের মতো কিছু টলটল করে উঠল শমিতার চোখের কোণে।

এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে যদি তা হয় প্রায় স্বগতোক্তির মতো এই

সুনির্দিষ্ট চিন্তা করল সে। অথচ প্রায় রোজনামচা লেখার মতো করে গুছিয়ে উঠছে তার মনের মধ্যে ঘটনা পরম্পরা।

আয়নার গোড়ায় চিরুনি রেখে শমিতা শোবার ঘর থেকে বসবার ঘরে এলো। এদিক ওদিক চাইতে টিপয়ের উপরে চোখ পড়ল। সিগারেট কেস নেয় নি সৌম্য। প্রাচীন হাতির দাঁতে যেমন শমিতার ব্যক্তিত্বে যেন তেমন ফাটল দেখা দিল। গৃহিণী শমিতা ভাবল : তা ভালোই সিগারেট কম খাওয়া। ক্যানসার ট্যানসার কি সব বলে। কথাটা কি দিদিমার কাছে শেখা—ষাট, বালাই! অন্য শমিতা ভাবল : নতুন প্যাকেট ছিল বোধহয় দেরাজে। সে টিপয় থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নিল। পরিচিত সুগন্ধ। অথবা ম-ঝুস্‌ৎ হলো না : সৌম্যর সুঘ্রাণ যৌগিক, তার একটা উপাদান এই টার্কিশের পরুষ-সুগন্ধ।

ঘড়িতে দেখেছিল শমিতা সাড়ে ন'টা বাজে। ধারাহীন পরকলার চশমাটা চোখে দিয়ে ইজি-চেয়ারটায় বসল সে। একটা পত্রিকা টেনে নিল সে জর্ন্যালের টেবল থেকে। হাতলের উপরে পা তুলে দিল সে। আর তখন আমাদের চোখে পড়ল তার দুধে আলতা রঙের বাঁ পায়ের ডিমে প্রায় এক বর্গইঞ্চি মাপের বৃত্তাভাসের মতো কালো একটা জড়ুল আছে।

পত্রিকার পাতায় চোখ দিয়ে বাঁ হাতের একটা আঙুলে গলার সরু হারটাকে পাকাতে লাগল শমিতা। কবোষ্ণ সুখের প্রবাহ যেন তার শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সেটা, ডাক্তাররা জানে, সেটা তার সুস্থ রক্তের প্রবাহই যা বহুমুখে সুজীর্ণ, সুস্বাদ ব্রেকফাস্টের থেকে তখন বল সংগ্রহ করছে।

আর ঠিক তখনই পাখিটা ডেকে উঠল। অবিকল যেন পাখি। শমিতার মুখে একটা হাসি দেখা দিল।

ঠিক এ সময়েই বারান্দায় জুতোর শব্দ হলো। যেন আঙুলের ডগায় ভর করে এমন লঘু পদক্ষেপে ছুটে এলো শমিতা দরজার কাছে। তার কি পায়ের শব্দ চিনতে এখনও ভুল হতে পারে! হাতের পোর্টফোলিও স্ফীতোদর।

সৌম্য বলল, "দেখো কি এনেছি, বালা।"

শমিতা পোর্টফোলিও ব্যাগটাকে দু হাতে বুকের উপরে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তা দু এক পলকের জন্য। তারপরই এক হাত দিয়ে সৌম্যর হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল চেয়ারের কাছে। তাকে চেয়ারে বসিয়ে ব্যাগটাকে রাখলো টেবলে। তোয়ালে আনলো। কপালটা মুছিয়ে দিল। কপালের উপরে কয়েকটি চুল গুছিয়ে দিল আর তাতেও সবটুকু হলো না।

আর সৌম্য বলল : রোজ সংগ্রহ কিম্বা শিকার ভালো হয় না। আজ আমার সৌভাগ্য উদয় হয়েছে। এই বলে সে পোর্টফোলিও ব্যাগ খুললো। বলল, হে ললনে, দেখো এই কুরিয়ার, এই লুমিনিতের সাহিত্যসংখ্যা, হে বীরজায়া দেখো এই টাইমস্ লিট্যারারি সপ্লিমেন্ট, এই রিভ্যু অব রিভ্যুস। অয়ি সুভগে, তোমার জন্য বাংলা পত্রিকা অমৃত ও দেশ একই সঙ্গে সংগ্রহ করেছি, কারণ আফটার অল অথবা অ্যাবভ অল বলব ?—তুমি বাঙালি মহিলা। আর এইগুলি দেখো মায়ের চিঠি, মাসীর চিঠি, এটি কোন ভরতচন্দ্রের কার্ড, বন্ধু নাকি ?—মনে পড়ছে বরযাত্রীদের তত্ত্বতালাস করেছিল যে পালোয়ান সেই বোধ হয়— আর এই মূল্যবান চেহারার খামখানা এটা তোমার এয়ারকণ্ডিশানিং-এর এষ্টিমেট এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

শমিতা বলল : হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার যে দক্ষিণ বাহু একই কালে মৃণালের মতো সুখস্পর্শ এবং মহাভুজঙ্গের মতো শত্রুপীড়ক তা আমাকে সতত রক্ষা করুক।

এই বলে শমিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সৌম্য বলল : এর আর পর নেই।

কিন্তু—দেখো এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। ট্রের উপরে তাড়াতাড়ি পেয়ালা-পিরিচ চামচ, ছাকনি, টিপট গুছিয়ে নিল শমিতা, কেক্ প্যাটির ছোট একটা রেকাবি। তাড়াতাড়ি হেঁটে বসবার ঘরে ফিরে এলো সে। শব্দ করে টিপয়টাকে টানল সে। ট্রেটা রাখতেও মৃদু একটা শব্দ হলো। হাত কাঁপিয়ে হাতের চুড়িগুলো গুছিয়ে নিল সে শব্দ করে করে একটু জোরালো গলায় বললে—'চা এনেছি।'

এই শব্দগুলোর ফল ভালোই হবে, এই ভাবল সে, বিকেলের আলোটায় কম বেশি হতে পারে। তুলনা দিলে এই শব্দগুলোকে বিকেলের এই থেমে যাওয়া সময়ের বিরুদ্ধে। কিংবা অচল নিস্তরঙ্গ সময়ের ডোবায় দাঁড় ফেলা বলা যেতে পারে। আর সে লক্ষ্য করল সৌম্য চেয়ারের গভীরতায় ডুবে চোখের সম্মুখে খবরের কাগজটাকে মেলে ধরেছে। এটাকেই একটা পরিবর্তন বিন্দু বলা যেতে পারে। শমিতা ঘরের চারিদিকেও চাইল। বসবার ঘরের ডানদিকের দেয়ালে দুটো জানালা। সেদিকেই খাবার টেবল পাতা। টেবলে কাঁচ, ক্রোমিয়াম, পোর্সিলেনের তৈজস। তা থেকে কিছু দূরে মুখোমুখি দুখানা বেতের চেয়ার। তা থেকে আর কিছু দূরে কিছু কাঠ কিছু বেতে তৈরি ইজিচেয়ার একখানা। ইজিচেয়ার আর বেতের চেয়ারগুলোর মাঝখানে টিপয়। তার উপরে সিগারেট, দেশলাই, অ্যাসট্রে। ইজিচেয়ারটার বাঁ দিকে বেতের টেবলে জর্ন্যাল আর খবরের কাগজ।

আর আজ সকালের আনা জর্ন্যালগুলোও রয়েছে।

কিছুই বদলায় নি এ কথাটা বললে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয় বদলেছে এটাই অন্তত মনে করা হয়েছিল। তা না বলো, টিপয় টানা, ট্রে রাখা এবং চুড়ি গোছানোর শব্দ যেমন তেমন এই জিনিসগুলোর পরিচিত আকৃতিগুলোকে হঠাৎ যেন অবলম্বন করার মতো কিছু মনে হলো, চা করতে উঠে যাওয়া, চা ভিজিয়ে ফিরে আসার রোজকার মতো ঘটনাগুলো যেমন।

শমিতা বলল, "চা দিয়েছি। আর প্যাটিগুলোকে পরখ করে দেখবে নাকি ?"

সৌম্য মুখের সামনে থেকে কাগজটাকে সরাল। শব্দও হলো কাগজটাকে সরাতে যেমন হওয়া স্বাভাবিক। জর্ন্যাল-টেবলে আলতো ভাবে ভাঁজ করা কাগজ-টাকে ফেলে দিয়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই চায়ের কাপটা তুলে নিলো। আর তা দেখে শমিতার মনে হলো ভালোই হয়েছে তা হলে চা করতে যাওয়া।

সৌম্য বলল, "কাগজে সংবাদটা আবার পড়লাম।"

"কোন সংবাদ ?" খালি বেতের চেয়ারটার পিঠ থেকে তুলে একটু ঘুরে এসে সেটাতেই বসল। শমিতা নিজের জন্য চা-ও ঢেলে নিলো খালি অপেক্ষমান কাপটাতে।

সৌম্য একটু সময় নিল যেন।

"অবশ্য, এমন কিছু নয়। ওটা বাড়াবাড়িই বলতে পারো। ক্যানাডার সেই এম. পি. যে চিঠি লিখেছে। এ বিষয়ে তোমার মত কি ?"

"তুমি কিন্তু প্যাটি ছুঁলে না।"

সৌম্য প্যাটি থেকে একটু ভেঙে নিল। বলল, হেসে হেসে, "এটা কি সমাজে এক সময়ে চলে যাবে ? বিটলদের গানের কথাই ধরো।"

শমিতাও হাসলো। বলল, যেমন সে অনেক সময়ে অনেক কথা থেকে সরে আসার জন্য বলে, "যদি বলো ও বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো।"

সৌম্য শমিতার মুখের দিকেই চাইল। তখন শমিতার মনে হলো ওভাবে কথাটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো হয় নি। কিন্তু কি করে আবার কথাটাতেই ফিরে যাবে তাও সে ভেবে পেল না। সে লক্ষ্য করল সৌম্যর সোনালি মোমের মতো রগের কাছে যেন লাল কালির মতো লাল হয়ে উঠেছে। যেন অসহ্য চাপ লাগছে সেখানে। আর তারই ফলে যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। কিন্তু সৌম্য, সৌম্য বিটল বা বিটনিক বলে তুমি কি লঘু করতে চাইছ, যেমন পাগল অথবা মাতাল বলে উপেক্ষা করার মনোভাবটা আনা হয়ে থাকে ? বিটল বিটনিক পাগল, মাতাল, সমাজে আছে—তাদেরও এদের মধ্যেই ধরে নাও, কিন্তু সে রকম বলা কি—।

না। খবরের কাগজটা তুলে নিল শমিতা। একটু চোখ বুলোতেই সে খবর পেয়ে গেল। বলল, "দেখেছো—ট্রেভেল্যানের এই বইখানার আবার রিভ্যু হয়েছে। তা হলে এবার পাওয়া যেতে পারবে।" সৌম্য সাগ্রহে মুখ তুলল, যেমন হলে স্বাভাবিক হয়। রোজকার মতো হয়।

"তাই নাকি? ইংলিশ সোশ্যাল হিস্ট্রি?"

খবরের জায়গাটাকে ভাঁজ করে সৌম্যর দিকে এগিয়ে ধরলো শমিতা। সৌভাগ্য, সৌভাগ্য!

সৌম্য বলল, "তাই তো দেখছি।"

"এবার থেকে অর্ডার দিতে দেরি করা চলবে না আর।"

চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল সৌম্য। শমিতা সিদ্ধান্ত করলে ওর মুখের দিকে না চাওয়াই ভালো। ও যা বলবে তা বলুক। কথাটাকে ঘুরিয়ে দেয়া উচিত হবে না।—তা যদি বিটলদের কথাই হয়। কিংবা সৌম্য কি বিটল কথাটা ইচ্ছা করেই পরিবর্তে ব্যবহার করেছে। অথবা হয়তো ও দুটো ব্যাপারই সৌম্যর চোখে এক। কিছু একটা গলার কাছে অনুভব করল শমিতা। সেটাকে গিলে ফেলাই ভালো; কিন্তু তা যদি কান্না হয়? না না। আরও ক্লেদাক্ত হয় না তা হলে।

চা খেলো সৌম্য, সিগারেট ধরালো। হাতের তেলো দুটো একটার গায়ে অন্যটাকে লাগিয়ে ম্যাটিংএর দিকে চেয়ে রইল।

শমিতা বলল, "আচ্ছা, শোন, একটা কথা কি, বলছিলাম—"

হঠাৎ যেন একটা অপরিসীম ব্যথার ছাপ পড়ল সৌম্যর মুখে।

আর শমিতা বরং খবরের কাগজ দিয়ে মুখ আড়াল করল।

আবার কি তাকে আড়ালে থেকে নিজের জীবনের ঘটনাগুলোকে অনুসরণ করে করে কারণ খুঁজতে হবে? অসাধারণ হয়ে ওঠে না তা হলে ব্যাপারটা। নভেল নাটকে ছাড়া তা কি কোনো নায়িকা করে? আর তাই বা কেন—এটা একটা—এর কোনো কারণ হিসাবে কি তার জীবনের কোনো ঘটনাকেই দায়ী করা যায়? শমিতা ভাবল: কত ঘটনার কথাই তো উল্লেখ করতে পারে সে নিজের জীবন থেকে। এই তো সেদিন—চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ থামল শমিতা আয়নায় তার মৃদু হাসি চকমক করে উঠল। আলমারিতে বাক্সে শোয়ানো আঙুরগুলো থেকে নিটোল একটিকে ছিঁড়ে নিল সে। দু-হাতে তেলোর মাঝখানে রেখে যেন তার সুখদায়ক স্পর্শকে অনুভব করল। তারপর দু-হাতের চাপে হঠাৎ সেটাকে

ফাটিয়ে দিয়ে বসে ভেজা হাতের তেলো দুটোকে চোখের সম্মুখে মেলে ধরল। সে কি আশা করেছিল তার তেলো দুটো রক্তের মতো লাল অথবা চাঁপার মতো সোনালি হয়ে উঠবে? জাগ থেকে জল ঢেলে হাত ধুয়ে ফেলে সে আবার চুল আঁচড়াতে শুরু করেছিল। লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। এই দুঃসাহসিক রোমাণ্টিকতা অথবা যৌবনপ্রমত্ততার মধ্যে কি দুর্বলতা ছিল? কিম্বা আজ সকালের সেই ঘটনাটা—ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলে দিয়ে সে জর্নাল পড়ছিল। আর ঠিক তখনই পাখিটা ডেকে উঠল। অবিকল যেন পাখি। সেই দ্রাক্ষানিঙড়ানোর সকালেই প্রথম কানে এসে থাকবে। কিন্তু দু-একদিন আগেই শমিতা বুঝতে পেরেছিল সেটা আসলে শিস। (যাকে চলতি কথায় সিটি বলে। কথাটা উচ্চারণ করতে অসুবিধা বোধ করে শমিতা।) বাংলোটার সামনেই বাগান, কিন্তু ডানদিকের রাস্তাটা আর ঘরের দেয়ালের মধ্যে চার-পাঁচ হাত জমিও নেই। সেই রাস্তায় এই সময়েই কেউ জোর শিস দেয়, অজ্ঞাত পাখির ডাকের মতো, কিন্তু তীব্র। খাবার টেবলের ও-পাশে, কাঁচের জানালা দুটোর পরেই রাস্তা। দু-একদিন আগেই, অনুমান করে শমিতা, শিস-ওয়ালাকে দেখতেও পেয়েছিল সে, জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে। কালো রঙের ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট, সোনালি টি শার্ট, পায়ে নাগরা। মাথার চুল পিছনে কাঁধ, সামনে ভ্রূ পর্যন্ত, শীতকালের কালো রেশমের টুপি হতে পারে। শমিতা পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসেছিল। আর ঠিক তখনই আজ শিসের বদলে গানের সুরটা কানে এল তার। দু-একটা কথা তারপরে আলতো গলায় আনন্দপ্রকাশ—হা-হা, অন্য কলি তারপরে তেমনি আলতো গলায় হো-হো। সুরটা তার জানালা পার হয়ে চলে গিয়েছিল। বল, একে কি তোমরা অপরিণামদর্শী প্রশ্রয় দেওয়া বলবে? তাহলে (ঠোঁটটা কাঁপল শমিতার) নিজের বাসায় ইজিচেয়ারে বসাটাও দোষের বলবে?

অদ্ভুত একটা গরম লেগে উঠল শমিতার। যেন কয়েক বিন্দু ঘাম দেখা দেবে তার কপালে। আঁচল তুলে কপালটা মুছল সে।

সৌম্য পুড়ে-যাওয়া সিগারেট থেকে আর-একটা ধরিয়ে নিল। আচ্ছা এমন করে কি সিগারেট খায় সৌম্য, বেশি খাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছে সে, মনস্তত্ত্বের বইয়েতেই নিশ্চয়, পুরুষমানুষ সিগারেট সব সময়ে নেশার জন্যই খায় না। না, সময় কাটানোর জন্যও নয়। আপদে-বিপদে, ভয় পেলে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় মায়ের স্তন্যে আশ্রয় নেয়ার প্রবৃত্তি সিগারেটকে অবলম্বন করে অনেক সময়ে। একে কি তাই বলবে, সৌম্যের এই সিগারেট খাওয়া, কিংবা একবারেই

তো নজরে পড়ল। হিসাবের বাইরে একটা সিগারেট।

শমিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, "আলোটা জ্বালি, কি বল? আলোটা জ্বালি।" তাহলে হয়তো বিকেলটা পার হতে পারে।

আলো জ্বালাল শমিতা। আর তা যেন শমিতার সহায় হল। ইলেকট্রিসিটির আধুনিকতাই যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

জেদি মেয়ে শমিতা, একথা কি কেউ জানে। সৌম্য তো নয়ই। তার পরীক্ষার বিষয়গুলো কখনও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে সে জেদের পরিচয় পেয়েছে।

সে ভাবল: আর ইতিপূর্বেই অন্তত আর একবার বিকেল থেমে যাওয়ার আগেই জীবনের ঘটনাগুলোকে হাঁটকে দেখেছে সে। সে তো একটা পরীক্ষার সূত্রপাত যার শেষ ধাপই শুধু বাকি। জেদ চাপলে যেমন হতে পারে তেমন করে ঠোঁটের কোণ দুটি শক্ত হয়ে উঠল শমিতার। প্রস্তাবটা শুনে শমিতা বলেছিল, "সৌম্য, এই আচমকা সুখ এনে দেয়ার জন্যই তুমি দেবতার মতো বড়ো।" সুখটা আচমকা বটে, টমটমে ওঠার সময়ে এ-কথাটা বললেও প্রস্তুতি চলেছিল ঘণ্টা-খানেকের আগে থেকেই।

প্রস্তাবটা শুনে শমিতা কোলাহল করে উঠেছিল। "তুমি এত ভালো, এত ভালো সৌম্য। কিন্তু—আচ্ছা, আমরা যদি নিজের কাপ-প্লেট নিয়ে যাই?"

"কিম্বা খাবারের ঝুড়ি? তাতে দোকানির আপত্তি নেই। আর মালার্মে কিম্বা বোদলেঅর অথবা দুই-ই, সে আর একদিন, কি বল?"

"আমি পোশাক পালটে নিচ্ছি; তুমি কিন্তু ছাই-নীল গ্যাবার্ডিনটা পরবে। আমি এসে টাই দেখে দেব।"

টাই বাছাই করতে যা একটু দেরি হয়েছিল। লালের জমিতে শাদা আঙুরের মোটিফটা অবশেষে পছন্দ হল শমিতার।

আর দেখ এখন কোথায় ত্রুটি ছিল? সেই টাইটাতে? অথবা কেউ যদি মালার্মে কিম্বা বোদলেঅর অথবা দুই-কেই সরিয়ে রেখে এগিয়ে যায় হাঁস-নামা জলার দিকে সেটা কি ক্লাইম্যাক্সের বীজবাহী ঘটনা সংস্থাপন হতে পারে?

এটা দেউগিরির বৈশিষ্ট্য যে এর ছোট নদীটা হোগলা আর হাতিঘাসের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় শহরের আধ মাইল বাইরে। সে নদীকে ঝরণার চাইতে কিছু বেশি বলা যায় না, কিন্তু তা একটা ডোবা তৈরি করেছে। কোথাও বড় বড় ঘাস জলের উপরে, কোথাও টলটলে জল। জলের উপরে বটের ডাল নুয়ে পড়ে জল ছুঁয়েছে কোথাও। আর সেখানে নেমেছে হাঁসের ঝাঁক। প্রতিবারেই নামে, এবার কিছু আগে। এখনও খবর পায় নি শিকারীরা, অথবা বনবিভাগ

কাউকে এখানে শিকারের অনুমতি দেয় না। খুব ভিড় হয় না দর্শকের তার প্রমাণ এই যে হাঁসরা ভয় পেয়ে পালায় নি, অন্তত একশ লোকের ভিড় হয়, তার প্রমাণ ছাতিম গাছের তলায় একটা ছোট শাদা ঘরে একটা ছোট রেস্তোরাঁ চালু আছে।

শমিতা উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে জানালার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে গরাদটা চেপে ধরল। সে অনুভব করল রেস্তোরাঁয় খাবারের চাঙারি থেকে যা সে খেয়েছে তার কিছুর সম্বন্ধে তার শরীরের খুব আপত্তি দেখা দিয়েছে। একবার লোবস্টার ডিনার খেয়ে এরকম হয়েছিল তার। আর এই শরীরের আপত্তির তীব্র অনুভবটা এই নিয়ে দু বার হল। প্রথম যখন সৌম্য তার সেই সেকেলে গল্পটা বলেছিল। সে গল্পটা এখনও যেন সে শুনতে পাচ্ছে। যেন সৌম্য নাবালক-বিবাহের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দিচ্ছে, এমন শুরু ছিল গল্পের। আর অধ্যাপক-উচিত ভঙ্গিও ছিল, ওটা বোধহয় অভ্যাসের ফল। ধনুকের কাণ্ড ক্রমশ এগিয়ে এসে ছিলার সঙ্গে মেলে, তারপর আবার বেশ খানিকটা বাঁকা হয়ে ছিলার থেকে দূরে সরে যায় কাণ্ডের প্রান্তভাগ দুটো। মনে করা যাক কাণ্ডের এই বাঁকা প্রান্তিক ভাঁজ দুটোকে কটি বলা হবে। আর বিবাহ, উদ্বাহ, যাই বল তার মধ্যে বহন করার ক্রিয়াটা থেকে যাচ্ছে। এ দুটো মনে রেখে গল্প শোনে। মাঝখানে দাদামশায় তার দুপাশে চোদ্দ বছরের বউ আর ষোল বছরের বর। দাদামশায়ের নাক ডাকছে। তখন বর-বধূর ইচ্ছা হল গল্প করবে। খুবই স্বাভাবিক। দিনমানের গল্প, আর রাত্রির গল্প এক নয়। কি করা যায়? দাদামশায়কে ডিঙোনো যায় না। অনেক ভেবে শুয়ে থেকেই ছেলেটি নিজের ধনুকের কাণ্ডটি দাদুকে ডিঙিয়ে এগিয়ে দিল বউ-এর দিকে। শেয়ানা বউ। সেও কটির ভাঁজে শরীরটাকে রাখল। তারপর ধীরে ধীরে ধনুকের কাণ্ডটা উঁচু হতে শুরু করল বউ সমেত। কি অসম্ভব শক্তি বুঝবে যদি শুয়ে থেকে হাত লম্বা করে একখানা মোটা গোছের বই তোলার চেষ্টা কর। প্রায় পার করে এনেছে দাদামশায়কে, কিন্তু কাণ্ডটি আর সইতে পারল না। ভেঙে গেল, বউ দাদামশায়ের গায়ের উপরে পড়ল। ঘুমন্ত দাদামশায় আঁচ করছিলেন, অথবা এরকম ঘটনা তিনিও নিজের প্রথম বয়সে ঘটিয়েছেন। বললেন, শুধু—থোরা কুছ দেড় বা।

আর শমিতা এই গল্পের টানে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল, সুন্দর গল্প, কিন্তু ছেলেটার কি দোষ। কাণ্ডটাই তো ভাঙল।

দাদামশায় বলতে চেয়েছিলেন তোমার ধনুকের কাণ্ডটা যদি বউ-এর ভারে ভেঙে পড়ে বুঝতে হবে বিবাহের উপযুক্ত হতে যে ধনুক দরকার তোমার সে ধনুক

ব্যবহার করতে থোরা কুছ দেশ্ব বা।

কিন্তু হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল সৌম্যর মুখ। আর তখনই তার গল্পের উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছিল।

জানালা থেকে সরে এল শমিতা। মনে মনে বলল, এটা একটা রগরগে কথা, একটা রংদার গল্প। তুমি কি ভাববে সৌম্য তুমি সেই ভগ্নমনোরথ কিশোর? আর এটা খাবারের দোষ নয়। ঠোঁট দুটো কাঁপল শমিতার, সে প্রশ্বাসটাকে চেপে ধরল নিঃশ্বাসের সমতা আনতে। তারা আমাকে অপমান করেছিল। বার বার। থেঁৎলে থেঁৎলে দেয়ার মতো তাদের কথা, নাচের ভঙ্গি, শিস দেয়া আর ছড়াগান আমাকে বার বার অপমান করেছিল তোমার চোখের সামনে। তুমি বলেছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন ব্যবহারই করতে হয়। তারা জোড়া সাপ খেলানোর মতো হাত দুটোকে হাওয়ায় নাচিয়ে নাচিয়ে, ঠোঁটের কোণে সিগারেটসমেত মাথা দুলিয়ে, ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট আর নাগরাসমেত পা নানা কোণে কোণে ফেলে তারা নেচেছিল। তুমি অপমান বোধ করে বলেছিলে কিছু, উঠে দাঁড়িয়েছিলে প্রতিবাদ করে। তখন দোকানদারই এসে বলেছিল—এদের সঙ্গে পারবেন না কেউ পারে না চলে যান। সেই হাঁসের হ্রদের ধারে, সেই ছাতিম গাছের তলায়, সেই শাদা চায়ের দোকানেই।

ঠোঁট কেঁপে উঠল শমিতার থর থর করে। তার মুখের সেই অদৃশ্য মোলায়েম কচি কচি পেশীগুলো কুঁচকে কুঁচকে গেল। এভাবেই চোখে জল নামে সাধারণত। কান দুটো পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। আবার সেই কথাই মনে হল: কান্না বরং ক্লেদাক্ত করবে। কিম্বা কান্নাই যদি তা সব সমুদ্রের চাইতে গভীর এক কান্না হতে পারে। কিন্তু তেমন কান্না হয় না, হয় না বোধহয়।

কিন্তু সৌম্য উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আর শমিতা তখন ভাবল, বল তোমার ওই ধনুক-ভাঙার গল্পটা কি এ-ব্যাপারে অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তা কি গল্প মাত্র থাকে? তার চাইতে সৌম্য আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো। কিম্বা দেউগিরিতে আর নয়। চল ফিরে যাই, চল। কিছু না বলে ফিরে যাই চল।

সৌম্য শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। বুককেসটার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। না, এখন আর সে সিগারেট খাচ্ছে না। বরং পিয়ানোতে আঙুল চলার মতো সাজানো বই কয়েকটির পিঠের উপর দিয়ে আঙুলগুলো চলে চলে বেড়ালো সৌম্যর। তারপর সে একখানা বই টেনে নিল। না, এখন আর সে সিগারেট খাচ্ছে না। যদিও মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাটা সত্যও হয় অনেক ক্ষেত্রে সিগারেট

সম্বন্ধে। এটা ভালোই হবে যদি বই-এর জগতে সৌম্য কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারে।

সে কি! সৌম্য ডাকছে?

শমিতা প্রায় নাচার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ একে ট্রিপিং বলে। ইংরেজির অধ্যাপিকা শমিতার ইংরেজি শব্দটা মনে এল।

সৌম্য বলল, "দেখ আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটরা—আচ্ছা তাদের সম্বন্ধে তুমি পড়েছ তো মানে ওদের দেশেও। তাদের সম্বন্ধে, মানে ক্ষমা করার কথা বলছি না। তা তুমি তো জান যেশাস কলেজটা স্থাপন করা হয়েছিল একটা নানারি তুলে দিয়ে কারণ অবশ্য আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটদের অত কাছে নানদের থাকাটা কেমন যেন হয়ে উঠেছিল। ওরা একটু কেমন—কিংবা যদি তুমি বল এখন পড়াও যেতে পারে।"

এই বলে সৌম্য হাসল। একটা বই তুলে নিল সেলফ থেকে, দু-একটা পাতা উল্টাল। আবার তেমন করেই রেখে দিল। আর তখন টুপ টুপ করে মিনিটগুলো ঝরে পড়তে লাগল। যেমন চোখের জলই পড়ে। "আচ্ছা, শমি, একটা গল্প বলি এস।" সৌম্য হাসল যেন। "দেখ আমি ঔপন্যাসিক হতে পারি কিনা।" মাসীর চিঠি মামির চিঠি শেষ করে কার্ডভরা খামটা তুলে নিল শমিতা। তার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। সত্যি ভরতচন্দ্র। কার্ডটা একটা খামে মোড়া। খামের বাঁদিকের কোণে লেখা ভরতচন্দ্রর নাম ঠিকানা। ঠিকানায় সগর্ব ঘোষণা চাবাগান অঞ্চলের এক থানার অফিসর-ইন-চার্জ। খাম থেকে কার্ডটা বার করল শমিতা। পুলিশের এস. আই. বোধহয় সাব ইনস্পেক্টর বলে। আরে, আরে অস্ফুটস্বরে শমিতা বলল। দেখ কাণ্ড। কার্ডটায় ভরতচন্দ্রের পাশে তার নব-পরিণীতা। ভরতচন্দ্র পাঞ্জাবি-চাদর পরে সভ্যশান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ভঙ্গিটাব আড়াল থেকে তার সেই আর ভঙ্গি উঁকি দিচ্ছে, ব্যাটরা কিম্বা বেহালা-শ্রীর। কার্ডের পিছন দিকে কয়েক লাইনের চিঠি: শমিতা-দিদি এতদিনে বিয়ে করলুম, আপনার ও সৌম্যবাবুর আশীর্বাদ চাই। শমিতা বলল সৌম্যকে—দেখ দেখ। বিয়ে করেছে। কি উপহার দিই বল তো। সৌম্য বলল, সম্বন্ধটা না জানলে উপহার বাৎলানো যায় কি? এ তো তোমাদের সেই ভরত। খুব পরিবেশন করেছিল, তোমার পিঁড়িও ধরেছিল। উত্তীয়র মতো কেউ নাকি? শমিতা বলল হয়তো: যাও, আমার চাইতে না হোক দু-বছরের ছোট। সৌম্য বলল, উত্তীয় শ্যামার চাইতে কত ছোট ছিল তা রবিঠাকুর রেকর্ড করেন নি।

সৌম্য চশমাটা খুলল, বলল, "গল্পটা শুনছ?"

শমিতা বলল, "বল।"

সৌম্য আবার গল্প শুরু করল : ভরতচন্দ্রর এক ব্যায়ামশিষ্য, নাকি সাগরেদ বলে তাদের ?—আমাকে ঘটনাটার কথা বলেছিল । বাসস্টপে দু-তিনজন বিরক্ত করতে শুরু করেছিল । তখন ভরত স্কুলে আর তার শমিদিদি বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে । একদিন সঙ্গে সঙ্গে চলছিল ভরত ।

হঠাৎ শমিতা বলে ফেলল, "দেখ ছোকরা তিনটে বড় বিরক্ত করছে মেয়েদের ।" আর কথা কি ইয়ং ক্যাভেলিয়ার এগিয়ে গেল । কি মারটাই সে খেল ছোকরা তিনটের হাতে । হৈ-চৈ, সেদিন শমিতাদের কলেজ যাওয়াই বন্ধ ।

শমিতা বলল, "এরকম ঘটেছিল ।"

সৌম্য বলল, হাসিই জড়িয়ে রইল তার মুখে, "ছ-মাস বাদে, পুজোর বন্ধের পরে কলেজ খুলেছে আবার । শমিতারা লক্ষ্য করল পর পর কয়েকদিন ভরত রোজ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে । পাড়ার মেয়েরা শঙ্কিত । রোগটা কি ওকেও ধরল । তার-পর আবার সেই তিন মূর্তির আবির্ভাব । তখন বেশ বোঝা গেল ভরত এদেরই প্রতীক্ষায় ছিল । তার পরের মুহূর্তে হৈ-চৈ, যাকে উইদ গাস্টো বলে, লেফ্‌ট হুক, রাইট হ্যামার । একি সেই ভরত । বাস ছুটে পালাল । শমিতারা বাড়ির দিকে যে যার গলি । বিকেলে ভরতকে দেখা গেল শমিতাদের বাড়ির সামনে পথ চলতে । গলায় গাঁদার মালা ছিল না বটে, চোখ দুটিও নীল বর্ণ—"

হা হা করে জোরে জোরে হেসে উঠল সৌম্য, চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল সে যেন হাসির দমকে । সিগারেট কেসটা খুলল । যেন বিশেষ একটা সিগারেট বেছে নেবে । বলল, "কেমন, বেশ একটা গল্পের প্যারডি নয় !"

কিন্তু, চশমাটা আবার পরল সৌম্য সেজন্যই কি লক্ষ্যে এলো, ভাবল শমিতা—রগের শিরা দুটো যেন ফুলে উঠেছে । যেমন নাকি, গল্পে বলে, উত্তেজনার সময়ে হয় । আর তখনই তার মনেও পড়ল গোড়ার দিকে সৌম্য প্রশ্ন করেছিল, তুমি যে মহাভুজগের মতো ঘনালম্পর্শ বাহুর কথা বলেছিলে সে কি কোনো নাটক থেকে ? মহাভুজগতুল্য বাহু যা বধূকে রক্ষা করে ? তখন এমন দেখিয়েছিল সৌম্যকে ।

শমিতা বলল, বলতে গিয়ে মৃদু শব্দ করে গলাটা সাফ করল, "রান্নার দিকে যাই । তুমি বরং পড় ।"

রান্নাঘরে এল শমিতা । সে নিজের মনকে শাসন করল—এটা সিকিয়াট্রিস্টদের কেস নয় । জানালা দিয়ে সে অবশ্যই দেখবে না চুরি করে এই ঘরের মধ্যে, চা করতে গিয়ে যেমন সে করেছিল । বেরিয়ে যে-কোনো একদিকে সোজা চলা ভালো, বার বার নানা পথে শুরু করে একই জায়গায় আসার চাইতে । একটু দাঁড়াল সে বারান্দায় । তাড়াতাড়ি শেষ করবে সে রান্না । আর তারপরে যদি সম্ভব হয় এটস

নিয়েই না হয় সময় কাটানো যাবে। সৌম্য এটসভক্ত। আর গল্পটা সে ঠিকই বলেছে ভরতের সঙ্গে সেই সূত্রেই পুলিশের পরিচয় আর তারই ফলে সে দারোগা। কিন্তু—

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়াগুলোকে সে দেখল—এও ভালো এমন উদাস ভঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। বারান্দায় সবুজ সেমিজটা মেলা আছে দেখছি। দুপুরের বিউটিস্ন্যাপ—সৌম্যই বলে কথাটা—সে সময়ে গায়ে ছিল তার। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল দুপুরে স্ন্যাপটা টুটতেই কারণ দুপুরে সৌম্য শোবার ঘরে নিজে সোজা হয়ে বসে পড়ে। আর এখন দেখ সেই বিকেলটাও নেই। কিন্তু বার বার একই জায়গায় আসার চাইতে যেদিকে খুশি চলা ভালো।

স্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরল শমিতা। না—এটা সাইকাই আর্টিস্টদের ব্যাপার নয়। দেখ এখনও ওটার উচ্চারণ আমি নিজেই গুলিয়ে ফেলি। ব্যাপারটা গোলমেলে নয়?

বেতের চেয়ারে সৌম্য গভীরে ঢুকে বসেছে। তা কি একটা গুহার মতো হতে পারে? তেমন গভীর?

পায়ে পায়ে চলে শমিতা চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু কি বলবে সে? ঠিক তখনই—অডিকোলনের গন্ধটা তখন নাকে এল তার।

"মাথা ধরেছে?"

শমিতার মনে হল অডিকোলনের অতিক্ষীণ ধারাটাই যেন রগ থেকে নেমে সৌম্যর চশমার তলা দিয়ে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসছে। এই অডিকোলনের ব্যাপারটা সৌম্যর নিজস্ব—অর্থাৎ তার অবিবাহিত জীবনের একটা বিষয় যাতে শমিতার সংযোগ ঘটতে দেয় না অনেক সময়ে। প্রয়োজন হলে নিজেই ব্যবহার করে। কাউকে জানায় না।

সৌম্য এতক্ষণে আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "দেরি হবে? অথবা আজ না হয় ডেম সিটওয়েলকে নিয়েই আলোচনা করা যাবে।"

"আচ্ছা, দেখো—না হয় তাই হোক। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?"

পাহাড়ের দু'টো দেয়ালের মধ্যে এই সরু গলি দিয়ে বনমোরগ তার হারেম নিয়ে কিছুক্ষণ আগে চ'লে গিয়েছে। তাদের পিছনে পিছনে নেমে আসছিলেম। বুটের নিচে স্যাঁতসাঁতে পাতার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আজও দেখলেম পথের বাঁকটায় পা ঝুলিয়ে ব'সে আছে সে। তার পায়ের তলায় হাত ছয়েক নিচু একটা খাদ। সেই খাদে একটা ফুল-সমেত গাছ। অনেক ফুল। গাছটার দিকে চেয়ে সে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমন স্থির।

বললুম, আজও দেখছি!

সে মৃদু হেসে ফুলন্ত গাছটাকে দেখিয়ে দিলো।

বললুম, কাল বললেই পারতে। ওটাকে সাইমিয়া বলে, ক্যাসিয়া সাইমিয়া।

ফুলটা গোলাপী দেখ'ছি। কখনও হলদে ফুল হয় নাকি? গোলাপীর মধ্যে দু'-চারটে হলুদ বা সোনালি?

উচিত নয় হওয়া।

সে তার শাদা কেশর-সমেত কদমফুলের মতো মাথাটা ঝাঁকালো।

বললুম, কেউ যদি গ্র্যাফ্‌টিং করে তবে গোলাপী কুঁড়িতে ভরা ডালগুলোর মধ্যে এমন একটা ডাল দেখা যেতে পারে যেটায় হলদে ফুল ফুটেছে।

সে গ্র্যাফ্‌টিং বিষয়ে জানতে চাইলো, বুঝিয়ে বললুম।

সে বিড়বিড় ক'রে বললো, উত্তুরে কুকুর যখন চিল্লানী শূকরীকে মাতৃত্ব দেবে তখন অমিতাভ আর থাকবে না পৃথিবীতে।

শুনতে না পাওয়ার ভান করাই ভালো। ভাষাটা বিদেশী নয় শুধু, বিদেশের সান্ধ্যভাষা।

বললুম, তোমাকে সংক্ষেপে বলি। আমাদের দেশে স্বেন হেডিন, এমন কি ইয়ং-হাজব্যাণ্ডের মতো ভ্রমণকারী নেই বটে, কিন্তু আধুনিক কালেও দু'একজন ছিলো না এমন নয়। এই সেদিন নিষিদ্ধ দেশ, তিব্বতেও আমাদের শরৎ দাশ গিয়েছিলো। নিরাপদে ফিরেও এসেছিলো। আমরা জানি শরৎ দাশ তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজের বাণিজ্যপথ খুলতে গিয়েছিলো। ইয়ংহাজব্যাণ্ড পরে তাকে অনুসরণ করে। আরও পরে তাদের বাণিজ্যপথ সীমান্ত সংক্রান্ত ঠাণ্ডা যুদ্ধে হারিয়ে যায়। আমরা জানি

শরৎ দাশের নিষিদ্ধ দেশে প্রবেশ এবং সেখানে অবস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অন্তত দু'জন লামার প্রাণদণ্ড হয়েছিলো। এইটুকু ইতিহাস।

সে আবার তার কদমফুলের মতো মাথাটা ঝাঁকালো। আমার কথাটা তার মনে ধরেনি।

বললুম, আর আমি এক পর্যটকের সাক্ষ্য থেকে জানি লাসার কিছুদূরে একটা গুহা আছে। যার সম্বন্ধে সেখানকার লোকের ধারণা অতীশ সেখানেই বাস করতেন নির্বাণ লাভ পর্যন্ত।

সে এবার আমার দিকে দৃষ্টিটা স্থির করলো। দু'এক মিনিটের চাইতেও বেশি। তার চাঁপা রঙের ময়লা আলখেল্লার নানা ভাঁজের একটিতে হাত ঢুকিয়ে মালা বার করলো। তার অর্থ আমার চাইতে আর কে ভালো জানে? মালাটা আঙুলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াবে, আর তারপর সে নামতে আরম্ভ করবে তার আস্তানার দিকে। একে উৎরাই তাতে পাহাড়ে অভ্যস্ত পা; তাকে ছুট দৌড় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তখন তার পিছনে ছোটা যায় বটে, কিন্তু তাকে আলাপচারীর উপযুক্ত ভঙ্গী ব'লে না বোধ হয়। সে উঠে দাঁড়ালো। হাসলো। হাসিটা বর্ণনার উপযুক্ত : চোখের প্রান্ত থেকে প্রান্ত স্নিগ্ধ শান্ত একটা ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলালো—এটাই বিদায়-অভিনন্দন। কখনও সময়কে ব্যর্থ হ'তে দেয় না। চিন্তা করছিলো—যাকে ধ্যানও বলা যেতে পারে উপযুক্ততর শব্দের অভাবে। তারপরে আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। এর পরের কাজ আস্তানায় ফিরে পুঁথি পড়া। পথ চলাটা কাজ নয়, দু'টো কাজের মধ্যে সেতু, সুতরাং তা'কে যত ছোটো করা যায় তা করতে হবে। তাই এমন ক্ষিপ্রগতি।

লোকটি দলের মধ্যেও স্বতন্ত্র। তার হাসি, মাথা দোলানো, পাহাড়ী অঞ্চলের লামাদের হাতে যে ঘূর্ণ্যমান প্রার্থনাযন্ত্র থাকে তার বদলে মালাও কখনও কখনও— যেন হ্রদান্তরের সময়ে এক জাতীয় হাঁসের ঝাঁকে অন্য জাতীয় একটি হাঁস এসে পড়েছে।

তার ইতিহাসজ্ঞান সঠিক। অতীশ দীপঙ্কর বাঙালী, সে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলো তা সে জানে। ইয়ংহাজব্যাণ্ড, হোয়াইটের আগে বাঙালী পর্যটক গিয়েছিলো আধুনিক কালের তিব্বতে তা সে জানে। সে লাসার চীনা আম্বনদের কথা জানে। দলাই লামাদের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়—এক সময়ে দলাই লামা থাকবে না এ প্রবাদ যে একশ বছর আগেই প্রচারিত ছিলো, চীনা আম্বনরা যে দলাই লামা বাছাইয়ের ব্যাপারে ভেজাল চালাতে চাইতো, চীনা-তিব্বতে মামা-ভাগনে সম্বন্ধ, কখনও যাজক যজমানের, এমন সব মত্ত সে সমর্থন করে। সে বলেছে কিছুদিন

আগে যখন তিব্বতীরা চীনাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য আধুনিক রাইফেল চেয়েছিলো ইংরেজরা তখন টালবাহানা করেছে, কার্পণ্য করেছে। নতুবা সেবারেই চীনকে নির্লোভ ক'রে দেয়া যেতো। তা হ'লেও দলাই লামাকে ইংরেজরা দার্জিলিং শহরে আশ্রয় দিয়েছিলো এজন্য তিব্বতীরা কৃতজ্ঞ ছিলো। এ সবই ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কিন্তু লোকনাথ? অবশ্য তার মুখে শোনা নামটির আক্ষরিক অনুবাদ ক'রে যা পাওয়া যায় তাতে লোকনাথ, লোকপাল, নরনাথ ও নরপাল এই চারটি নামই তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু এরকম কোনো লোক কি তাদের দেশে গিয়েছিলো বজ্রযোগিনী থেকে? যায়নি তা বলা যায় কি ক'রে? একই সঙ্গে স্কাউণ্ড্রেল এবং মহাপুরুষ এমন লোক সব দেশেই জন্মায়। বাংলাদেশে জন্মাতো না তা বলা যায় না। শরৎ দাশের আগে কিম্বা পরে আর কাউকে বাংলাদেশের ইংরেজ গভর্ণর পাঠায়নি বাণিজ্যপথ খুলতে, যার অন্য নাম গোয়েন্দাগিরি হ'তে পারে এ কে হলপ ক'রে বলবে? হয়তো তার উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করেনি কিম্বা খুব বেশি করেছিলো ব'লে ফাইলের তলে চাপা প'ড়ে তার নাম চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে: হয়তো বা তার জন্যও দু'একজন লামাকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। ধর্ম না-মেনেও তা নিয়ে বিশদ আলোচনা, কমিসরিয়েটের দক্ষ এবং দুঃসাহসী চাকরি, নিছক গোয়েন্দাগিরি এগুলো অন্তত বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ছিলো না তা সে বজ্রযোগিনী কিম্বা বাঁকুড়ার হোক।

লোকনাথ অবশ্যই একটা তিব্বতী খচ্চর যোগাড় করেছিলো। সে তার নাম রেখেছিলো দধিকর্ণ। খচ্চরটার কান দু'টো শাদা ছিলো কিন্তু সেজন্যই নামটা নয়। বিড়াল যেমন গাছে ওঠে খচ্চরটাও তেমন পাহাড়ে উঠতে পারতো। এই নামকরণ থেকে লোকনাথের মনের আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে? প্রবাদ এই দধিকর্ণ একবার একটা ব্রিজের পচা কাঠের মেঝে ভেঙে আট-ন' ফিট নিচে প'ড়ে যায়। লোকনাথ বলেছিলো: এই অবস্থায় যখন দধিকর্ণকে পাথর কাদা আবর্জনা থেকে উদ্ধার করা হ'লো তখন তিনবার পিছনের পা ঝেড়ে, একবার সামনের পা ঝেড়ে নাকি পাহাড়ের উৎরাই উঠতে সুরু করেছিলো আবার। লোকনাথের সঙ্গে থাবা-থাবা কুইনাইন, কয়েক বোতল হুইস্কি, এবং দু'দুটো গুলি-গাদা আর্মি পিস্তল ছিলো। মাথায় কান-ঢাকা টুপি, গায়ে হলুদ রঙের আলখেল্লা। লোকনাথের গায়ের রং পীতাভ ছিলো। এক রকম লোমনাশক চূর্ণ ব্যবহার ক'রে দাড়িগোঁফ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলো সে। প্রায় এক বছর তার মিশনসংক্রান্ত কাজকর্ম ক'রে লোকনাথ ফিরে এসেছিলো। সীমান্তের পাহাড়ে যখন সে পৌঁছেছে তখন তার কানে সংবাদ এলো

তাকে যে লামারা আশ্রয় দিয়েছিলো তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তখন সে সেই লামাদের দেশের দিকে ফিরে আঙুল মটকে আঙুল ঝেড়ে ফেলেছিলো। তারপর কি ভেবে তার একটা সার্ভিস পিস্তলের চোং খালি ক'রে দিয়েছিলো আকাশমুখো। এটা কি অভিশাপ অথবা নাটকীয় কায়দায় মরুকগে যাক বলা?

যে লামারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো তাদের একজন একটু বিশিষ্ট ছিলো। সে ভারতীয় ভাষা পালি সংস্কৃত কিছু-কিছু শিখেছিলো। বিদেশী ভাষা জানার একটা অসুবিধা এই বিদেশী পেলে তার সঙ্গে তার ভাষার কথা বলতে মুখ সুর্-সুর্ করে। আর লোকনাথ টুলো পণ্ডিত না হ'লেও দু-এক পদ পালি বা সংস্কৃত এমন কি না জানতো?

কিন্তু এসব আলোচনা হয়েছিলো গল্পটা শুনবার পরে। গল্পটাই আগে। তারও আগে যদি কিছু থাকে তবে সেটা বটানি-চর্চা।

গুঁড়িটা দুধের মতো শাদা হ'য়ে ওঠে আর তখন থলো থলো গোলাপী ফুলে গুঁড়ি, ডালপালা সব ঢেকে যায় এ-রকম গাছ দেখেছো!

বলতে যাচ্ছিলুম, ইউক্যালিপটাস খোসা ছাড়লে তেমন হয় বটে, কিন্তু ইউ-ক্যালিপটাসে আমি তেমন ফুল দেখিনি।

সে আজ খাদের গাছটাকে দেখিয়ে দিলো যদিও স্যাতস্যাতে জায়গায় ব'লে এর গুঁড়ি ডালপালা সবই বেশ কালচে রঙের।

ক্যাসিয়া সাইমিয়া এর নাম।

এর পরেই গল্প; ইতিহাস এবং লোকনাথকে নিয়ে আলোচনা অনেক পরে।

পেমার বাড়িটা দেখলে পরিত্যক্ত অথবা ভুলে যাওয়া গ্রাম্য সরাইখানার কথা মনে হবে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার প্রধান সড়ক থেকে এবং পাহাড়ের গায়ের অন্য বাড়িগুলো থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, বরং পাহাড়ের একটা ভাঁজে, নিজের এক টুকরো উপত্যকায় একা, কিন্তু তা হ'লেও হঠাৎ দেখলে সরাইখানা ব'লে মনে হয়। সরুসরু ধুলো-ঢাকা পায়ে-চলা দু'টো রাস্তা তার বাড়ির কাছে এসে মিশেছে। সেটাও একটা কারণ বটে, কিন্তু আসলে বাড়িটার নিঃসঙ্গতাই সরাইখানার স্মৃতি মনে এনে দেয়। যে-কেউ এখানে গোপন আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবতে পারে। অন্যদিকে লজিষ্টিকের বিচারে এটা একটা ছোটো ট্রান্সমিটারের গোপন আড্ডাও হ'তে পারে। কিন্তু এসব গল্পটার শেষটা জানি ব'লেই বলতে পারছি। এখন সে কথা থাক।

সামনে, যাকে স্কাইলাইন বলে, সেখানে একটা পাহাড়ের কাঁধ। ঠিক এখানেই কালো পাটকিলে পাহাড়টার গায়ে বেশ খানিকটা জায়গা শাদা, না জানা থাকলে ধস নামার চিহ্ন ব'লে মনে হবে।

পেমার বাড়ি থেকে অন্ত রকম দেখতে পাওয়া যায়। কিম্বা দেখতে পাওয়া যায় কথাটা ঠিক হ'লো না। পেমা জানে বলেই বলতে পারে তার বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দা থেকে সোজা পথে দু' ফার্লং আর ঘোরা উৎরাই-এর পথে হেঁটে দু' মাইল গেলে ওখানে একটা কোয়ার্টজ জাতীয় পাহাড়ের গুহা আছে। সোজা কথায় বলতে হবে ধূমল রঙের একটা চমরী বাছুরের শাদা কপাল, পাঁশুটে-শাদা জিভ ; জিভের সরু হ'য়ে আসা ডগাটা নিচের পথটার ধারে নেমে এসেছে। শহর থেকে পনরো-ষোল মাইল দূরের এই নির্জন পাহাড়টাকে বাচ্চা-চমরী বলা হ'য়ে থাকে।

কিন্তু তুলনার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি বিন্দুতে মিলতে হবে। গুহাটার মুখের কাছে যে কাঠগোলাপের ঝোপ আছে তাকে না হয় বাচ্চা-চমরীর কপালের পশম বলা গেলো, কিন্তু যাকে জিভ বলা হয় তার উপরে একটা গাছ আছে। তাকে কি চমরীর জিভে জড়ানো একটা পল্লব বলবে ?

পেমার কাছে এটা আশ্চর্য লাগে শক্ত শাদা পাথরে কি ক'রে এই গাছটা বেঁচে চলেছে। পুরনো কথাটা মানতে হ'লে তা প্রায় ষাট-সত্তর বছর বয়স হ'লো গাছটার। নিজে থেকেই হয়েছে। বাড়েনি, বুড়ো হয়নি, মরেও যায়নি। এ জাতীয় গাছ এদিকে দেখাও যায় না। গুঁড়ির একেবারে গোড়ার মাপ দু'হাত হবে। কাণ্ডটা বেলচার হাতলের মতো পশ্চিম থেকে পুবে বেঁকে গিয়েছে। সেখান থেকে ডাল-পালা সুরু। ছবিতে যেমন সাজিয়ে আঁকা হয় তেমন সাজানো ডালপালা। গুঁড়িটা শাদা। বসন্ত আসতে না-আসতেই থলো-থলো গোলাপী ফুলে আপাদ-মস্তক ঢেকে যায় গাছটার। গোড়া থেকে তিন-চার হাত বড়জোর বাকি থাকে। আর থলো-থলো গোলাপী ফুলের মধ্যে কখনও কখনও নাকি দুটো ডালে সোনালি ফুল ফোটে। পেমা দেখেনি, থেনডুপ দেখেছে। অন্তত তাই বলে সে। হলুদ এমন যে তাকে সোনালিই বলতে হয়।

পেমার মাথায় চ্যাটালো খড়ের টুপি। টুপির নিচে থেকে লম্বা পিগ্‌টেল পিঠের উপরে ঝুলছে। তার কাঁধে জলের বাঁক, বাঁকের দু'দিকে দু'টো তামার হাঁড়িতে জল। গায়ে ময়লা, ব্যবহারে জীর্ণ হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা আলখেল্লা, আলখেল্লার নিচে পেশীবহুল, দীর্ঘ তামাটে রঙের পা দেখা যাচ্ছে।

ছ'ফিট উঁচু শক্ত সমর্থ দেহ। দু'মণ বোঝা সে অনায়াসেই বইতে পারে। আর শক্ত সমর্থ হ'য়ে ওঠার কারণও আছে। ভুলে যাওয়া সরাইখানার মতো এই বাড়িতে পঁচিশ বছর ধ'রে একেবারে একা জীবিকা অর্জন করা, এমন কি এই বাড়িটাকে তৈরি করাও বলা যেতে পারে নিজের দু'হাত দিয়ে। বাড়ির পিছন দিকের পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে যব, রসুন, রাইশাকের ক্ষেত তৈরি করা—

এক কথায় পাথরের চাইতেও কঠিন প্রতিকূলতার সঙ্গেও লড়াই ক'রে সে এখন লড়াইবাজ।

পথ এখানে খাড়াই, পাক খেয়ে উঠেছে। কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য পেমা দু'হাতে বাঁকের দু'মাথার দড়ি ধ'রে প্রায় দু'ফুট উঁচু একটা পাথরের উপরে পা রাখলো, অবলীলায় তার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আবার ডান পা রাখলো আর একটি পাথরের মাথায়। যেন ঘরের সিঁড়ি এমন ক'রে পেমা উঠে এলো চড়াই-এর ঘোরা পথকে ফাঁকি দিয়ে।

তার বাড়ির সামনে একটা রোগাটে খচ্চর, আর বাছুর সমেত তিনটি চমরী গাই। গোবরের ডাঁইটার উপরে একটা মাদী শুয়োর। আধপচা গোবরের তীব্র গন্ধটা নাকে এলো পেমার, চমরীর ঘামের গন্ধও। হাত তুলে শুয়োরটাকে ধমকালো পেমা—হুস, হবাই। বুড়ী চমরীটা ডাকলো, হ্ম্।

পেমা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলো। কাঁধ থেকে বাঁকটা নামালো। যত শক্তসমর্থ দেহ হোক, আধ মাইল খাড়াই পথ দু'মণ জল তুলে আনা খুব সহজ কথা নয়। বারান্দার ধারে পাথরের উপর পাথর রেখে দুপুরের ঝড়ো বাতাসকে রুখবার প্যারাপেট। তার উপর বুক রেখে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে লাগলো পেমা। আলখেল্লার ভাঁজ থেকে মোটা কাগজে জড়ানো হাতে পাকানো সিগারেট বার ক'রে ধরালো সে। অসংস্কৃত কড়া তামাকের তীব্র গন্ধ—এত তীব্র যে অভ্যাস সত্ত্বেও পেমাও খক খক ক'রে কেশে উঠলো, থুপ ক'রে কফ ফেললো।

তারপর তার চোখ পড়লো বাচ্চা-চমরীর মাথায়, বাচ্চা-চমরীর জিভে জড়ানো গাছটার উপরে। থেনডুপ বলে, সে নাকি ওই গাছটায় গোলাপী ফুলের মধ্যে এক-বার হলুদ ফুল দেখেছিলো। তা অনেক বছর আগে, ত্রিশ বছর তো হবেই।

তা দেখো, পেমা সিগারেট হাতে নিয়ে স্বগতোক্তি করলো, ও গাছটা সাইমিয়া তা বুঝতে আর বাকি নেই। কংমো বলেছে। এখানে কেন? সখ ক'রে কেউ লাগিয়ে থাকবে। গাছের গুঁড়ি শাদা কেন? গাছটার কাছাকাছি শাদাটে রঙের পাথর, ধুলোও সুতরাং শাদা। হাত দিয়ে ঠুলি বানিয়ে চোখের উপর রেখে পাহাড়টাকে খুঁজলো পেমা। থেনডুপকে দেখতে পাবে ভেবেছিলো সে। জিভের উপরে দাঁড়িয়ে থাকলে চোখে পড়তো। সে হয়তো ওদিকেই গিয়েছে. কোথায় যাবে তা ছাড়া? (হঠাৎ দুঃখের ছায়া পড়লো তার মুখে) থেনডুপ সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই পারে না। কাঁকড়ার মতো চলে সে।

পেমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স'রে এলো, জলের বাঁকটা কাঁধে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। উনুনের উপরে হাঁড়ির ঢাকনাটা নড়ছে, বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো

রসুন আর আধসেদ্ধ মাংসের মিষ্টিগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। উনুনের পাশে চায়ের হাঁড়িটা থেকেও মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠছে। আর একটু ফুটবে মাংস-যবের স্যুপ। ঘরের এক কোণে তরকারি আনাজের খোসা জমানো ছিলো বালতিতে। সেটা হাতে ক'রে বের হ'লো। বাড়ির পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে বাড়ির মেঝের তলায় ঢুকলো। ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ ক'রে একদল জানোয়ার ডেকে উঠলো—সাত-আটটি শুয়োর ধাড়ী-বাচ্চা। বালতিটা উপুড় ক'রে দিলো পেমা। হুস, হবাই।

কর্তব্য শেষ ক'রে পেমা উঠে এলো, কিন্তু একটার পর আর একটা কাজ। যে জলটা সে ঘরের কাজে ব্যবহার করে সেটা রসুন ক্ষেত থেকে সরিয়ে রাইশাকের ক্ষেতের দিকে চালিয়ে দিতে হবে। তার মানে ছোটো একটা বাঁধ বেঁধে নতুন ক'রে নালি কাটা। ছোটো হাতলের কোদাল হাতে নেমে গেলো সে ক্ষেতে। রসুন এবার ভালো হয়েছে তার ; টোপা-টোপা, রসালো। ভাবতে জিভে জল আসে। যবের রুটি, নুন, আর পর-পর তিন বাটি চা, তাতেই দু'মণ জল আধ মাইল তুলে আনা যায়। নতুন আলুর ক্ষেতটা চোখে পড়লো। কোদাল চালাতে চালাতে পেমা ভাবলো আলুগুলো যদি রসুনের মতো হয়! দু'কাঠা পরিমাণ জমি। পাহাড় থেকে দখলে আনতে ছ'মাসের পরিশ্রম গিয়েছে। তিন মাসের সবটুকু চমরীর গোবর মিশিয়েছে সে ক্ষেতটুকুতে। এখানে যে আলু হবে সেটাও সাধারণ নয়। শাও চি বলেছে গ্র্যাফ্‌টিং ক'রে মিশ্র জাত তৈরি হয়েছে।

এই কথাটাই যেন তাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। নিবে আসা সিগারেটে জোরে একটা টান দিলো সে। তীব্র কাঁচা তামাকপাতা পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে ধোঁয়াটা মুখ থেকে বার হ'তে হ'তেই হাসি দেখা দিলো সেখানে। এখান থেকে গাছটাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তবে যে দিকে মুখ ক'রে সে দাঁড়িয়েছে সেদিকেই গাছটা থাকার কথা।

সাইমিয়া গাছটায় গোলাপী ফুলের মধ্যে কদাচিৎ যদি সোনালি ফুল দেখা যায় তবে তার কারণ গ্র্যাফ্‌টিং। গাছটা যে লাগিয়েছিলো সে গ্র্যাফ্‌টিং জানতো। আর এ বিষয়ে সে থেনডুপকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে। তার শুয়োরের পালে দুটোর রং একেবারে শাদা, অন্যগুলো বাদামী। তার কারণ কংমোর বুড়ো শাদা শুয়োরটা। শাও চি এসব বিষয় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। কে আবার শাও চি? কংমোর ছেলে, যে তাকে হান্‌ভাষার পুঁথিগুলো পড়তে দেয়। শাও চি হাসতে হাসতে বলেছিলো, আমাকেই দেখো, আমি কি একেবারেই হান্? তা নয়, তবু তাদের মতো। তা হানুরা আমাদের চাইতে ধূর্ত বটে।

নালার কাজ শেষ ক'রে পেমা ঘরে উঠে এলো। কপাল থেকে আঙুল দিয়ে

ঘাম মুছে ফেললো। আজ সে স্নান করবে। কালকের বাসি জলটাকে সে কাজে লাগাতে পারবে, নালাটা তৈরি হ'য়ে গেছে। স্নান মানে ক্ষেতে জল দেয়ার আর এক নাম।

অবশ্য, আবার স্বগতোক্তি করলো পেমা, একথা কেউ অস্বীকার করছে না যে বজ্রযোগিনী থেকে কেউ এসেছিলো। তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো থেনডুপের ঠাকুরদা। সেজন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। তখন দেশে বিদেশীকে আসতে দেয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মনে করা হ'তো। পঁচাত্তর বছর আগে চমরীর জিভের উপরেই মোঙ্গল-ঘাতক থেনডুপের ঠাকুরদা গিয়াৎসোর মাথা কেটে ফেলেছিলো, হয়তো সাইমিয়া গাছটা যেখানে উঠেছে সেখানেই। এ গল্পটা এ অঞ্চলে সকলেই জানে। আর গিয়াৎসোর নাম খানিকটা ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে এ অঞ্চলের লোকে, এমন কি বুড়ো কংমোও। কিন্তু তাই ব'লে কি গিয়াৎসোর আত্মা ক্রমশ উর্ধ্বে উঠছে আর গোলাপী ফুলের সংখ্যা বাড়ছে? গোলাপী ফুল যদি লামার রক্ত হ'তো তা হ'লেও অর্থ থাকে, কিন্তু আত্মা?

শরীরটাই আসল। হাঁড়িটা উনুন থেকে নামালো পেমা। এ পৃথিবীর সব কিছুই শরীর। যা শরীরে ধরা পড়েনি, তা নেই। চায়ের হাঁড়িটা উনুনে বসালো সে। তার চমরী গাই, তার শুয়োর, তার কোদাল, জাঁতা, জলের হাঁড়ি, পাথর, পাহাড়, রাই-শাক, কার না শরীর আছে? এমন কি গিয়াৎসোরও শরীর ছিলো। নতুবা ঘাতক কি নষ্ট করতে পেরেছিলো?

পিছন দিকে বারান্দায় বড়ো একটা জলের হাঁড়ি বসানো। এখানে পেমা স্নান ক'রে থাকে আর এই নির্জন সরাইখানায় তাতে তার অসুবিধাও নেই। গায়ের আলখেল্লাটা থেকে সে কৌশলে দুটো হাত দুটো কাঁধ বার করলো। খ্যাস খ্যাস ক'রে খানিকটা গা চুলকে নিলো। তারপর জল ঢালতে লাগলো এ হাত, ও হাত, এ কাঁধ, ও কাঁধ। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা জল। গা থেকে ধোঁয়া উঠছে মনে হ'লো। সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো পেমা, বেণীর চুলগুলো আলগা ক'রে দিলো মাথার পিছনে হাত দিয়ে। আর তখন দেখা গেলো শক্তির আশ্রয় দুটো বাহুর মূলে, চওড়া কাঁধের নিচে সোনার কলসের মতো স্তন দু'টি এখনও পরিপুষ্ট। গোড়া থেকে জানা সত্বেও এখনই যেন প্রমাণ হ'লো পেমা স্ত্রীলোক। আর সোনার কলস বলার সার্থকতা আছে। কব্জি থেকে আঙুলের ডগা, হাঁটু থেকে পায়ের পাতা দেখে আন্দাজ করা যায় নি যে এমন সোনালী রঙের ত্বক। আলখেল্লাটা কোমর থেকে নামিয়ে পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পেমা। কুমারীর মতো মসৃণ উদর তার। ঝুপ-ঝুপ ক'রে জল ঢালতে ঢালতে সে দেখতে পেলো কাঠের

মেঝের ফাঁক দিয়ে জলের ধারা নিচের ডোবায় জমে নালা বেয়ে ক্রমশ রাইক্ষেতের দিকে ব'য়ে যাচ্ছে।

স্নান শেষ ক'রে সে শোবার ঘরে চ'লে এলো। ঘরের কোণে একটা আঁকড়া থেকে জামা পেটিকোট নামিয়ে নিয়ে পরলো। সে এবার চা খাবে। এখন দিনে পাঁচ-সাত বার চা খাওয়া আর বিলাসিতা নয় তার কাছে। অবশ্য শহরের ধনী লামাদের মতো বিশ বার চা খেতে চায় না সে। অতগুলো চমরী যার তার যখন-তখন চা খেতে আটকায় কিসে? তাছাড়া তার এই শোবার ঘরটাই দেখো। দেখলে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কথাই মনে হবে। ছ'পায়া চৌকির উপরে কম্বলের বিছানা, পায়ের কাছে গায়ে দেবার কম্বল ভাঁজ করা। সেখানা শাদা আর ভেড়ার লোমের। ওদিকের ব্র্যাকেটে আর-এক প্রস্থ জামা পেটিকোট, অবশ্য তা দামী না হতে পারে। ব্র্যাকেটের পাশে কুলুঙ্গি, তাতে দু-একখানা ছাপানো চটি বই। বই-গুলোর পাশে একটা চীনা টেবল-ল্যাম্প। এদিকে একটা কাঠের তোরঙ্গ, তোরঙ্গের উপরে প্রার্থনা-যন্ত্র। এটা থেনডুপের মায়ের কাছে পাওয়া। এদিকেও একটা কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গিতে একটা মাঝারি বড় কাচের বোতল। কুলুঙ্গির উপরে দেয়ালের গায়ে মরচে-ধরা একটা সার্ভিস পিস্তল কোমরবন্ধ সমেত।

সতেরো বছর বয়স তখন পেমার—থেনডুপকে লামারা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো। সতেরো থেকে বেয়াল্লিশ এই পঁচিশ বছর পেমা নিজের শরীরের পরিশ্রমে এই সম্পন্ন গৃহস্থের ভাবটা তৈরি করেছে। বাড়িতে খাবার লোক একা সে. অবশ্য, এ জন্যেই পরিশ্রমের ফলে সঞ্চয় হয়েছে।

পেমার মুখে হাসি দেখা দিলো। সতেরো বছরে কি হাল্কা-পল্কা চেহারা ছিলো তার। কি ভয়ই পেতো সে। থেনডুপকে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই থেনডুপের মা মারা গেলো। এখন যেটা রসুনের ক্ষেত সেখানেই একা-একা গর্ত খুঁড়ে শাশুড়ির দেহটাকে বসিয়ে মাটি চাপা দিয়েছিলো পেমা। থেনডুপের দাদা দোর্জেলামা খবর পেয়ে তিনমাস পরে এসেছিলো, মন্ত্র পড়েছিলো। তার সঙ্গের একজন লোক বলেছিলো কাজটা ভালো করেনি পেমা, ওতে আত্মার রাগ হয়। কিন্তু কি উপায় ছিলো? তখন লামাদের ভয়ে অপরাধী থেনডুপের পরিবারকে এমন কি কংমোরাও সাহায্য করেনি। শাশুড়ি কি রাগ করেছে? রসুনের ক্ষেত তার ভালোই হয়েছে, বরং একদিন সে স্বপ্ন দেখেছিলো শাশুড়ি হাসছে। সে যে থেনডুপের ত্রিশ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে, তার ঘরবাড়ি সংস্কার করাচ্ছে, এসব দেখেই শাশুড়ি যেন সুখী হয়েছে। ছেলের ভালো দেখলে সব মা-ই খুশি হয়—তা সে রসুনের জমির তলা থেকে হ'লেও।

চা করতে রান্নাঘরে ঢুকলো পেমা। কিন্তু এখনও থেনডুপের কোনো চিহ্নই নেই। সে কি থেনডুপের উপরে বিরক্ত হবে? পঁচিশ বছর জেল খেটে ছ'মাস হ'লো থেনডুপ ফিরেছে। বিরক্ত হওয়ার অনেক কারণ ঘটেছে ইতিমধ্যে; কিন্তু পেমা বিরক্ত হয়নি, কিছুতেই সে বিরক্ত হবে না। থেনডুপ বোধ হয় আজ নিচের সড়কের দিকেই গিয়েছে। এই কথাটাকে নিজের মনের মধ্যে একবার ঘুরিয়ে নিলো পেমা। কাজটা ভালো হয়নি। না ঠিক ভয় নয় - তা হ'লেও অস্বস্তি তো বটেই। নিচের পুব-পশ্চিম সড়ক দিয়ে আজ এমন দু-একখানা গাড়ি যেতে দেখেছে পেমা যা এর আগে কোনোদিন সে দেখে নি। থেনডুপ যদি সেখানে গিয়ে থাকে তবে এই আধ মাইল উঠে আসতে এক ঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণে অনেকবার চা জুড়িয়ে যাবে।

নিজের জন্য চা ঢেলে নিয়ে তাতে এক থাবা মাখন ভাসিয়ে পেমা চায়ের পাত্র হাতে ক'রে বাইরের দিকে সিঁড়ির উপরে গিয়ে বসলো। আগের চিন্তায় ফিরে এলো পেমা: শুধু ভয় নয়, তখন সেই সতরো বছর বয়সে সে বোকাও ছিলো। বোকা মানুষ যদি একা থাকে তবে ভুলও করে। পেমার মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা গেলো। এখন সে জানে ওটা ইংরেজি মদের বোতল। কয়েক বছর আগে মাখন-উৎসবে সে শহরে গিয়েছিলো, উদ্দেশ্য ছিলো থেনডুপকে গোপনে সংবাদ দেয়া যে সে এখনও বাড়িঘর ধ'রে ব'সে আছে, আর চেষ্টা ক'রে দেখা কোনো ফিকিরে তাকে বার ক'রে আনা যায় কিনা। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানে একটা বোতল দেখে পেমা চমকে উঠেছিলো। পাশের লোকটি, অনেকক্ষণ থেকেই পেমার সঙ্গে না-ডাকা সত্ত্বেও ঘুর-ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছিলো, বলেছিলো, ওটা ইংরেজি মদ, ভিস্কি নাম। তার শোবার ঘরে কুলুঙ্গিতে যে বোতলটা আছে সেটা পঁচাত্তর বছরের পুরনো বটে, কিন্তু ছবি পর্যন্ত এক। ওটাও ভিস্কির বোতলই। বোধগয়ার জল নয়। ওর দু-এক ফোঁটা খেলে সব রোগ সারে না, ঢক্-ঢক্ ক'রে অনেকটা খেলেও কোনো মেয়ে অন্তঃস্বত্বা হয় না। অথচ সে দু'বার ভুল করেছিলো। বোতল খুলতেই তার এক ঘণ্টা লেগেছিলো, দস্তার ঝালাইয়ের নিচে চাঁচের ঢাকনা, তার নিচে মোম কাগজ, তার নিচে কর্ক। কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিয়েছিলো সে মুমূর্ষু শাশুড়ির মুখে। পরম শান্তিতে তাঁর চোখ দু'টো বুজে এসেছিলো, মুখে হাসি ফুটেছিলো, কিন্তু তাতে রোগের আরোগ্য হয়নি। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার ভুল করেছিলো পেমা। অসম্ভব রকমে একা, অপরিসীম নিঃসঙ্গ বোধ হ'তো তার। শাশুড়ির মৃত্যুর পর বোতলটা তেমন ক'রে আর মুখ বন্ধ করা হয়নি যেমন থেনডুপের ঠাকুমা করিয়েছিলো গিয়াৎসোর মৃত্যুর পরে। এক রাত্রিতে বোতল থেকে তার

অর্ধেকটা ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলেছিলো পেমা। কয়েকদিন অসুস্থ ছিলো সে, আর কিছু হয়নি। বরং মাখন-উৎসবে যে পুরুষটা ঘুর ঘুর করছিলো পেমার পাশে পাশে, প্রশ্রয় দিলে সে যা ঘটাতে পারতো ভিস্কির বোতলটা তা পারে নি, কিন্তু সে-রকম অধিকার একমাত্র থেনডুপের, একমাত্র তারই।

এ থেকে প্রমাণ হয় না শরীরই সব ? শরীর থেকেই শরীর জন্মায়। এই ইংরেজি মদের বোতলটা আর তার উপরে সেই মরচে-ধরা আর্মি পিস্তলটা প্রমাণ করে লোকনাথ, কিম্বা তা'কে যাই বলো, সে এসেছিলো। আর তা'কে আশ্রয় দিতে গিয়েই গিয়াৎসোর ছোটোভাই রিম্পোচে লামাকে শহরে আর গিয়াৎসোকে এখানে সামনের ওই চমরীর জিভে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো।

স্নানের কবোষ্ণ আরাম। তারপর এই উত্তপ্ত চায়ের পাত্র—এটা একটা আরামদায়ক বিশ্রাম হ'তে পারে। সে এখন শান্ত হ'য়ে কিছু ভাবতেও পারে। একা থাকলে কেউ-কেউ নিবিষ্ট হ'য়ে চিন্তা করতে শেখে। পেমার এ বিষয়ে একটু সুবিধা ছিলো। সে থেনডুপ এবং শাশুড়ির কাছে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকার ভঙ্গিটা আয়ত্ত করেছিলো। একে অন্য কথায় ধ্যান বলা যেতে পারে। সে এ-রকম সময়ে অনেকটা সাজানো-গোছানো ভাবে চিন্তা করতে পারে। এটাই কি অতীতের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র ?

অথচ লোকনাথ, কিম্বা যাই বলো, এসেছিলো। পেমা যেন তাদের সেই পঁচাত্তর বছরের পুরনো মিছিলটাকেও চোখে দেখতে পেলো। দুপুরে দু'টোয় দুর্ধর্ষ ঝড় উঠেছে। পাথরের কুচি উড়ছে ছিটেগুলির মতো। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় একশ' মাইল। আপাদমস্তক ঢাকা, এমন কি মুখেও মুখোস। তা সত্ত্বেও দাঁড়ানো যায় না, এগোয় কার সাধ্য। এর চাইতে প্রাণঘাতী তুষার-ঝড়ও ভালো।

গিয়াৎসোর ভাই রিম্পোচে লামা বললো, সন্ধ্যার আগেই লা'তে পৌঁছনো দরকার, অথচ একপাও এগোন যাচ্ছে না।

গিয়াৎসো বললো, প্রবাদ যদি সত্যি হয়, তবে তার এই প্রমাণ হবে যে ঝড়ের মধ্যে এগিয়ে গেলে তবে আমরা তার দেখা পাবো।

গিয়াৎসো তার রেশমের ঝড়-মুখোসের আড়ালে হাসলো কিনা বোঝা গেলো না।

খচ্চরের পিঠে লাফিয়ে উঠলো রিম্পোচে। গিয়াৎসো তার পিছনে রওনা হ'লো। কিছুদূরে তাদের অনুচরেরা। ন্যাড়া উপত্যকাটা পার হ'লো তারা কিছু-ক্ষণের মধ্যেই। পাহাড়ের আড়াল পেলো। ঝড়ের শব্দটা কানে আসছে, কিন্তু ঝড়টা গায়ে লাগছে না আর।

গিয়াৎসো বললো, নামগিয়াল, অমিতাভ আর একবারই পুনর্জন্ম নেবে এ প্রবাদ সম্বন্ধে তুমি কি পড়েছো ?

প্রবাদটা প্রাচীন, তবে পনরো পুনর্জন্মের জায়গায় সতরো হ'বে না, তা বলা যায় না।

গিয়াৎসো বললো, আমাদের দেশে বিদেশী ঢুকলেই কি পুনর্জন্ম হওয়াও শেষ হবে ?

রিম্পোচে বললো, না, ওটা ভয় দেখানোর জন্য বলা। চীনা আম্বনরা চায় না, নেপালিরাও চায় না তারা ছাড়া আর কোনো বিদেশী ঢোকে আমাদের দেশে।

কিন্তু কবে পুনর্জন্ম শেষ তার তো একটা প্রবাদ আছে।

সে এরকম নয়। উত্তুরে কুকুর যখন চিল্লানি শূকরীকে সন্তান দেবে, তখন। গিয়াৎসো মাথা দোলালো। সেও শুনেছে, সেও জানে। তখনই, উত্তুরে হিংস্র কুকুরের পাল যখন আসবে তখনই এদেশ আর স্বপ্নের দেশ থাকবে না। কিন্তু সময় হয়ে যাচ্ছে। রিম্পোচে পিছনে ফিরে অনুচরদের হাতের ইশারায় তাড়াতাড়ি এগোতে ব'লে নিজের খচ্চরটার পেটে পায়ের গুঁতো দিয়ে সেটাকে জোরে ছুটিয়ে দিলো।

গিয়াৎসোও তাই করলো। রিম্পোচের কাছে পৌঁছে আবার সে বললো, আচ্ছা খবরটা ঠিক তো ?

ঠিক, ঠিক, একশ' বার ঠিক। আমাদের অন্তত সাত-আট জন চর খবর এনেছে। সে দক্ষিণ থেকে আসছে সিগাৎসের পথ ধ'রে। শহরে জানে না এমন কেউ নেই, আর তুমি কিনা সন্দেহ করছো। সৈন্যদলকে হুকুম দেয়া হয়েছে দেখলেই সাবাড় করতে কিম্বা ধরা দিলে কয়েদ করতে।

শেষ পর্যন্ত যদি না আসে ? গিয়াৎসোর মুখ হতাশায় বিবর্ণ দেখালো।

ভয় পাবে ? সে জানে চররা খবর পেয়েছে। ভয় পাবে না এটাই একটা প্রমাণ যে সে অতীশের লোক।

লা'র মুখে দাঁড়িয়েছে দুটি খচ্চর, তাদের পিঠে গিয়াৎসো আর রিম্পোচে। কিছুদূরে তাদের ছ'জন সশস্ত্র অনুচর। পথে গুপ্তচরের ভয়, সৈন্যদলের ভয়। ডাকাতের ভয়।

গিয়াৎসো বললো, এই শেষবার, রিম্পোচে। আচ্ছা বলো আমরা কি সেই আদিকাল থেকে অতীশের গুহা পাহারা দিচ্ছি ? আমরা মানে আমাদের বংশ।

রিম্পোচে সিল্কের মুখোসটা সরালো মুখ থেকে। বললো, তুমি সন্দেহের পাহাড়, গিয়াৎসো। সব লামা হ'য়ে গেলে বংশের ধারা নষ্ট হ'য়ে যাবে। এরকম অনেকবার

হয়েছে। পরে আর একজন বুঝতে পারে অতীশের গুহার কাছের জায়গাটাই তার জায়গা। নতুন ক'রে বাড়ি তোলে, বংশ বাড়ায়। যেমন আমাদের কাকা করেছিলো।

গিয়াৎসো বললো, হায়, হায়। এবার দেখো তুষার-ঝড় উঠে পড়লো।

অতীশও ঝড়ের মধ্যে এসেছিলেন।

ঠিক এমন সময়েই লা'র মুখে শোনা গেলো : হুম মণিপদ্মে, হুম মণিপদ্মে। গিয়াৎসো রিম্পোচের মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। খচ্চর থেকে নেমে দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালো। একহাত অন্যহাতের আস্তিনে ঢুকিয়ে, মাথা সামনের দিকে নোয়ানো। শাদা কান দুটো খাড়া ক'রে একটা খচ্চর ক্লান্ত ভঙ্গিতে তবু লাফ দিয়ে লা'র মুখের পাথরটার উপরে উঠে দাঁড়ালো। তার পিঠের উপরে ভারতীয় শ্রমণের কানঢাকা টুপি পরা একজন কেউ।

রিম্পোচে এগিয়ে গেলো। দধিকর্ণ থেকে নামলো ভারতীয় শ্রমণ। রিম্পোচে প্রাকৃত লেখাপড়া করেছিলো, হানুদের ভাষা জানতো, এমনকি দক্ষিণ মহাদেশের ভাষাও কিছু-কিছু জানতো। সেই ভাষায় দু-একটি প্রার্থনাও।

সে এক পা এগিয়ে গিয়ে মাথাটা সামনের দিকে আরও নুইয়ে বললো, বুদ্ধং শরণং···

লোকনাথ বললো, গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

গিয়াৎসো এগিয়ে গিয়ে লোকনাথের জামার প্রান্ত তুলে চুমু খেলো।

এবার দক্ষিণের মিছিল উত্তরে ফিরলো। সামনে সশস্ত্র লস্কর। ডাইনে রিম্পোচে; বাঁয়ে গিয়াৎসো, মাঝে লোকনাথ।

পিছনে তুষারের ঝড়। মিছিল এগিয়ে চললো। আর—অমিতাভায় লোক-নাথায়, অমিতাভায় অমিতকারুণ্যে লোকনাথায়। এ রকমই কি একটা কিছু তখন শোনা গিয়েছিলো? পেমার শাশুড়ি কখনও উচ্চারণ করতো। থেনডুপ উচ্চারণ করতে গিয়ে ধরা পড়লে হাসে। না, এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট দেখতে পায় পেমা সেই মিছিল। সে দেখতে পেলো পথের উপরে কিছু একটা নড়ছে। 'কিছু একটা' না বললে কাঁকড়া বলতে হয়। কাঁকড়ার মতো চলে সে। থেনডুপকে এখন আর মানুষ ব'লে মনে হয় না। এই দিনের আলোতেও।

কাল সন্ধ্যাবেলার কথাই ধরো। গিয়াৎসোদের নিয়ে থেনডুপের সঙ্গে অনেক-ক্ষণ কথা হয়েছিলো। বারবার তখন তার মনে হয়েছিলো একি সেই? একি সেই থেনডুপ? মুখের আদলে তার কথাই মনে হয় বটে, কিন্তু—। পঁচিশ বছর আগে যে চ'লে গিয়েছিলো সে ছিলো কুড়ি বছরের এক যুবক চাষী, হাসতো কথায়

কথায়, রসিকতা করতো কথায় কথায়। আজ কোমরের কাছে দোমড়ানো এই রুগ্ন বৃদ্ধ? একটা চূড়ান্ত অনুভূতির বর্ণনা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়। থেনডুপ ফিরে আসার একমাস পরে। সেদিন সকাল থেকেই পেমা নিজেকে প্রস্তুত করতে সুরু করলো। অথচ সেই উষ্ণ বিকেলের শয্যায় আচ্ছাদনহীন নিজের শরীর থেনডুপকে উৎসর্গ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন পেমা ঘৃণায় শিউরে উঠেছিলো। ছি-ছি এ কি করছে? থেনডুপের বিছানায় এ কাকে এনেছে সে? একি বিশ্বাসঘাতকতা? কিন্তু গ্লানি এবং ঘৃণাই।

অবশ্য, পেমা পথের উপরে থেনডুপের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলো ; প্রতিটি পদক্ষেপই কি যন্ত্রণা থেনডুপের, অবশ্য, ভাবলো পেমা ; থেনডুপ-স্মৃতির মুখোস ছিঁড়ে বাস্তবের থেনডুপকে প্রকাশ করতে পারতো, কিম্বা স্মৃতির থেনডুপের সঙ্গে এক হ'য়ে যেতে পারতো। যদি সে—। কিন্তু তা কি ক'রে হবে? সাড়ে তিনফুট উঁচু, পাঁচফুট লম্বা, তিনফুট চওড়া একটা অন্ধকার ঘরে যাকে পঁচিশ বছর কাটাতে হয়েছে, সে কি আর সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে? কোমর দুমড়ে গিয়েছে, উরু দু'টো শুকিয়ে পায়ের গুলের সমান, আর যাকে পেমা ফুলের কলি বলতো তার অস্তিত্বই নেই। চমরী ষাঁড়দের অমন করা হয় বটে।

থেনডুপকে জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নেই। সে তার কয়েদখানার কথা তুললে হাসে কিন্তু কংমোর ছেলে শাও চি বলেছে সেই ঘর নাকি অন্ধকূপের চাইতেও ভয়ানক।

হঠাৎ যেন মেরুদণ্ড বেয়ে একটা দুঃসহ উত্তাপের জ্বালা উঠে এসে পেমার হৃৎপিণ্ডকে জ্বলন্ত লোহার বেড় পরিয়ে দিলো। এত পরিশ্রমেও যা দেখা যায়নি, সমস্ত কপালটা ঘামে ভিজে উঠলো—তার ছ'ফিট উঁচু শরীরটাকে কেউ যেন একটা সাড়ে তিনফুট উঁচু ঘরে অনন্তকালের জন্য আটকে রেখেছে। দাঁড়ানোর উপায় নেই, পা মেলে শোবার উপায় নেই, শুধু ব'সে থাকা, ব'সে থাকা।

পেমা ডান পা'টাকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলো, বুড়ো আঙুলটাকে উঁচু করলো। নিতম্ব থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত প্রতিটি পেশী তার বাধ্য, অনুগত, মুখের কথার দরকার হয় না, ইচ্ছা অর্ধস্ফুট হ'তেই ঢেউ তুলতে সুরু করেছে। কিন্তু লজ্জিত হ'লো পেমা। থেনডুপ যদি দেখতে পেয়ে থাকে! অথচ থেনডুপকে বিড়বিড় ক'রে হুকুম করতে হয় তার পা দু'খানাকে। এটা অবশ্য মুদ্রাদোষও হ'তে পারে। একটা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে একা পঁচিশ বছর শুধু ব'সে কদাচিৎ আধশোয়া অবস্থায় যাকে কাটাতে হয়েছে তার নিজের সঙ্গে কথা বলার মুদ্রাদোষ জন্মাতে পারে। কিন্তু তাই বলে—এখনও হয়তো থেনডুপ প্রতি পদক্ষেপে ব'লে চলেছে

ওঠো থেনডুপ, এটা একটা পাথর, হ্যাঁ, এইতো উঠতে পেরেছো, এবার নাবো, আবার ওই পাথরটায় ওঠো, ওঠো, ওঠো, এ কষ্ট কিছুই নয়, থেনডুপ, না পারলে চলবে কেন ?

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে থেনডুপের শরীরটা একটা বুড়ো, অশক্ত, বদমেজাজী চাকর, যার কাঁধে চেপে আসল থেনডুপ অমন হুকুম করতে থাকে ? আসল থেনডুপ ? সে কি এখনও কুড়ি-একুশ বছরের মতোই তরুণ সুন্দর সুঠাম ; কখনও কখনও যে থেনডুপের চোখের হাসিতে এখনও এক মুহূর্তের জন্য দেখা দেয় জানলা দিয়ে সিগাৎসের বড়ো লামা যেমন দর্শন দান করেন ?

পেমা মাথা দুলিয়ে নিজের এই অসম্ভব কল্পনাকে অস্বীকার করলো। সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। থেনডুপের অশক্ত শরীরটাকে সাহায্য করা দরকার।

কাল সন্ধ্যাবেলায় থেনডুপ যা বলেছিলো তা ভাবতে গিয়েই তার চিন্তা অন্ত-পথে চ'লে এসেছে। থেনডুপ স্বীকার করেছিলো কাল, জেলখানায় সে নিজের সঙ্গে কথা বলতো। সে নিজেকে বলতো : থেনডুপ, বিশ বছর হ'লো, আর দশ বছর পরে ; থেনডুপ, চব্বিশ বছর হ'লো আর ছ' বছর পরে। আর তোমার পেমা, তোমার সেই পুবদেশের বউ তোমার জন্য আরও সুন্দর হ'য়ে অপেক্ষা করছে। কখনও কখনও থেনডুপের সন্দেহ হ'তো পেমা কি পুরুষের লোভ নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখতে পারবে ? দেবীরাও পারে না। তখন থেনডুপ নিজেকে খুব ধমকে দিতো, সারাদিন উপবাসে থাকতো। অবশেষে একদিন সে বললো, বলতে পেরে-ছিলো নিজের মনকে, থেনডুপ, পেমা যদি অন্য কোনো পুরুষকে নেয়, আশীর্বাদ ক'রো। অন্য একদিন হঠাৎ তার এই সাইমিয়া গাছটার কথা মনে পড়ে। তারপর থেকেই তার কষ্টও ক'মে যেতে থাকে। কষ্ট হ'লেও সে বলতো, থেনডুপ গাছটার কথাই ভাবো, গাছটাই গিয়াৎসো। অভ্যাসে এসে গিয়েছিলো। কষ্ট হ'লেই গাছটা ফুল ফুটিয়ে দাঁড়াতো মনের মধ্যে, আর সেই জেলখানার অন্ধকারে কখনও কখনও হঠাৎ তার দু'একটা ফুল সোনালি হ'য়ে উঠতো।

পেমার চিন্তায় বাধা পড়লো। এখন থেনডুপকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষ যখন চলে তার পা দু'টো সোজা হ'য়ে পড়ে মাটিতে। থেনডুপের পা দু'টো পড়ছে কোনা-কুনি, কোমর থেকে মাথাটা এগিয়ে আছে রাস্তার সমান্তরাল, যেমন চমরীর থাকে।

আবার সেই আগুনের বেড়াটায় লেগে পেমার হৃৎপিণ্ডটা জলে পুড়ে গেলো, ছটফট ক'রে দাপাতে লাগলো সে। আর এ-সবই সময়মতো পেমা ছ'সাত শ' টাকা যোগাড় করতে পারেনি ব'লে। তাই বলে শাও চি। লামাটাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে

খাদে ফেলে দেয়ার অভিযোগে যখন ওরা থেনডুপকে ধ'রে নিয়ে গেলো তার তিনদিন পরে একজন এসে বলেছিলো প্রতিবেশী কংমোকে, ছ'শ টাকা হ'লে থেন-ডুপের মুক্তি কেনা যায়। কিন্তু এর চাইতে মৃত্যুদণ্ড ভালো ছিলো। গিয়াৎসোর মতো মৃত্যু ভালো। থেনডুপ কি গিয়াৎসোর চাইতেও বড়ো বিশ্বাসঘাতক? মৃত্যু? শিউরে উঠলো পেমা। না, না। থেনডুপ ফিরে এসেছে সেই ভালো। হোক বিকলাঙ্গ, তবু সে থেনডুপ। পেমার চোখে জল এসে গেলো।

থেনডুপ এসে পড়েছে। চমরীর বাছুরটা অবাক হ'য়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। মুক্তি পাওয়ার পর যে খচ্চরটার পিঠে চাপিয়ে থেনডুপকে সে শহর থেকে এনেছিলো সেটা কান খাড়া ক'রে কি শুঁকছে। হঠাৎ বাছুরটা ল্যাজ তুলে ছুটে পালালো, খচ্চরটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে স'রে গেলো, বয়স্ক চমরী দু'টো হ্ম্‌ ক'রে একসঙ্গে ডেকে উঠে দাঁড়ালো।

থেনডুপ অবাক হ'লো এই ডাকাডাকি, এই আকস্মিক চাঞ্চল্যে। তারপর হেসে ফেললো। বিড়বিড় ক'রে বললো, ভয়? ভয় পেয়ো না, ভয় বিদ্বেষ একই। যাকে ভয় পাবে তাকেই হিংসা করতে ইচ্ছা হবে, যাকে হিংসা করেছো তাকেই ভয় পাবে।

পেমা বললো, কিছু বললে?

থেনডুপ লজ্জিত হ'লো। যেন নতুন বউয়ের সামনে মুদ্রাদোষ প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। বললো, একটা জিনিস পেলাম।

কি জিনিস?

জড়ানো সরু তারের জাল খানিকটা বার করলো থেনডুপ জামার ভাঁজ থেকে।

এ আবার কি এমন জিনিস? এরই জন্য এতো দেরি?

তোমার চৌকির তলায় লুকানো যন্ত্রটা এবার কথা বলবে। জামার ভাঁজ থেকে একখানা চটি বই বার করলো থেনডুপ, হান্‌দের লেখা পুঁথি দেখো, আমাকে প'ড়ে শুনিয়ো।

সে হবে খাওয়ার পরে।

ঘরে এসে পেমা বললো, স্নান করবে?

যদি বলো।

পেমা স্নান করিয়ে দিলো থেনডুপকে। পিঠ, কোমর, উরু ড'লে ড'লে দিলো গরম জল দিয়ে। এতে কি রক্তের প্রবাহ ফিরতে পারে পঁচিশ বছরের শুকিয়ে যাওয়া শিরায়? নিজের পরিপুষ্ট হাত দু'খানা পেমার চোখে পড়লো। বুড়ি বলবে কোন মূর্খ? কিন্তু, হঠাৎ যেন তার চোখে জল আসবে মনে হ'লো—তাদের ছেলে-

পুলে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আর নেই। এই তো, সে দেখতেই পাচ্ছে।

থেনডুপকে পোশাক পরিয়ে চৌকিতে বসালো পেমা। হাত-পায়ের জল মুছতে মুছতে বললো, আসলে গাছের বীজ না হ'লে গাছ হয় না। থেনডুপ, তোমার এই সাইমিয়া কেউ লাগিয়েছিলো ওখানে বাচ্চা চমরীর জিভে।

সাইমিয়া বলছো ? অসম্ভব কি ?

শোবার ঘরের মেঝেতে লম্বা জলচৌকিটার উপরে কাপড় বিছিয়ে থালা রাখার জায়গা. মেঝেতে আসন বিছিয়ে বসবার জায়গা করলো পেমা। শাশুড়ির প্রার্থনা-চক্রটাকে রাখলো জলচৌকির ওপরে। প্রদীপ জ্বালালো একটা চমরীর মাখনে। বড়ো দু'টো বাটিতে মাংস, রসুন দেয়া যবের গাঢ় সুপ। ধোঁয়া উঠছে। থেনডুপকে পাশে নিয়ে খেতে বসলো পেমা। এবার থেনডুপ প্রার্থনা করবে। পেমাই অবশ্য এই প্রার্থনার জন্য দায়ী। থেনডুপ ফিরে এলে সব আবার আগেকার মতো হোক ব'লে পুরনো প্রার্থনার প্রথাটাকে সেই চালু করেছিলো। আজও সে প্রার্থনার যন্ত্রটাকে এনেছে।

কিন্তু থেনডুপ আজ প্রার্থনার কথা মনে মনে বললো কি না বললো, এক মুহূর্ত চোখ বুঁজে থেকেই খেতে সুরু করলো।

পেমা তার পুরনো কথায় ফিরে এলো, আর গোলাপী ফুলের মধ্যে যদি কখনও হলুদ ফুল ফোটে তাবও কারণ আছে। ওকে গ্র্যাফ্‌টিং বলে। বিশ্বাস না করো আমাদের বাদামী শূকরের পালে শাদা বাচ্চা দু'টোকে দেখো। আমাদের পাটকিলে শূকরীটাকে কংমোর বুড়ো শাদা মদ্দাটাকে দেখিয়েছিলাম। শুধু শাদা নয়, কেমন বড়ো হয়েছে, না ?

থেনডুপ বললো, তা হয়।

পেমা বললো, আর সেই লোকটা, যাকে লোকনাথ বলো. আচ্ছা, তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ? সে যে সীমান্ত পার হ'য়ে আঙুল ঝেড়েছিলো আমাদের দেশের দিকে চেয়ে, পিস্তলের একটা চোঙ খালি করেছিলো আমাদের দেশের আকাশের দিকে—তার অর্থ কি ? সে কি গিয়াৎসো আর রিম্পোচে লামাকে মৃত্যু-দণ্ড দেয়ার জন্য অভিশাপ ?

থেনডুপ বাটি থেকে কাঠের চামচ দিয়ে গরম সুপ খানিকটা মুখে দিলে। স্নানের পরে এই সুস্বাদু আহার। তৃপ্তিতে শরীরে একটা বিশ্রামের ভাব আসছে। এ অবস্থায় চোখ বুঁজে চিন্তা করা চলে। থেনডুপ কি চকিতের জন্য সেই মিছিল-টাকেই দেখতে পেলো ? ডাইনে রিম্পোচে, বাঁয়ে গিয়াৎসো, পিছনে তুষার-ঝড়। যা কিছুক্ষণ আগে পেমা দেখেছে।

কিন্তু সে বললো, হয়তো বলেছিলো, মরুক গে যাক।

তা হ'লে? আর ওই বোতলটাকে তুমি কি মনে করো? জানো ওটা ইংরেজি চোলাইয়ের বোতল।

বুধগয়ার জল নয়? থেনডুপ হাসলো।

ছাই-ছাই। পেমার তামাটে গাল লাল দেখালো। একরাতে আধবোতলের সবটুকু শেষ করেছিলাম গলায় ঢেলে। হ'লো কিছু? হ'লে তো দেখতেই পেতে, থেনডুপ। এতদিনে বাইশ বছরের যোয়ানটি হ'তো।

হাসিতে থেনডুপের চোখ দু'টো মিটমিট করলো।

একটু থেমে বললো আবার পেমা, সে যে ইংরেজের বাণিজ্যের জন্য আসেনি তা কি তুমি বলতে পারো? ওটা বুধগয়ার জল নয়, ইংরেজি চোলাই। মিথ্যা হ'লো না ব্যাপারটা?

অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বললো থেনডুপ, আমি জানি। গিয়াৎসো জানতো। সেই তুষার-ঝড়ের রাত্রিতে, একশ' বছরে সে রকম ঝড় হয় নি, অতীশের গুহার মুখও ঢেকে গিয়েছিলো। শহর থেকে গিয়াৎসো ফিরছিলো দু'দিন পরে। সারা দুপুর বরফ কেটে একটা জানলা বার ক'রে তবে নিজের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিলো সে। তখন ওই ইংরেজি চোলাই গিয়াৎসোর স্ত্রীকে খেতে দিয়েছিলো লোকনাথ।

পেমা একেবারে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। তুমি জানো? এ সবই জানতে?

কিছুক্ষণ আর কথা না ব'লে খেতে লাগলো। তারপরে হঠাৎ যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো থেনডুপ বললো, সকালে যে তার এনেছি সেটার দু'টো মাথা দু'টো ব্র্যাকেটে লাগাও। ওকে এরিয়েল বলে।

থেনডুপের নির্দেশমতো ঘরের সিলিং-এ এরিয়েল লাগালো পেমা। যন্ত্রটাকে টেনে বার ক'রে দিলো থেনডুপের সামনে। থেনডুপ যন্ত্রের সঙ্গে এরিয়েলের তারের মাথা লাগাতেই সেটা একটু গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো।

বাহ্, তুমি যন্ত্রের কাজ শিখলে কোথায়? পেমা অবাক হ'য়ে গেলো।

যে তার দিয়েছে সে-ই ব'লে দিয়েছে।

এতে কি গান শোনা যাবে? শাও চি-র বাড়িতে এমন একটা আছে।

কথাও শোনা যাবে। তোমার ঘরের মাথায় ওরা একটা শুঙ্গ লাগিয়ে দেবে; আর এ যন্ত্রটায় একটা চোঙ বসাবে। তখন কথাও বলা যাবে।

কার সঙ্গে কথা বলবে যে দু'মাস হ'লো যন্ত্রটা এনে রেখেছো?

থেনডুপ নিঃশব্দে হাসলো।

পেমা খেতে বসলো। বললো, রশুনগুলো আমাদের ক্ষেতের। হানুদের বইতে

চাষের কথা আছে। তেমন ক'রে লাগিয়েছিলাম। কেমন মাখনের দলার মতো মোলায়েম নয়? আর একটু নাও, অনেক আছে হাঁড়িতে।

কাঠের হাতা দিয়ে পেমা থেনডুপের থালাতে খানিকটা মাংস, রসুন সমেত সুপ তুলে দিলো। সে আবার বললো, গিয়াৎসো জানতো? আশ্চর্য লাগছে না তোমার ভাবতে?

থেনডুপ হেসে বললো, জানতো। গিয়াৎসোর স্ত্রীর কাছে কোন পশম ভালো, কোন পশমের কেমন দাম এসবও জিজ্ঞাসা করতো লোকনাথ। আর তা জানার পরেও লোকনাথকে আর ছ'মাস লুকিয়ে রেখেছিলো গিয়াৎসো। পেমার মুখের দিকে চাইলো সে। হাসলো। তারপর বিড়বিড় ক'রে বললো, মুখের ছাদ, জিহ্বা আর দাঁত, এরই সাহায্যে শব্দ; কিন্তু এদের কোনোটাই এমনকি সবটা মিলেও শব্দ নয়।

পেমা বললো, তুমি কিন্তু সেই লামাকে তিনশূলী কোদাল দিয়ে মারতে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ। আমি কি গিয়াৎসো? সে আমার পুবদেশী বউকে অত্যন্ত খারাপ কথা বলেছিলো।

তাতে তোমার পেমার কি ক্ষতি হয়েছিলো?

হয়তো ক্ষতি হ'তো না। থেনডুপ যেন পঁচিশ বছরের দূর দেশটাকে এক্ষুণি দেখতে পেলো, কিন্তু তখনই আবার ফিরে এলো, ওখানে এখন এমন কিছু আর নেই যা নিয়ে চিন্তা করা যায়।

রেডিও ট্রানসমিটারটা গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো। কে যেন ঘরঘরে কিন্তু চড়া গলায় কি ব'লে থেমে গেলো। দুম্‌দাম্‌ ক'রে শব্দ হ'লো কিছুক্ষণ ধ'রে।

থেনডুপ বললো, লামাদের উপদেশ দেয়ার মতো ভঙ্গি তার যদিও সে কোনো-দিনই লামা নয়—রিম্পোচে লামা অদ্ভুত জ্ঞানী ছিলো। সে কনফুসির পুঁথি পড়ে-ছিলো, ইৎসির পুঁথি পড়েছিলো। অতীশের অনেক পুঁথি আগাগোড়া মুখস্থ ছিলো তার। আর শুনলে অবাক হবে যে দক্ষিণ মহাদেশের ভাষা জানতো, যে ভাষায় নিজে বুদ্ধ ভগবান উপদেশ দিয়েছিলেন। আর লোকনাথও সেই ভাষা জানতো। লোকনাথের সঙ্গে কথা ব'লে পরে সে বলেছিলো লোকনাথ ভগবান বুদ্ধের ভাষাতেই তাঁর উপদেশ বলতে পারে। অতীশের পরে কে আর তা বলেছে আমাদের দেশে? বরফের ঝড়ে পড়লে তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু জানলা দিয়ে বরফের মতো আর কাকে পবিত্র দেখায়? আগুন তোমাকে পোড়ায় বটে, কিন্তু আগুন প্রাণবর্ধক; আর তার রং?

হঠাৎ ট্রানসমিটারে কথা শোনা গেলো আবার। স্পষ্ট চড়া গলায় কেউ কিছু বলছে।

আরে! আরে! থেনড়ুপ উঠে দাঁড়াতে গেলো। এখনই, আশ্চর্য!

বিস্ময়ে পেমার মুখ হাঁ হ'য়ে গিয়েছিলো। সেটা বন্ধ করতে ভুলে গেলো সে এসব কি?

রেডিওতে উত্তুরে হান্‌দের ভাষায় কেউ কিছু বলছে।

কি বলছে? ভালো ক'রে শোনো তো, ভালো ক'রে। উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো থেনড়ুপ।

পুবদেশী মেয়ে পেমা হান্‌দের ভাষা বোঝে। নিচু হ'য়ে কান পাতলো ট্রানস-মিটারের কাছে।

হঠাৎ পেমা ভয়ে বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালো। সে বললো, সর্বনাশ, সর্বনাশ! আমাদের শহর হান্‌রা দখল করেছে। লামারা পালাচ্ছে। পথে পথে যুদ্ধ হচ্ছে।

সে বিছানার কাছে ছুটে গেলো। কম্বল টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে একটা পুটুলি বাঁধতে স্বরু করলো।

থেনড়ুপ বললো, পালাচ্ছো?

হায়, হায়, এখন কি করি! কোথায় পালাবো! দিশেহারা হ'য়ে বললো পেমা!

থেনড়ুপ বললো, তুমি কি হান্‌দের পুঁথি পড়োনি? তাদের মতো রসুন চাষা শেখোনি? সে সব বইয়ের কোনো পৃষ্ঠায় তুমি কি পড়োনি, সব মানুষ সমান?

কিন্তু রসুন চাষের সঙ্গে হান্ সৈন্যদের কি সম্বন্ধ? আর মানুষ সমান তো উত্তুরে হান্‌দের দেশে।

তুমি যা বলো ওরাও তাই ব'লে—শরীরই সব। থেনড়ুপ হাসলো, যার শরীর নেই তার কিছুই নেই।

আমাদের দেশ, আমাদের দেশ!

সাম্য ছাড়া অবিদ্বেষ হয় না। থেনড়ুপ বিড়বিড় ক'রে নিজেকে শোনালো. বিদ্বেষ থেকে ভয়, ভয়ের অন্য নাম মৃত্যু।

পেমা বললো, তুমি জানতে হান্‌দের আসার কথা?

নতুবা কোথা থেকে হান্‌দের বই আনলাম তোমার জন্যে?

পেমা কোমরে হাত দিয়ে অবাক হ'য়ে থেনড়ুপের দিকে চেয়ে রইলো। তার-পর তার মুখে হাসি দেখা দিলো। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা ঢিলে হ'লো। সে ধীরে ধীরে বললো, আমি পড়েছি, শাও চি চাষ-আবাদের যে-বই দিয়েছিলো তাতে বড়ো রসুন চাষের কথা ছিলো। আর তাতে সাম্যের কথাও ছিলো। থেনড়ুপ, সাম্য

ভালো। কেউ কারো উপরে অত্যাচার করবে না। ছ'শ টাকা না পাওয়ার জন্য যাকে খুশি তাকে জেলখানায় রাখা যাবে না। শাও চি-র স্থির বিশ্বাস। কিন্তু আমার ভয় করে। ভয়েই যেন পেমার আপাদমস্তক একবার শিউরে উঠলো।

ট্রানসমিটারে আবার শোনা গেলো, এবার স্পষ্ট আর হুকুমের স্বরে: লামারা পালাচ্ছে। তারা দেশদ্রোহী। তাদের যারা আশ্রয় দেবে, তাদেরও দেশদ্রোহী ব'লে গণ্য করা হবে। গ্রামের লোকরা মনে রেখো—এরাই তোমাদের উপরে অত্যাচার করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

পেমার মুখে একটা টানা হাসি ফুটে উঠলো। অত্যাচার, অত্যাচার। থেনডুপ, তুমি লামাকে খাদে ফেলোনি। হয়তো চাষ করার তিনশূলী কোদালের ভয় দেখাতেই চেয়েছিলে তুমি। সে-ই তোমাকে পিছন থেকে ধরার জন্যে খাদের ধারে ধারে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু বিচারক লামারা তা শোনে নি। কারণ সেই মেয়েমানুষের মাংসলোভী লামা খাদে প'ড়ে শামুকের মতো ভেঙে গিয়েছিলো।

থেনডুপ বললো, সকালে জল আনতে গিয়ে কিছু দেখেছিলে নিচের সড়কে?

পেমা মনে করার চেষ্টা ক'রে বললো, দু'য়েকখানা গাড়ি।

ভালো ক'রে দেখেছিলে? অন্তত পঞ্চাশখানাকে যেতে দেখেছি আমি। কিন্তু আজই ঘ'টে গেলো।

ট্রানসমিটার আবার ঘোষণা করলো: এইমাত্র খবর পাওয়া গেলো উত্তর পাহাড়ের দিকে একজন বড়ো জাতের লামা পালিয়েছে। সে নরহত্যার অপরাধ করেছে। সে দেশদ্রোহীও বটে। তাকে কেউ আশ্রয় দিও না। তাকে আশ্রয় দেওয়া বা পালাতে সাহায্য করা দেশদ্রোহের অপরাধ হবে।

ওরা কি সাম্য নিয়ে আসছে? আচ্ছা থেনডুপ ওরা কি সব অন্যায় দূর করবে? পুরনো অন্যায়ও?

তা পারে। নতুন অন্যায়ের শিকড় পুরনো অন্যায়। নতুন অন্যায়কে দূর করতে হ'লে হয়তো শিকড় উপড়োতে হবে। খাবার বাসনপত্র সরাও এখন। পটু হাতে কাজ স্বরু করলো পেমা, নিমেষে শেষ করলো। কিন্তু তার সর্বাঙ্গ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। রান্নাঘরে গিয়ে সে চায়ের জল চাপিয়ে এলো: একবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর শোবার ঘরে থেনডুপের সামনে ফিরে এলো। কাজ করার জামার পকেট থেকে কুচনো তামাকপাতা আর কাগজ নিয়ে থেনডুপের চৌকির পায়ার কাছে বসলো। সিগারেট পাকাতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে। হঠাৎ তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠলো। বললো সে, আচ্ছা, থেনডুপ, তোমার অন্যায় বিচারের বিচার হবে?

থেনডুপ ব'সে ব'সে ছুলতে লাগলো। তারপর হাসলো। হেসে বললো, যদি তুমি তেমন বিচার চাইতে পারো।

তারপর আবার সে নিঃশব্দ হাসলো—একটানা আলোর মতো হাসি।

হাতে পাকানো সিগারেটটা ছু'হাতের তেলোয় গড়িয়ে নিয়ে ছোটো একটা উদ্গার তুলে সিগারেট মুখে দিলো পেমা। আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, থেনডুপ গত বছর মাখন-উৎসবে শাও চি আমাকে একখানা হান্‌দের পুঁথি কিনে দিয়েছিলো। সেই বই প'ড়ে রশুন লাগিয়েছি ভালো হয়েছে, শুয়োরের বাচ্চাগুলোও কেমন বড়ো হয়েছে তা তুমি দেখেছো। সেই বইয়ের প্রথমেই সাম্যের কথা আছে—রশুন আর শুয়োরের বেলায় যদি বইয়ের কথা সত্য হয়—সাম্যের কথা মিথ্যা হবে কেন ?

অদ্ভুত শান্ত গলায় থেনডুপ বললো, সাম্য ভালো। সাম্য এলে বিদ্বেষ থাকে না। আর বিদ্বেষ থেকে ক্রোধ আর ভয় জন্মায়। সুতরাং সাম্য একটা পথ। পেমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো; সে বললো, মুখের ধোঁয়া অলসভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, হ্যাঁ, থেনডুপ, তুমি বলেছিলে বটে সেই জেলখানায় যতদিন তোমার রাগ ছিলো ততদিন ভয় আর বিদ্বেষ ছিলো। তারপর একদিন তোমার রাগ গেলো। গিয়াৎসো যেন সোনালি ফুল হ'য়ে উঠলো তোমার মনে। তারপর বিদ্বেষ গেলো। তারপরে ভয়কে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। তারপর থেকে জেলখানার আর কোনো কষ্টই রইলো না তোমার।

ঝির-ঝির ক'রে হেসে ফেললো পেমা। ধোঁয়ায় বেদম হ'য়ে খক্-খক্ ক'রে কাশলো। উঠে গিয়ে কফ্ ফেললো। ফিরে এসে বললো, থেনডুপ, তুমি দেখো আমি বিচার চাইতে পারবো। হান্‌দের বই আনবো ? প'ড়ে শোনাবো তোমাকে সাম্যের কথা ? এ ভারি মজার ব্যাপার—পড়তে পারি, কিন্তু তুমি শুনে যত বোঝ, আমি প'ড়ে তা বুঝি না।···কিন্তু তুমি কি গিয়াৎসোর মতো মিছিল করবে নাকি ? তোমাদের বংশে সেই কতদিন থেকে অতীশের প্রবাদ। গিয়াৎসো গেলো লোকনাথকে আনতে। আর ভয়, বিদ্বেষ, এসব কথার সঙ্গে, লোকনাথের নাম জড়ানো। তুমিও সাম্যের কোনো লামাকে আনতে যাবে নাকি ? হো-হো-হো ক'রে হেসে উঠলো পেমা।

নিঃশব্দে থেনডুপও হাসলো। বললো, আসবে কেউ তা শুনেছি। আমাদের বাড়িটাকে নাকি ওরা ভালো রকমে ব্যবহার করতে পারবে। কাজে লাগার মতোই বাড়ি। কিন্তু আজই শুরু হ'য়ে যাবে ভাবিনি।

আ, থেনডুপ, ওরা এলে কি খেতে দেবো ? কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবো ? আজ

না এলেই ভালো। আমাকে তৈরি হ'তে সময় দাও।

রসুন, নুন, ঝাল, মাংস, যবের গুঁড়ো আর চা কোনটার অভাব তোমার?

একটু ভাবলো পেমা। বললো, আমি কিন্তু তোমার বিচারের বিচার চাইবো তা তুমি দেখে নিও। কিন্তু মনে রেখো গিয়াৎসোকে দেশদ্রোহী বলা হয়েছিলো।

থেনডুপ বললো, আমার সম্বন্ধে তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? ভয় না করাই ভালো। এসব ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে হয়।

দু'খানা হাত পিছনে রেখে তার ওপরে শরীরের ভার ঢেলে দিয়ে পা দু'খানাকে সামনে বিছিয়ে দিলো পেমা।

এখন তুমি তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলতে পারো আমাকে।

কিন্তু পেমার বিশ্রাম করা হ'লো না। হঠাৎ মেঝের নিচে ক্যাঁ-ক্যাঁ ক'রে চিৎকার উঠলো। মাদী, মদ্দা, বাচ্চা সবগুলো শুয়োর একসঙ্গে চ্যাঁচাচ্ছে, দাপাদাপি করছে। নেকড়ে? পেমা উঠে দাঁড়ালো তড়াক ক'রে। তখনই আবার ব'সে প'ড়ে ঘরের মেঝের ফোকরে চোখ রাখলো। ইশারা ক'রে বললো, মানুষ। আশ্চর্য, সাম্যের মানুষরা ওখানে কেন? তা নয়? তবে চোর? শুয়োর-চোর এই দিনদুপুরে!

বলতে যত সময় লাগে তার চাইতে কম সময়ে ঘটনাটা ঘ'টে গেলো। ক্ষেত থেকে পাথর আলগা করার তিনশূলী কোদালটা ঘরের কোণ থেকে নিয়ে তরতর ক'রে নেমে গেলো পেমা। কিছুক্ষণ কাকে ধমকালো সে। তারপর একজন লোককে ধাক্কাতে ধাক্কাতে উপরে নিয়ে এলো।

চাষীদের মতো ময়লা জামা পরা, সারা গায়ে ধুলোমাটি; বয়স অনুমান ষাট; মাথার চুল শাদা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। আর হাতের মসৃণ প্রায় রক্তবর্ণ আঙুল-গুলো দেখলে বোঝা যায় তাকে চাষীদের কাজ করতে হয় না।

ভয়ে তার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, কপালে ঘাম। কাঁপছে সে।

থেনডুপ বললো, কে তুমি? তোমাকে দেখে শুয়োর-চোর ব'লে মনে হয় না।

লোকটা বললো, না, আমি চোর নই! তোমরা আমার স্বদেশবাসী; আমাকে তোমরা রক্ষা করো।

থেনডুপ বললো, ভয় নেই, তোমার ভয় নেই; কিন্তু কে তুমি?

লোকটা কিছু বলার আগে এদিক-ওদিক চাইলো। ঢোক গিললো। দু'দিকের দরজাই খোলা। সামনের দিকের দরজা দিয়ে পথের খানিকটা চোখে পড়ে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ায় লোকটা চমকে উঠলো। অমিতাভের দোহাই, দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দাও। সে যেন নিজেই দরজা বন্ধ করবে এমনভাবে এগিয়ে গেলো সেদিকে।

থেনডুপ বললো, তুমি বসো, এখানে ভয় নেই। পেমা দরজা দু'টোকে বন্ধ ক'রে দাও।

পেমা দু'টো দরজাই বন্ধ ক'রে দিলো। লোকটা একটা জলচৌকির উপরে বসলো। সে যে কত ক্লান্ত এবার তা বোঝা গেলো। বসেও সে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

থেনডুপ বললো, তোমাকে কিছু খেতে দেবো ?

লোকটা বললো, ভগবান বুদ্ধের দোহাই, তোমরা আমার স্বদেশবাসী, আমাকে বাঁচাও।

কি হয়েছে তাতো বলছো না। পেমা বললো।

লোকটা বললো, তোমরা কি কিছুই খবর রাখো না ? অথবা চাষাদের এই রীতি। তাদের চাইতে যারা ভালো তারা যখন স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, তারা তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়োর পালে।

তা পালে, থেনডুপ হেসে বললো, কিন্তু তোমার বিপদটার কথা না জানলে কি ক'রে তোমাকে সাহায্য করবো তাও বুঝতে পারছি না।

লোকটা বললো, উত্তুরে কুকুররা এসে পড়েছে সে খবর কি তোমরা পাওনি ? আমাদের সব গেলো, উদ্ধারের আর আশা নেই। উত্তুরে কুকুরদের দাঁত ঝকঝক করছে, জিভ থেকে লালা গড়াচ্ছে। তারা আমাদের দেশের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

পেমা বললো, কাদের কথা বলছো, সাম্যবাদীদের ?

তাই বলে বটে নিজেদের তারা। কিন্তু আমি তাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা দেখেছি। নরকের কুকুর, যদি উত্তুরে কুকুর না হয়।

কিন্তু, থেনডুপ বললো এখানে কোনো কুকুর নেই। তোমার পোশাক দেখে যাই মনে হোক, কিন্তু কথার কায়দা, চেহারা থেকে ধরা পড়ছে তুমি সাধারণ লোক নও এমন কি তোমার জুতো জোড়ার দামও একশ' টাকা হবে।

লোকটা ভয় পেয়ে ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়ালো আবার। কিন্তু ভয় গোপন করার চেষ্টা করলো যেন। বললো, তুমি যখন বুঝতে পেরেছো, বলি তাহলে। আমি শহরের উত্তর দিকটা রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। আমার সৈন্যদলের যারা পালায়নি, তারা মরেছে। আমি পালিয়েছি। আমাকে ধরার জন্য লোক পাঠিয়েছে ওরা। আর সবাই পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। আমাদের মতো কয়েকজন শেষ চেষ্টা করছি হান্‌দের হাত থেকে দেশ রক্ষা করতে। যদি আমি এবার বেঁচে যাই, তোমাদের কথা মনে রাখবো। যত টাকা চাও দেবো তোমাদের। পাঁচ'শ, ছ'শ, হাজার।

থেনডুপ হেসে বললো, তা দিও। পেমা আমাদের অতিথির জন্ত একটু চা ক'রে আনো। অনুমতি করো আমার স্ত্রী তোমার জন্ত চা আনুক। বসো তুমি।

পেমা চা ক'রে আনতে গেলো। লোকটা আবার বসলো জলচৌকির ওপরে। থেনডুপ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো, কিছুক্ষণ যেন নিজের মধ্যে ডুবে হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ যেন তার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। খুব আগ্রহ নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে, অথবা ঠিক তোমার মতো এক-জনকে যেন এর আগে আমি কোথাও দেখেছি।

অসম্ভব নয়; শহরে গেলে, রাজ্যের নানা কাজেই আমাকে দেখে থাকবে।

থেনডুপ কিছুক্ষণ ভাবলো; আগন্তুকের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো; আবার তার মুখের দিকে চাইলো। হাতজোড় করার ভঙ্গিতে এক হাত দিয়ে অন্যহাত চেপে ধরলো। যেন তা ক'রে সে হাত দু'টোকে আটকে রাখতে চাইছে। ধীরে ধীরে বললো, আচ্ছা, তুমি বিচারক ছিলে না?

আগন্তুক চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বললো, তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছো। তা হ'লে বুঝতে পারছো, আমার উপকার করলে তা তোমার বৃথা যাবে না? দেশ আর অমিতাভ দুইয়েরই কৃপা লাভ করবে তুমি।

থেনডুপ বিড়বিড় ক'রে বললো, গিয়াৎসো, তোমার গাছের কথা ভাবতে ভাবতে এ মুখটাকে ভুলে গিয়েছিলাম: কিম্বা লামার পোশাকের বদলে চেনা যায়নি।

আগন্তুক বললো, কিন্তু এখন পর্যন্ত তুমি বলোনি কি ক'রে তুমি আমাকে বাঁচাবে। বিড়বিড় ক'রে কি বলছো। তুমি তো শরীরের দিক দিয়ে একেবারেই অকেজো দেখছি। তোমার মেয়েমানুষটিকে না হয় ডাকো, সেই কিছু বুদ্ধি দিক।

থেনডুপ আবার বিড়বিড় ক'রে বললো, অকেজো, একেবারেই অকেজো। মানুষের মতো দাঁড়াতেও পারি না। পেমা চা নিয়ে আসুক। সে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবে। তোমার পরিচয় পাওয়ার পর তোমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমি অকেজো হ'য়ে পড়েছি। বিদ্বেষকে তাড়ালে কি কাজের শক্তিও চ'লে যায়? অথবা কে জানে?

ঠিক এই সময়েই মোটর গাড়ির গোঙানি ভেসে এলো। পর-পর কয়েকটি, যেন কনভয় এগিয়ে চলেছে। পেমার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে যেন শব্দটা ভেসে এলো। যেন এদিকেই আসছে সেই মিছিল। আগন্তুক চমকে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণের দিকে ছুটে গেলো। মৃতদেহের মতো রক্তহীন মুখ থেকে দুটো দাঁত বেরিয়ে পড়লো। নিজের হাত মোচড়াতে লাগলো সে। হ'লো না, হ'লো না; তুমি কথা

বলছো না কেন ? ওই গাড়ির শব্দে বুঝতে পারছো না আমার উদ্ধারের আশা শেষ হ'য়ে গেলো। বলো, কিছু একটা বলো। তোমাদের শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই। দোহাই তোমার, আমাকে কোনো রকমে লুকিয়ে রাখো।

থেনডুপ বললো, আচ্ছা তোমার থেনডুপ গিয়াৎসো নামে কারও বিচার করার কথা মনে পড়ে ? একজন লামাকে নাকি খাদে ফেলে দিয়েছিলো সে। এরকম কিছু মনে পড়ে ?

হাঃ, এটা কি এমন সব ঠাণ্ডা আলাপ করার সময়। সব মিটে গেলে একদিন আমার প্রাসাদে যেয়ো, অনেক মামলার গল্প বলবো। আমি দু'হাজার মামলার বিচার করেছি। ডাকো না হয় তোমার মেয়েমানুষটাকে, দেখো সে কি বুদ্ধি দেয়। আমাকে এ যাত্রা কোনো রকমে বাঁচাও।

থেনডুপ বললো, তুমি ভালো ক'রে মনে আনার চেষ্টা করো। তার নাম ছিলো থেনডুপ, থেনডুপ গিয়াৎসো। আর সেদিনও কোনো কারণে তুমি এমনি অধীর ছিলে। বিচারের সব দিকে দেখবার মতো সময় ছিলো না। কি একটা রাজকার্য ছিলো। তোমার বিচারে থেনডুপের ত্রিশ বছরের জেল হয়েছিলো।

আগন্তুক বললো, তা হয়, এমন হয়েই থাকে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, যদি তাতে তুমি সুখী হও। পরে মনে হয়েছিলা সাজাটা বেশি হ'য়ে গেলো হয়তো। কিন্তু তুমিই বলো এখন কি এসব আলাপ করার সময় ?

থেনডুপ ভাবতে লাগলো। বারবার তার মুখটা বিকৃত হ'লো যেন সে ভয়ঙ্কর শক্ত একটা কিছুকে মুখের মধ্যে কায়দা করার চেষ্টা করছে। সময় সম্মুখ দিকে আর এগোচ্ছে না, বরং পিছন দিকের টানে একই জায়গায় পাক খেয়ে ঘুরছে।

কিন্তু আজ পেমার এই সরাইখানার মতো বাড়িতে আধুনিক কাল ঢুকে পড়বে তার লক্ষণ তো লুকনো ট্রানসমিটারেই। গোঁ-গোঁ ক'রে একটা মোটরের শব্দ জেগে উঠলো। টপ্-গিয়ারে চলার শব্দ যেমন হ'তে পারে, যেন খুব কাছেই। আন্দাজ হয় নিচে বড়ো সড়ক থেকে গাড়িটা যেন উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করছে। পেমার এই সরাইখানার মতো বাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে।

দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, আগন্তুক হাহাকার ক'রে উঠলো, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও। তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি।

কিন্তু কিছু সে বলার আগেই পেমা এলো অতিথির জন্য চা নিয়ে। তার মুখে খুশি, চেষ্টা করেও তা গোপন করতে পারছে না। সে যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে দ্বিধা বোধ করছে। অতিথির সামনে চা দিয়ে কিন্তু সে ব'লে ফেললো, বড়ো সড়ক থেকে একটা মোটর আমাদের এদিকের ছোটো রাস্তায়

উঠবার চেষ্টা করছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়।

থেনডুপ বললো, তা কি উঠতে পারে ? ওরা কি দধিকর্ণের মতো কোনো টাট্টু ?

পেমা বললো, ওরা কি সাম্যের লোক ?

থেনডুপ বললো, হয়তো। তুমি জানলা দিয়ে দেখো। আগেই দরজা খুলো না। থেনডুপ গিয়াৎসোর নাম না বললে তো নয়ই। আমি ততক্ষণ আমাদের অতিথির সঙ্গে কথা ব'লে নিই।

গাড়ির শব্দ আগন্তুক শুনতে পেয়েছিলো। সে বুঝতে পেরেছিলো মোটর কাদের হ'তে পারে। পেমার কথায় তার আর সন্দেহ রইলো না। চূড়ান্ত হতাশায় কপাল চাপড়াতে লাগলো সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো। প্রায় কান্নার স্বরে বললো, ফাঁদ, ফাঁদ, হা ভগবান বুদ্ধ, শেষে ফাঁদে পড়ে—, বলো তোমরা কি সাম্যবাদী ? বলো, তাই বলো। তোমরাও কি বিদ্রোহী ?

থেনডুপ বললো, পেমা, যাও, যাও, আমি অতিথিকে চা খাইয়ে নিই।

পেমা হাসিমুখে বললো, আমি কিন্তু তোমার বিচারের বিচার চাইবো। আর শাও চি এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে। সেই আমাকে বলেছে তোমার বিচারটা আদৌ বিচারই হয় নি।

থেনডুপ হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, সে হবে, সে হবে। তুমি দরজাটা আগলাও। পেমা চ'লে গেলে থেনডুপ বললো. আমরা সাম্যকে ভালোবাসি। এটা তোমার এতক্ষণ বোঝা উচিত ছিলো। এই ট্রানসমিটারটাকে দেখো। আর ওপাশের কুলুঙ্গিতে হান্ ভাষায় লেখা বই আছে। আমার স্ত্রী হান্‌দের পদ্ধতিতে ভালো রসুন ফলিয়েছে। আর বিদ্রোহ ? তা, হ্যাঁ গিয়াৎসোর সময়েও এরকম বলা হয়েছিলো। তোমার কি জানা আছে সেই লোকনাথের সময়ে কি হয়েছিলো ?

কিন্তু পেমার শান্ত সরাইয়ে বর্তমান কাল এসে পড়েছে। বাইরে ঝড় উঠলে বন্ধ ঘরেও যেমন দমকায় দমকায় শব্দ ভেসে আসে, তেমনি ক'রে অস্থিরতা আর উত্তেজনার দমকা আঘাত এসে লাগছে। ভয়ঙ্কর রাগের চিৎকারে ট্রানসমিটারটা যেন কেঁপে উঠলো। ক্রুদ্ধ হান্ ভাষায় কথা ভেসে এলো। অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে পারতো থেনডুপ শব্দটা কাছের কোনো মোটর থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ট্রানসমিটারটা গোঁ-গোঁ ক'রে বললো, এদিকে একজন লামা পালিয়েছে। লোকটা তথাকথিত প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা। মুক্তিফৌজের দু'জন অফিসার এবং পঁচিশ জন সৈন্যকে হত্যা করেছে সে। তাকে যে লুকিয়ে রাখবে অথবা পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

চূড়ান্ত হতাশায় আগন্তুক স্থির হ'য়ে গেলো। বিড়বিড় ক'রে বললো, আমি, আমি; আমার কথাই বলছে। আমার আর নিষ্কৃতি নেই।

নিঃশব্দে থেনড়ুপ হাসলো। তার হাসিটা কিরণের মতো তার চোখের দু'প্রান্তে স্থির হ'য়ে রইলো খানিকটা সময়। তারপর সে ব'লে গেলো, তোমাকে দেখছি আমাদের পরিবারের কলঙ্কিত নামের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হবে। জুতো খোলো। ওই জুতোজোড়াই তোমাকে ধরিয়ে দেবে। পেমার জুতো দেখো ওই কোণে, মস্তবড়ো আর দেখতেও এমন কিছু সুন্দর নয়, তা হ'লেও ও দু'টোকে প'রে নেওয়া উচিত। ওই তিনশূলী কোদালটা নাও। আমার হাতে ওরকম একটাকে হাঁকড়াতে দেখেই ত্রিশ বছর আগে সেই বেচারা লামা পালাতে গিয়ে খাদে প'ড়ে মরেছিলো। ওতে আত্মরক্ষা আর ছদ্মবেশ দুই-ই হবে। বাইরের বারান্দায় ঝুড়ি বাঁধা বাঁক আছে, দেওয়ালের গায়ে পেমার খড়ের টুপি। তোমার অবস্থায় এ দু'টোকেই আমি সঙ্গে রাখতাম। পথে বেরিয়ে বাচ্চা চমরীর মাথার দিকে চলতে সুরু করো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বাদামী কয়লা কুড়োতে যাচ্ছ। জেনে রাখো মাইল দু'-এক উত্তর-পুবে একটা পুরনো বাদামী কয়লার খাদ আছে। আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবে, হ্যাঁ কলঙ্কের কথাই—তুমি পেমার বাবা। মেয়ের নামটা মনে রেখো—পেমা গিয়াৎসো। বলবে, তুমি থেনড়ুপ গিয়াৎসোর শ্বশুর। পরিবারের ইতিহাসটা জেনে নাও নইলে জেরায় দাঁড়াতে পারবে না। গিয়াৎসোর প্রাণদণ্ড হয়েছিলো ইংরেজ গোয়েন্দাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য। তারই নাতি থেনড়ুপ গিয়াৎসোর ত্রিশ বছরের জেল হয়েছিলো এক বড়োগোছের লামাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয়ার অপরাধে। আর দেরি নয়, আর দেরি নয়···

আগন্তুক নিজের জুতো খুলে পেমার জুতো প'রে ফেললো। থেনড়ুপ তাকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

থেনড়ুপ বললো, আমি হ'লে কিন্তু রাত্রি পর্যন্ত বাচ্চা চমরীর জিভ বেয়ে তার মুখে ঢুকে থাকতাম। কারণ এ দিকটা খুব নির্জন। পথে বেশি লোক চলাচল করে না যে তাদের দলে মিশে এগিয়ে যাওয়া যাবে। তা ছাড়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর থেকে দেখতেও পাওয়া যায়।

মাটিমাখা তিনশূলী কোদাল নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো বিচারক লামা।

দরজার ভেতর থেকে চাপা গলায় বললো থেনড়ুপ, বেরিয়ে পড়ো। বাঁকটা কাঁধে নাও। টুপিটা মাথায় চেপে বসাও। চাষীদের স্বরে কথা বলো। মনে রেখো তুমি পেমার বাবা।

অনেকক্ষণ গল্পটা হ'লো। অনুমান করছিলুম এবার বোধ হয় লোকনাথের

দধিকর্ণ সম্বন্ধে কিছু শোনা যাবে। কারণ তখন বেলা দুপুর, আহারের পরে এখন পেমার বাড়িতে বিশ্রামের সময়। সর্বাঙ্গ দিয়ে দিনের আলোর উত্তাপটাকে গ্রহণ করার ভঙ্গিতে থেনডুপ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকে। মোটর গাড়ি, ট্রানস্‌মিটারের শব্দে আগন্তুকের ব্যাপারটাতে যে আলোড়ন উঠেছিলো তা পেমার হারিয়ে-যাওয়া সরাইখানার মতো এই বাড়িটাকে অতিক্রম ক'রে চ'লে গেলো এমন ধারণা হয়েছিলো। বায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভ যেমন শান্ত সমুদ্রের তুলনায় নগণ্য, এই আধুনিক সময়ের ঝড়কেও পেমার বাড়ির অনন্ত সময়ের তুলনায় তেমন কিছু হবে বলেই অনুমান হ'লো।

কিন্তু হঠাৎ পেমা বাইরের বারান্দায় হাততালি দিয়ে উঠলো। তার বাড়ির সামনে একটা জঙ্গী দ্বীপ সত্যি উঠে আসতে পেরেছে আর তা এমন সহজে যে পারবে তা আগে থেকেই যেন ঠিক করা ছিলো। সেই দ্বীপ থেকে একজন হান্ মেজর আর ছ'জন হান্ সৈন্য লাফিয়ে নামলো। তাদের দেখে অ্যাপ্রিকট গাছটার নিচে চমরীগুলো তাদের দিকে ড্যাব্‌ডেবে চোখে চেয়ে রইলো।

পেমা বললো, দেখো, দেখো, চমরীগুলোও ভয় পায় না। ওরাও নাকি বোঝে। সাম্য এলে ভয় থাকবে না। কি যেন বলো তুমি—

থেনডুপ বললো, পেমা ঘরে এসো। নিজেকে দেখিও না। অপেক্ষা করো। ওদের রীতিনীতি বুঝতে দাও। দু'ঘণ্টা এমন কি বেশি সময়? এখন নিজের মধ্যে নিজেকে ধ'রে রাখো।

থেনডুপের কথা মেনে আমরাও গল্পটাকে নীরবতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারি। যদিও সে নীরবতা পেমার বাড়ির অভ্যস্ত নীরবতা নয়, বরং অন্য এক দৃশ্যে যেন আলোড়নটাই এসে পড়েছে যা পেমার বাড়ি পার হ'য়ে গেলো ব'লে ভুল হয়েছিলো।

সৈন্য নিয়মমাফিক মাপাজোখা পথে চলে : ইতিমধ্যে দু'জন পেমার বাড়ির ছাদে ট্রানসমিটারের উঁচু শুঙ্গ তুলে দিয়েছে, অ্যাপ্রিকট গাছটার নিচে চমরীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে রান্নার যোগাড় ক'রে নিয়েছে দু'জন, বাকি দু'জন বাড়ির চারিদিকে সরজমিনে তদন্ত করছে। রাইশাকের কচি-কচি পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খেলো তারা, শুকিয়ে-আসা রসুন গাছগুলোকে উপড়ে উপড়ে তুলে কাঁচা রসুনগুলো খেতে লাগলো। একজন ভাতের দলা বার করলো ঝোলা থেকে রসুনের সঙ্গে খাওয়ার জন্তে। জানলা দিয়ে তা দেখে পেমা হেসে বাঁচে না। একদল শিশু যেন অথচ দেখতে কতবড়ো জোয়ান। কিন্তু হঠাৎ হাসিটা মুছে গেলো পেমার মুখ থেকে। একটা বাচ্চা শুয়োর খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। ওদের এক-

জন রাইফেল তুলে ধরলো। এক ঝলক আগুন, দুম ক'রে একটা শব্দ, কিছু ধোঁয়ার সঙ্গে একটা করুণ আর্তনাদ। বাচ্চা শুয়োরটা পা ছুঁড়তে লাগলো ক্ষেতের ধারে। আর ঠিক তখনই কিনা পেমা ভেবেছিলো জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ওদের ছেলেমানুষি রসুন খাওয়াকে উৎসাহ দেবে। মুখে একটা ব্যথার চিহ্ন নিয়ে পেমা স'রে এলো জানলা থেকে—বাচ্চা শুয়োরটাই যেন ব্যথায় থরথর করছে পেমার হৃৎপিণ্ডে।

এদিকে বাইরের বারান্দায় থেনডুপের সঙ্গে কথা বলছে মেজর। থেনডুপ আর সে মুখোমুখী দু'টো জলচৌকিতে। থেনডুপের মুখে একটা হাসি দেখা দিয়েছে—স্থির উজ্জ্বল একটা হাসি। সে কিছু ভাবছে, আর ভাবনাটা অত্যন্ত সুন্দর কিছুর, যেন তা কিরণ হ'তে পারে। পেমা দরজার ফাঁকে চোখ রাখলো। তার মুখ থেকে ব্যথার চিহ্নটাও চ'লে গেলো ; ব্যথার দরজা দিয়েই সুখ আসে অনেক সময়।

মেজর তখন তার টুপিটা খুলেছে—সুন্দর চকচকে চুলগুলোকে অনাবৃত ক'রে। পেমার মনে হ'লো এই হান্ মেজরের মতো এমন সুন্দর আর কাউকে সে দেখেনি। মুখের দিকে চেয়ে দেখো, বিদ্বেষ নেই, ভয় নেই। অমিত কারুণ্যে··· । ঠিক বলেছে থেনডুপ। সাম্য না এলে বিদ্বেষ যায় না, বিদ্বেষ যতদিন ভয় ততদিন থাকবেই। আর একথাও ঠিক যে থেনডুপ তার ঠাকুরদা গিয়াৎসোর মতো নতুন কিছুকে চিনে নিতে পারে। হ্যাঁ সাম্যের কথাই বলছে তারা।

গিয়াৎসোর স্ত্রী নিশ্চয় নিজের ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছিলো, নিজের পোশাকও যখন লোকনাথকে নিয়ে ফিরে এসেছিলো গিয়াৎসো আর রিম্পোচে লামা। সেটাই স্বাভাবিক নয়? আর বোধ হয় তারও তা করা উচিত, কারণ এখনই হয়তো থেনডুপ তাকে মেজরের জন্য চা নিয়ে যেতে বলবে।

তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে কাঠের তোরঙ্গটা খুলে সিল্কের জামা আর ব্রোকেডের পেটিকোট বার ক'রে পরলো পেমা। সেই কবে বানিয়েছিলো মাখন-উৎসবে পরার জন্যে, আজ পর্যন্তও পরার সুযোগ আসেনি। কিন্তু আজকের মতো উৎসব আর কি হয়? রান্নাঘরের চুল্লিতে আরও কিছু ঘুঁটে দিয়ে চায়ের হাঁড়িটা চাপালো তাতে।

আবার পা টিপে টিপে দাঁড়ালো সে দরজার এপারে, কান রাখলো দরজার ফাঁকে। আবার চোখ পড়লো তার মেজরের মুখের ওপর। রোদে ঘুরে ঘুরে সে মুখটা একটুবা লাল। কপালের ওপর ঢেউ খেলানো চুল, টানা চোখ দু'টোতে যেন স্বপ্নের আবেশ। হঠাৎ একটা সলজ্জ সুন্দর অনুভূতি পেমার বুকের মাঝখানটাতে জেগে উঠলো ; আহা, তার যদি কোনোদিন ছেলে হ'তো হয়তো এমনটাই হ'তো

সে এতদিনে। কিন্তু কোনোদিনই সে ছেলেকে আদর করতে পারেনি, কি ক'রে তা করতে হয় তা কি সে জানে?

এরপরে চা নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো থেনডুপ। পেমা তো প্রস্তুতই ছিলো। চা নিয়ে গেলো পেমা, থেনডুপ তখন মেজরের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলো।

প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে মেজর ব'লে গেলো সাম্যের কথা, আর অবাক হ'য়ে শুনলো পেমা আর থেনডুপ, সাম্য এলে বিদ্বেষ আর থাকবে না। কেউ কাউকে হিংসা করার কারণই খুঁজে পাবে না; অন্যায় অবিচার আর থাকবে না; ভয় কোথায় তখন? সে তখন নরকে, যদি নরক ব'লে কিছু থাকে। এই ব'লে অফিসারটি হাসলো। আর পেমার তখন মনে হ'লো একেই বোধ হয় সর্বাঙ্গসুন্দর বলে।

পেমা বললো, আগে যে সব অন্যায় হয়েছে তার শিকড়ও তোমরা তুলে ফেলতে পারো?

হবে, কমরেড, তাও হবে! শুধু বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা হবে না, যেমন ধরো যে লামা এদিকে পালিয়েছে তাকে কিম্বা তাকে যে আশ্রয় দেবে তাকে ক্ষমা করা হবে না।

দুপুর পার হ'য়ে এখন বিকেল। রান্না শুরু করেছে পেমা। যত রকম রান্না সে জানে, সাধ্যমতো তা সবই করবে। জীবনে এতটা পরিপূর্ণ সুখ কি সে পেয়েছে? বর্তমান ভবিষ্যৎ সার্থক। ইতিমধ্যে শীতের তুষারেও পাকে এমন যবের কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েছে সে এক অবসরে। আর মেজর আশ্বাস দিয়েছে সে সবই আসবে। আর অতীত? তারও ন্যায় বিচার হবে।

ততক্ষণে বাড়ির ছাদের শৃঙ্গ থেকে তার এসেছে ট্রানসমিটারে। নিচে অ্যাপ্রিকট গাছের তলায় সৈন্যদের রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে। মেজর দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে বসলো। এটা ঠিক একটা ক্যাম্প হেড্ কোয়ার্টার্সের মতোই —এই সরাইখানা।

থেনডুপ বললো মেজরকে, সে একবার বাইরে যাবে পারিবারিক প্রয়োজনে। কমরেড মেজর যেন এ বাড়িকে নিজের বাড়ি ব'লেই মনে করে। পেমা রইলো। সে কমরেডের সুখ সুবিধার সব ব্যবস্থাই ক'রে দেবে। পুবদেশী মেয়ে, সে অফিসারের ভাষা শুধু বলতে পারে না, পড়তেও পারে।

পেমা স্বীকার ক'রে মাথা দোলালো খুশিতে।

পেমা একটা রান্না শেষ ক'রে আর একটা রান্না চড়ালো। থেনডুপ চিন্তা করতে বসলো রান্নাঘরের সামনেই। চিন্তায় যেন অতীত আর বর্তমানকে সে

একত্রিত করছে।

যবের গুঁড়ো ঠাসতে বসেছিলো পেমা। কিন্তু হাত দু'টোকে থামিয়ে হাসি-হাসি মুখে কিছু ভাবলো সে, তারপর খানিকটা মাখন নিয়ে নিচে নেমে গেলো যেখানে সৈন্যরা রান্না করছে। কোমর ভাঁজ ক'রে ঝুঁকে প'ড়ে দাঁড়িয়ে তাদের রান্নার তদারক করলো। ভাঙা-ভাঙা হান্ ভাষাতে বুঝিয়ে দিলো রান্নায় মাখন দেয়ার কথা। আব হাসলো ওদের আনাড়িপনায়। যেমন তরতর ক'রে নেমে গিয়েছিলো তেমনি হিল্লোল তুলে সে ফিরলো রান্নাঘরের দিকে। থমকে দাঁড়ালো। একেবারে অবাক হ'য়ে গেলো। তার বাড়ির ছাদে মস্ত একটা গুল্ফ লাগিয়েছে দেখে, আর তার পাশেই একটা লাল পতাকা। টকটকে লাল। গিয়াৎসোর সাইমিয়া ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেলেও এত গভীর লাল দেখায় না। লালের জমিতে কি একটা আঁকাও আছে বটে। অবাক, অবাক, লালের মধ্যে ফুটে ওঠা সোনালি ফুল যেন। আচ্ছা। দাঁড়াও, থেনডুপকে বলবে সে এদিকেও দেখো গোলাপী ফুল সোনালি হ'য়ে উঠছে।

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো পেমা। তার ছ'ফুট উঁচু শরীরে স্বাস্থ্য যেন আনন্দের জোয়ার তুলছে এখন। খুশি, খুশি, এমন খুশি সে আর কবে হ'তে পেরেছে। মেজরের সামনে এসে মাথা নুইয়ে সে বললো, যেমন নাকি অভিজাত রমণীরা ক'রে থাকে ব'লে সে শুনেছে, চা, একটু চা আর?

ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে চা ক'রে আনলো পেমা আবার।

মেজর হাসিমুখে বললো, তোমার বাটিও নিয়ে এসো। বেশ লাগছে এই বিকেল।

মুখোমুখী চা নিয়ে বসলো পেমা আর মেজর। দেখো, একেই তো সাম্য বলে, মনে মনে বললো পেমা। সে এক সামান্য চাষীর মেয়ে আর এ এক মুক্তিফৌজের মেজর। ভাবতে না ভাবতে পেমা ব'লে ফেললো, তোমার মতো শান্ত, সুন্দর কেউ হয় কল্পনাই করিনি, দেখা দূরে থাক। তোমার গালে কি একটু হাত বুলিয়ে দেয়া যায়?

মেজরের ঘাড়, গলা লাল হ'য়ে উঠলো তা শুনে।

পেমা ভাবলো: সময়ে তার ছেলে হ'লে সে এতদিনে এমনটাই হ'তে পারতো, আর সে অনেকদিন পরে ফিরে এলে এমন ক'রেই আদরের কথা বলতো সে। চা শেষ ক'রেই আবার রান্নাঘরে গেলো সে। কত রান্নাই সে করবে। এমন উৎসব যে তার জীবনে আসবে তা কে জানতো?

অদ্ভুত শান্ত, স্তব্ধ এই বাড়িটা। বর্তমান তো এসেই পড়েছে, তবু তা যেন

থিতিয়ে যাচ্ছে কোনো কিছুর প্রভাবে, স্রোত হ'য়ে বইতে পারছে না। বিকেলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দিন। তার এক বিশেষ নীরব প্রভাব যেন। শুয়োরগুলো, চমরী কয়েকটিও ডাকছে না। নিচে ওরা রান্না করতে করতে কথা বলছে হয়তো তার শব্দও কানে আসছে না। যদিও ধোঁয়ার সঙ্গে তৃপ্তিদায়ক আহারের সুগন্ধ ভেসে আসছে কখনো। চমরীগুলো তাদের কাছেই শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে যেন ঘুমের ঘোরে। এ শান্তি, যাকে অবিদ্বেষ বলে, এই তো সমতা, যাকে সাম্য বলে।

মেজর উঠে দাঁড়ালো। যেন এই কবোষ্ণ স্নিগ্ধতাকে আর একটু অনুভব করার জন্যই বাড়ির ভিতর দিকে চ'লে এলো সে। পিছন দিকের সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। পড়ন্ত রোদে ঘুমন্ত একটা রাইশাকের ক্ষেত। আশ্চর্য শান্তি এই বাড়িটাতে। মনে হয় দু'মাইল দূরে কোনো ঝিঁঝিঁ ডাকলেও এখান থেকে শোনা যাবে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যায়। বুগ-বুগ ক'রে একটা ক্ষীণ শব্দ উঠছে কোথায়। কিছু ফুটছে রান্নাঘরে। সেদিকেই এগিয়ে গেলো সে।

হঠাৎ মেজরের চোখে পড়লো মধ্যের ঘরের জলচৌকির পাশে নতুন একজোড়া দামী রাইডিং বুট। কেউ মাত্র দু'একবার ব্যবহার করেছে। বেশ সৌখীন তো? মেজরের মুখে হাসি ফুটলো যেন। নিজের পা জুতো জোড়ার পাশে রেখে দেখলো, না বড়ো হয়। থেনডুপ কি এমন জুতো পরতে পারে? না। তা হ'লে এটা ওই মেয়েমানুষটার। কি চেহারা। এমন ছ'ফুট চেহারার মেয়েমানুষ হয় নাকি? সৌখীনও আছে খুব, পোশাক দেখছো না? চাষীদের মতো বদ গন্ধও নেই গায়ে। আর চলাফেরা দেখছো? ঢেউ উঠছে না? মেজরের গালের পাশ দু'টো লাল হ'য়ে উঠলো। রান্নাঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখলো সে। উনুনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে রান্না করছে পেমা। তার সুগঠিত কিছুবা স্থূল নিতম্বই চোখে পড়লো মেজরের।

মেজর ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে বাইরের বারান্দায় বসলো আবার। কাঁধ থেকে ফিতে সমেত বাইনোকুলারটাকে খুলে রাখলো পাশে। সরু একটা হাতে পাকানো সিগারেট ধরালো। তা যাই বলো, ভাবলো সে, চারিদিকে অনুর্বর পাহাড় হ'লেও আবহাওয়াটা আরামদায়কই বটে। খুব কষ্ট হবে না এদেশে থাকতে। আর একেবারেই অনুর্বর বলাও যায় না। রাইশাকের ক্ষেতটাই তার প্রমাণ। ওখানে ওই রাইশাক জন্মানো সহজ ব্যাপার না হ'লেও, ভালোই হয়েছে। বাইরে থেকে যে কর্কশ ও রুক্ষ তার মধ্যে উর্বরতা লুকিয়ে থাকে। তিন-চার দিন আগে তার ইউনিটের পোলিটিক্যাল অফিসার বলছিলো বটে চারদিকের প্রতিকূলতার মধ্যে এদের এখনও নির্বংশ হ'তে দেখা যায়নি, যদিও এদের অর্ধেক

পুরুষই যৌবন আসবার আগেই সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়। বাধাও দিচ্ছে এরা। তা থেকে বুঝতে পারা যায় কোথাও এদের নতুন হ'য়ে ওঠার মতো শক্তি লুকানো আছে। অবশ্যই পোলিটিক্যাল অফিসার এদের জাতের প্রশংসা করছিলো না। সিগারেটে টান দিলো মেজর। মুক্তিফৌজের অফিসার হ'লে কিছুটা তাত্ত্বিক হ'তে হয়। সে রকম চিন্তার অভ্যাস রাখতে হয়। মেজরের মন তত্ত্বে পৌঁছে গেলো : মানে, ওই রাইশাক ফলিয়েছে এই মেয়েমানুষটাই যদিও তার স্বামীকে দেখে সন্ন্যাসীর চাইতে অপটু মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এদেশের অর্ধেক পুরুষ সন্ন্যাসী হ'য়ে গেলেও এদের দেশের চাষী মেয়েদের মধ্যে জাতের উর্বরতা লুকানো আছে। আর সে জন্যই নতুন হ'য়ে থাকছে, পুরনো হ'য়ে মরছে না জাতটা। তা দেখো, এ বাড়ির এই মেয়েমানুষটাকে। উর্বরতায় কোনো সন্দেহ আছে ?

আর ঠিক তখনই সিদ্ধমাংসে রসুন আর সিমের বিচি ছেড়ে দিয়ে পেমা আবার বাইরে এলো। এখন ওটা কিছুক্ষণ ফুটবে, সেই অবসরে কিছুটা ভেবে নেওয়া যায়। সে যে কিছু ভাবছিলো তা বোঝা গেলো। চিন্তাটা তার মুখে হাসি হ'য়ে ফুটেছে। থেনডুপের বিচারের বিচার হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এখন মনকে এই নতুন দিনের আলোকে আর একটু প্রসারিত ক'রে দেখা যায়।

মেজরের সামনে গিয়ে বসলো পেমা, বললো, আমি কি ভাবি তা বলতে পারি। শাও চি বলেছে তোমাদের আর আমার ভাবনায় অনেক মিল আছে।

মেজর বললো, বলো।

পেমা বললো, শরীরই সব। আমি যা দেখি, যাকে হাতে ধরতে পারি, তাকেই বিশ্বাস করি। যার শরীর নেই, তার কিছু নেই।

মেজর যেন লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

পেমা বললো, চমরী, খচ্চর, মাটি, পাথর সব কিছুরই শরীর আছে।

ও তুমি বোধ হয় বস্তুতন্ত্রের কথা বোঝাতে চাইছো। আমি বুঝতে পারি নি। মেজর একটা দমবন্ধ করা কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠলো।

পেমা নির্ণিমেষে মেজরের দিকে চেয়ে রইলো। এত সুন্দর! সাম্য ছাড়া এমন সুন্দর মানুষ হয় না। কিম্বা সাম্যের মানুষ বলেই এত সুন্দর লাগছে। কারণ সাম্য মানেই অক্রোধ আর অভয়।

পেমা বললো, এটা কি, চশমা?

না, কমরেড, বায়নোকুলার, দূরের জিনিস দেখা যায়।

দেখি, দেখি। একজন যুবতীর মতো কৌতূহলে খুশিতে তরল হ'য়ে উঠলো পেমা।

এই দু'টো ফোকরে চোখ লাগিয়ে দেখো।

দূরের কিছু দেখবার জন্য পেমা বারান্দার ধারের প্যারাপেটের কাছে উঠে গেলো। বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে বললো, নিচে ওদের রান্না স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কমরেড, তুমি কিছু শেখোনি। মেজর হো-হো ক'রে হাসলো। সে উঠে গিয়ে পিছন থেকে বায়নোকুলারটাকে পেমার চোখের সামনে ধ'রে বললো, দেখতে পাচ্ছো?

পেমা উল্লসিত হ'য়ে উঠলো, বা, বা, ওরা ওখানে।

কি হ'লো, কারা? মেজর কমরেডের মতো সান্নিধ্যে এসে ঝুঁকে প'ড়ে বায়নো-কুলারের মধ্যে দেখতে গেলো।

থেনডুপ, থেনডুপ। ওখানে গিয়াংসোর গাছের কাছে। ঝর-ঝর ক'রে হেসে উঠলো পেমা।

থেনডুপ, মানে তোমার সেই বেমানান পুরুষ? তা সে ওখানে কেন? দেখি, দেখি। বায়নোকুলার নিজের হাতে নিয়ে তাতে চোখ রাখলো মেজর।

তার মুখে তখন একটা বিচিত্র বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। ফিরে দাঁড়িয়ে সে পেমার মুখের দিকে চাইলো। এমনভাবে সে ইতিপূর্বে পেমাকে যেন দেখেনি। যেন তন্ন-তন্ন ক'রে দেখছে। হঠাৎ যেন গলার কাছ থেকে ছলাৎ ক'রে খানিকটা রক্ত উঠে কানের গোড়া পর্যন্ত লাল ক'রে দিলো পেমার। সে তখন রান্নাঘরের দিকে ছুটে পালালো।

আর মেজর তখন বায়নোকুলার তুললো চোখে আবার। অনেকটা সময় ধ'রে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে দেখলো। তার মুখে নানারকমের ছায়া পড়তে লাগলো। তারপর সে সৈন্যদের ডেকে নিয়ে নিচুগলায় কি পরামর্শ করলো, কিছু নির্দেশ দিলো।

মেজর আবার বাড়ির মধ্যে চ'লে এলো। অদ্ভুত সেই নিস্তব্ধতাই আবার তার স্নায়ুকে স্পর্শ করলো, কিন্তু এবার সে স্পর্শ যেন তাকে চমকে চমকে দিলো। এটাই তো স্বাভাবিক। নিয়তই এই পৃথিবীতে একটা দ্বন্দ্ব থেকে যাবে। অথচ নিস্তব্ধতার মায়ায় যেন তার স্নায়ুগুলো এক কবোষ্ণ স্থিতিশীলতায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। যেন জীবনের কোনো একটি মুহূর্তও নির্দ্বন্দ্ব হ'তে পারে। যেন থেনডুপ আর পেমা সাম্যকে প্রশংসা করেছে বলেই তাদের বিশ্বাস করা যায়। মেজর হাসলো মিটমিট ক'রে। কেশে গলা সাফ ক'রে সে হাঁকলো, এই, শোনো।

পেমা বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

মেজর ইতিমধ্যে মনস্থির ক'রে ফেলেছে, বললো, এই জুতো জোড়া কার ? এই দামী চামড়ার নতুন রাইডিং বুট ?

তুমি চাও, কমরেড ? পেমা কোমল ক'রে বললো, নাও, তুমি তা হ'লে।

এটা কার জানতে চাইছি। হাসির আড়ালে দাঁতগুলো একটুবা কিড়মিড় করলো মেজরের। এখানে আর কে থাকে ?

আমি আর থেনডুপ।

অথচ এ জুতো জোড়া তোমার নয়, থেনডুপের তো নয়ই। আচ্ছা যাও। সতর্ক পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো মেজর। একটু পরেই সে আবার হাঁক দিলো, এই শোনো, শুনে যাও।

সে যে নিজের আবিষ্কারে খুশি হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি ? কারণ এই আবিষ্কার আর একবার পৃথিবীর সব কিছুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব প্রমাণিত করেছে। পরে এক সময়ে এ বিষয়ে সে তার ইউনিটের পোলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলবে।

পেমা এবার একটু চিন্তিত মুখেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। কোথায় গেলো থেনডুপ ?

মেজর বললো, তোমাদের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র আছে ? অবাক হ'য়ে গেলে ? এই ধরো এই রিভলবারের মতো ছোটো কিছু ? মেজর বিড়বিড় ক'রে বললো, এ মাগী বোধ হয় জানে না বায়নোকুলারে আমি কি দেখেছি।

পেমা এবার হাসতে পারলো। বললো, না মেজর। কোদাল কাস্তে ছাড়া কোনো অস্ত্রই নেই।

আচ্ছা যাও।

কিন্তু ভাবলো মেজর : চেহারায় যতই শক্তসমর্থ হোক মেয়েমানুষ বই তো নয়। ভয়ের কি আছে। যদিও সে বিশ্বাস ক'রে অদ্বান্দ্বিক কাজই করেছিলো। অবশ্য শোবার ঘরটা দেখা হয়নি। ওদিকের নিস্তব্ধতা যদিও ভয়ের মতো স্নায়ুগুলোকে স্পর্শ করে। নিঃশব্দে পায়ে পায়ে মেজর শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

ভাবলো সে, পোলিটিক্যাল অফিসারের এই তত্ত্বের কথাও মনে রাখতে হবে—এই দেশে যেখানে অর্ধেক পুরুষই সন্ন্যাসী হ'য়ে যায় আর অর্ধেকের বেশিই অনুর্বর পাহাড়, সেখানে জাতটা পুরানো হ'য়ে একেবারে ম'রে না গিয়ে থাকে যদি তবে বুঝতে হবে এ দেশের রুক্ষ মাটিতে আর এই রকম সব কর্কশ চেহারার মেয়েমানুষদের মধ্যে উর্বরতা আর প্রাণশক্তি কোথাও লুকানো আছে। অর্থাৎ তা হ'লে মুক্তির পথে এরাই বাধা হবে।

বিছানা উল্টে ফেলে খুঁজলো মেজর। হেঁট হ'য়ে চৌকির তলায় দেখলো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো দেয়ালে। নিমেষে যেন তার স্নায়ুগুলো লোহার স্প্রিং-এর মতো ঝলকে উঠলো। হাসিমুখে সে বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ প্রমাণ হয়েছে। তাত্ত্বিক হিসাবে সে নাম করতে চায় না, কিন্তু তত্ত্বের সার্থকতার একটা প্রমাণ সে সংগ্রহ করেছে।

শোনো, এই মাগী শুনে যাও। হৃষ্ট কণ্ঠে হাঁক দিলো মেজর।

রান্নাঘর থেকে পেমা আবার বেরিয়ে এলো। হেসে বললো, তোমাকে বলতে পারি ও জুতো কার।

এখনই জানতে পারবো। তা হ'লে তোমাদের বাড়িতে অস্ত্র নেই, কোদাল-কাস্তে ছাড়া ?

অন্য অস্ত্র দিয়ে আমরা কি করবো ?

ডান হাত দিয়ে নিজের রিভলবারের মুঠোতে হাত রেখে বাঁ হাতে পেমার ব্লাউজের কলার চেপে ধরলো মেজর। টানতে টানতে নিয়ে গেলো শোবার ঘরে। দেয়ালের দিকে দেখিয়ে দিলো।

ওটা কি ? কার ওটা ?

মেজর ভাবলো : বিশ্বাস মানেই স্থিতি, থেমে যাওয়া। আর থেমে যাওয়াটা সাম্য নয়। হাসিটা লক্ষ্য করেছিলো? হাঁ এখানেই মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের প্রতিপক্ষ এই শক্ত চেহারার নারী। বলো ওই পিস্তল কার ? মেজর ঘুরে দাঁড়ালো।

ভয়ে, লজ্জায়, টানাটানিতে পেমা বেদম হ'য়ে উঠেছিলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ছাড়ো ছাড়ো। বলছি ওটা কার।

পেমা জোর ক'রে ছাড়াবার চেষ্টা করলো, আর তার ফলে তার সিল্কের ব্লাউজের অনেকটা ছিঁড়ে গেলো।

বলো কার ? মেজর তাত্ত্বিকের শান্তভঙ্গির নকল করার চেষ্টা করলো।

ওকে অস্ত্র বলো ? ওই মরচে-ধরা ওটাকে ? পঁচাত্তর বছর ধ'রে যেটা দেয়ালেই আছে ? হাঁপাতে হাঁপাতে তবু আর একবার হাসলো যেন পেমা।

বেশ, মেজর আড়াআড়ি প্রশ্ন করলো, আর থেনডুপের সঙ্গে যাকে দেখলাম ?

থেনডুপের সঙ্গে ? কখন দেখলে ?

তা হ'লে আছে একজন স্বীকার করছো ?

কই, আমি—থতমত পেমা থেমে গেলো। ভাবলো সে থেনডুপ হঠাৎ পারিবারিক কারণ ব'লে গেলোই বা কেন ? সে কি সেই হতভাগা লামাটার খোঁজে গিয়েছে ?

পেমার এই চিন্তা তার চোখে মুখে দ্বিধা, আশঙ্কা গোপন করার ইচ্ছা হ'য়ে ফুটে উঠলো। একটা প্রতিরোধ সম্ভবত তার দেশের ঠাণ্ডা পাহাড়গুলোর ভাবলেশ-হীন নৈর্ব্যক্তিকতার ছাপ তার মুখে ফুটিয়ে তুললো।

কি কথা বলছো না? অধীর মেজর বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁসি মারলো পেমার চিবুকে। বলবে? বলবে?

টলতে টলতে পেমা স'রে যাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু চৌকির পায়ায় পা বেধে সে কোণটাতেই ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লো।

ওঠ্‌, শয়তান মাগী। মেজর ব্লাউজের সামনেটা ধ'রে টেনে তুললো পেমাকে। একজন অফিসার যখন কথা বলে তখন পা ছড়িয়ে বিছানায় শোয়ার সময় নয়। ওঠ্‌, ওঠ্‌, বল্‌, থেনডুপের সঙ্গে ওটা কে? কার জুতো ঘরে? ওটা কার পিস্তল? এই ইংরেজি মদের বোতল কার?

পেমা ভাবলো: এটা কেমন ব্যাপার হ'য়ে যাচ্ছে না? থেনডুপ যা খুশি করুক তাতে ওর কি? এই সামান্য ওজনের লোকটা কি তাকে এমন ক'রে ভয় দেখাবে, অপমান করবে?

পেমার পুরুষালি চোয়াল কঠিন হ'য়ে উঠলো।

আর মুক্তিফৌজের মেজর ভাবল: এই শক্ত চেহারার মেয়েমানুষটার সঙ্গে একা মোকাবিলা করতে সে পারবে কি? মেয়েমানুষ নয় যেন মেয়েদৈত্য। আর তা হ'লে আক্রমণের প্রথম সুযোগটাই তার নিজের নেয়া উচিত। তখনই আবার ঘুঁসি মারলো মেজর, এবার পেমার রগে।

ঘুঁসির ধাক্কা বিছানার উপরে ফেলে দিলো পেমাকে। চিৎ হ'য়ে পড়েছিলো সে, চৌকির রেলিং-এ শব্দ ক'রে মাথাটা ঠুকে গেলো। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় ক'রে উঠলো। নিমেষে সব কিছু যেন মুছে গেলো চোখের সামনে থেকে।

মেজর রিভলবার খুলে এগিয়ে গেলো। সে যে রাগে ক্ষেপে গেছে তা তার হাঁ-করা মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। একটা কালো বিদ্যুৎ-শক্তি যেন অনুভব করলো সে। কঠোর ঊষর পাহাড়ের নিভৃতে এই দেশের যে প্রাণশক্তি তাকে যেন অনুভব করা যাচ্ছে। তাকে কলঙ্কিত করাই এ জাতির প্রাণশক্তিকে আঘাত করার সব চাইতে সহজ উপায়।

আবার যেন পেমার ভারি দেহটাকে টেনে তুলতে গেলো সে, কিন্তু তখনই হয়তো পেমার উজ্জ্বল ত্বক চোখে পড়লো তার, কিম্বা পেমার ছড়ানো পা দু'খানা। তীব্র কালো অন্ধ আক্রোশে মেজরের তত্ত্ব আর অনুভূতি এক হ'য়ে গেলো, আর তখন তার দু'হাতের নৃশংসতায় পেমার পেটিকোট ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো।

ঘরটা অন্ধকার বোধ হ'লো পেমার। ক্লান্তি, ব্যথা, সে কি অসুস্থ? কবে অসুস্থ হ'লো সে? হাতটা তুলে বুকের উপর রাখলো সে। সে কি এতক্ষণ একটা কুকুরের স্বপ্ন দেখছিলো? ঠিক যেন শুয়োরকে কামড়াচ্ছিলো কুকুর। ক্যাঁ-ক্যাঁ ক'রে যেন কে চেঁচাচ্ছিলো। তারপর সব যেন ভয়ে আর বোধ হয় নেশাতেও আচ্ছন্ন অসাড় হ'য়ে গিয়েছিলো। সেই ইংরেজি ভিস্কির বোতল খালি করার পর যেমন হয়েছিলো। কিন্তু কুকুর? হঠাৎ মনে পড়লো একটা হাঁ-করা কুকুর যেন তার গলায় কামড়াতে চাচ্ছিলো আর আচ্ছন্ন হওয়ার আগে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলো। তার মুখেও যেন কুকুরটার লালা লেগে আছে। হাত দিয়ে মুখের লালা মুছতে গিয়ে উহু উহু ক'রে উঠলো পেমা। হাতটাকে চোখের সামনে আনলো সে। রক্ত? তখন একমুহূর্তে যেন ঘোরটা কেটে গেলো। রক্ত, তার রক্ত? বিছানা থেকে এক ঝটকায় ধনুকের বাঁশের মতো উঠে পড়লো সে। নিজের জামা পেটিকোটের দিকে চেয়ে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। কিন্তু এবার? প্রথম কাজ নিশ্চয়ই এসব বদলে নেয়া। জামা বদলাতে বদলাতে হঠাৎ তার হাত থেমে গেলো। তারপর? তারপর, তারপর? দরজা খুলে বাইরে যেতে হবে তো? আর তা কি এর পরে যাওয়া যায়? তাই তো! রান্না চড়ানো আছে। কিন্তু— : এখন থেনড়ুপকে দরকার। তার সঙ্গেই পরামর্শ করা দরকার। থেনড়ুপ, কোথায় গেলো থেনড়ুপ? তাকেও কি কুকুর—

পোশাক বদলে দৃঢ় পায়ে পেমা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। হ্যাঁ, তার পা দুখানা যথেষ্ট দৃঢ়। বৃথাই সে দু'মণ জল আধ মাইল তুলে আনে না। এবার একটু সতর্ক হতে হবে। চৌকির পায়ায় পা বাধলে চলবে না। আর নিজের বাড়িতে কে কুকুরের কামড় সহ্য করে? আবার চিবুকে হাত ছোঁয়ালো সে। হাতের তেলোয় আবার রক্ত লেগে গেলো। কঠোর কঠোর কঠোর হ'য়ে উঠলো পেমার চোয়াল। আচ্ছা তখন কেন বুদ্ধি এলো না! পেমা দরজাটাকে একটু ফাঁক ক'রে দেখলো। তখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিলো না? সব যেন হঠাৎ নিবে গিয়েছিলো, তারপর তার মনে হ'লো সে যেন শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও। যেন দেখতে পাচ্ছিলো একটা কুকুর হাঁ ক'রে তাকে কামড়াতে গিয়ে লালায় তার মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে; আর তার গলার মধ্যে অব্যক্ত কান্নায় কে যেন কাঁদছে। যেমন দড়িতে বাঁধা অসহায় শূকরী করতে পারে। আর তা সবই যেন পাশে থেকে সে দেখছে নিজে।

দরজার বাইরে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়ালো। সে কি সেই প্রবাদ? উত্তুরে কুকুর আর চিল্লানি শূকরী।……

রান্নাঘরের পরিচিত গন্ধ এলো নাকে। দুই ফুসফুস ভরে সে নিঃশ্বাস নিলো।

তাতে তার সবল পুষ্ট দেহের শিরাগুলো যেন স্ফীত হ'য়ে উঠলো। না, এসব প্রবাদ সে মানে না। ছাই। কিন্তু এখন থেনডুপকে দরকার। উত্তুরে ভাষার কথাই ধরো, সে নিজে বারবার পড়েও কিছু বোঝে না; রস্থনের কথা ছাড়া আর কিছু কি বুঝেছে? থেনডুপ পড়তে পারে না, কিন্তু শোনামাত্রই বোঝে। থেনডুপকেই দরকার।

শয়তান। হঠাৎ কথাটা মনে হ'লো পেমার। শয়তান। উত্তুরে কুত্তা। সেই লামাটা বলেছিলো। তার মনের মধ্যে কি যেন একটা রাগ গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো। রান্নাঘরের কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে সে দম নিতে লাগলো। আর সতর্ক হ'য়ে রইলো। আবার?

কিন্তু আশ্চর্য, একেবারে নিঃশব্দ। চ'লে গেলো নাকি? কেন? লজ্জায়? থু থু। পেমা আস্তে আস্তে সারা বাড়িটাই ঘুরে এলো। তার সরাইখানার মতো বাড়িটা একেবারেই নিঃশব্দ। এমন কি যারা রান্না করছিলো অ্যাপ্রিকট গাছটার নিচে— না সেখানে এখনও একজন আছে বটে।

কি করতে পেরেছো? উত্তুরে কুকুর? কি করতে পারো? ভেবেছিলে পেমার এই ছ' ফুট শরীরটা থেঁতলে যাবে। আর থেনডুপের কথা বলে দেবে সে। কিন্তু কোথায় গেলো থেনডুপ? বরং সাবধান ক'রে দিয়েছো। এবার আর জাপটে ধরতে সঙ্কোচ থাকবে না। গলা টিপে ধরবো দু' হাতে। শয়তান।

এরা কি শয়তান সকলেই?

আশ্চর্য। শয়তান আর মিথ্যাবাদী। সেই ইংরেজদের বাণিজ্য-গোয়েন্দার কথা ভাবো। অথচ কে ভেবেছিলো অমন সুন্দর চেহারাটা একটা মিথ্যা?

পেমার কি সাবধান হওয়া উচিত ছিলো না? সেই বায়নোকুলার দেখার সময়েই। সেটাকে হঠাৎ মনে না করলে, তুমি সতর্ক হতে। আর কথায় কথায় সে লাল হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু মিথ্যা কি ধরা যায়? গিয়াৎসোর স্ত্রীও বুধগয়ার জল মনে করেছিলো ইংরেজি চোলাইকে।

কিন্তু থেনডুপ কোথায়? থেনডুপের সঙ্গে ও কাকে দেখেছে? সত্যি কাউকে দেখেছিলো? তা হ'লে সেই হতভাগা লামাটাই। পেমা বারান্দা থেকে ঘরে এলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো মেজর যখন তাকে দ্বিতীয়বার ডেকেছিলো তখন বেরোতে গিয়ে দরজার পাশে ঝোলানো নোনা মাংসের বড় চাংড়াটাকে দেখতে পায়নি বটে। তখনই ভাবতে গিয়ে কারণটাকে প্রায় ধ'রে ফেলেছিলো সে। পেমা রান্না-ঘরে এলো। ঠিক তাই। রস্থনের সেই দ্বিতীয় থোবাটা নেই। আর এই দেখো ছোটো হাঁড়িটাও দেখা যাচ্ছে না।

তা হলে থেনডুপ তাই করেছে ? পেমার মনে পড়লো বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেনডুপ যখন বাড়ির মধ্যে এসেছিলো তখন সে বিড়বিড় ক'রে রান্না আর খাওয়ার কি তুলনা দিচ্ছিলো। বলেছিলো যেন : রাঁধছো তো কিন্তু তাতেই তো সকলের খাওয়া হ'লো না। তা হ'লে থেনডুপ কি সেই লামাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে গিয়েছে ? অন্য সময়ে হ'লে পেমা থেনডুপের এই কথাগুলোকে কি আর কানে তুলতো না ? কিন্তু সাম্যের এই উজ্জ্বল অফিসারের সান্নিধ্যে তার মনে যে কলরব উঠেছিলো তা অন্য সব ভাষাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলো।

বারান্দায় ফিরে এসে পেমা প্যারাপেটের উপর দিয়ে বাচ্চা চমরীকে দেখতে চেষ্টা করলো। দিনের আলো এখন ম্লান হ'য়ে আসছে। সাইমিয়া গাছটার পল্লবগুলোকে নীলের বদলে কালো দেখাচ্ছে। থেনডুপকে ওখানেই বায়নোকুলারে দেখেছিলো পেমা। আর মেজরও দেখেছিলো ; তার সঙ্গে কি লামাকেও ?

ওদিকেই এখন যাওয়া দরকার। সারাদিন ওরা রেডিওতে বলেছে—লামাদের সাহায্য করলে বিপদ হবে। বিশেষ ক'রে এই হয়তো সেই লামা যে দু'জন অফিসার আর পঁচিশজন হান্ সৈন্যকে হত্যা করেছে। তাই কি ? তা কি হতে পারে ?

পেমা জলের হাঁড়ির কাছে গেলো। জল তুলে তুলে চিবুকের রক্ত ধুয়ে ফেললো। কপালে জল দিলো কি না দিলো, মাথায় একটা রুমাল বেঁধে নিলো।

পেমা বাইরের বারান্দা পর্যন্ত এসে সিঁড়ির উপরে বসলো। একটু ভেবে নেয়া দরকার। এখন একেবারে শান্ত হওয়া ভালো। থেনডুপ যেমন কখনও কখনও শান্ত হ'য়ে যায়। গাছটা আবার চোখে পড়লো। ওই সাইমিয়াটাকে—সোজা কথাতেই বলা যাক—এ পরিবার গিয়াৎসো মনে করে। তা হয় না। মানুষ থেকেই মানুষ জন্মাতে পারে, গাছের বীজ থেকে গাছ। ওটা একটা বাজে গল্প যে গিয়াৎসো গাছ হ'য়ে আছে। আর লোকনাথ যাই ব'লে থাক না কেন, কোথায় ভালো পশম পাওয়া যায় সে তার খোঁজই করতো। সে জন্যই এসেছিলো এইদেশে।

হঠাৎ যেন মনকে অভ্যস্ত চিন্তার খাতে এনে ফেললো পেমা। দ্রুত সুসংবদ্ধ চিন্তা ক'রে যেতে লাগলো সে : গিয়াৎসো গাছ নয়। গিয়াৎসো কি রকম তা বোঝা যায়। স্ত্রীর কাছে পশমের কথা, ইংরেজি মদের কথা জানতে পেরেও লোকনাথকে সে ক্ষমা করেছিলো। বিচারের সময়ে লোকনাথের খোঁজ করেছিলো শহরের লামারা। বলেছিলো তাকে ধরিয়ে দিলে তা'রা দু'ভাই হয়তো মাপ পাবে। গিয়াৎসো বলেনি। বললে লোকনাথ মরুকগে যাক ব'লে এদেশ থেকে সে চ'লে যেতে পারতো না। কিন্তু গিয়াৎসো গাছ না হ'লেও, কোনো মানুষকে যদি

গাছ হ'তে হয়, তবে গিয়াৎসোর পক্ষেই তা সম্ভব। আর থেনডুপ যেন গিয়াৎসোর মতোই। না হ'লে সেই বিচারককে হাতে পেয়েও—পেমাকে একেবার চা করতে, একবার গাড়ি দেখতে দূরে সরিয়ে কি কথা হচ্ছিলো তা কি পেমা শোনেনি ?—হাতে পেয়েও থেনডুপ তাকে পালানোর উপায় ব'লে দেয় ? খাওয়ানোর জন্ত জীবন বিপন্ন করে ? গিয়াৎসোর মতোই, কিম্বা, আর কে এমন গিয়াৎসোর কাছাকাছি ? আর গিয়াৎসোর গাছ হওয়ার গল্পের মূলেই সেই মিথ্যাবাদী ইংরেজের চর। অবাক কাণ্ড, চমরীর দুর্গন্ধ সারে যেমন রসালো রসুনগুলো জন্মায় ; সেই নাকি আবার মনে করিয়ে দিয়েছিলো ভগবান বুদ্ধের বাণী আর তা যেমন তাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিলো। লোকনাথায়···অমিতকারুণ্যে···। পেমা উঠে দাঁড়ালো। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। অ্যাপ্রিকট গাছটার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেলো। সে অনুভব করলো মেজর আর তার পাঁচজন সৈন্য নিশ্চয়ই থেনডুপকে খুঁজতে গিয়েছে। বেশ খানিকটা আগেই রওনা হয়েছে তারা। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ালো পেমা। চিন্তা ক'রে নিলো এদিক-ওদিক চেয়ে। গাড়ি ক'রেই গেছে তারা। পাহাড়ি অসমান পথে গাড়ি খুব ছুটবে না, তা হলেও নিচের সড়ক থেকে এখানে উঠতে যখন পেরেছিলো তখন বাচ্চা চমরীর জিভ পর্যন্ত বেশ উঠবে। অন্তত মানুষের চাইতে তাড়াতাড়ি। না, পাকদণ্ডির পথে গেলে হবে না। খাড়াই বেয়ে খাদ টপকে সোজা উঠতে হবে চমরীর জিভে। ওদের আগেই পৌঁছানো চাই যদি থেনডুপকে সাহায্য করতে হয়।

পেমার সামনে একটা বড়ো খাড়া পাথর। লাফিয়ে উঠে পেমা পাথরটার মাথা ধরলো। জিমন্যাস্টের মতো কৌশলে শরীরটাকে টেনে তুললো। খানিকটা ছুটে চললো সে পাথর টপকে টপকে। এ পথটা একেবারে অজানা নয় পেমার, যদিও কেউ চলে না। এখন একটু হাঁপাতে হচ্ছে তা'কে, কিন্তু অনেকটা দূর উঠেও পড়েছে সে। হয়তো একসময়ে, ধরো অতীশের সময়ে, এই খাড়াই—এটাই পথ ছিলো, পরে ভেঙে গিয়েছে।

থেনডুপকে বলতে হবে, সবই বলতে হবে। গিয়াৎসোর স্ত্রী যেমন লোকনাথের পশমের খোঁজ খবর নেয়ার কথা, আর বুধগয়ার জলের রহস্য স্বামীকে ব'লে দিয়েছিলো। কিন্তু থেনডুপ কি—? মেজরকে ক্ষমা করা যাবে ? তা কি করা উচিত ?

এখন সে একটু হাঁপাচ্ছে কিন্তু তা তো এই পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রমেই। চিবুকটা একটু কেটেছে বটে, কিন্তু তার কথা এতক্ষণ মনেও ছিলো না। পরিশ্রমেই সে

হাঁপাচ্ছে। গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। নতুবা কি ক্ষতি করতে পারে হান্ মেজর?

পেমার মনের মধ্যেই কে যেন কোথা থেকে ব'লে উঠলো: তুমি শরীরকেই এতদিন বিশ্বাস ক'রে এসেছো, তাই নয়? ইতিপূর্বে তুমি মেজরকে দেখে নিজের সন্তানের অভাব অনুভব করোনি? তাই যদি—হঠাৎ লজ্জায় যেন ভেঙে পড়লো পেমা, আর যেন সে চলতে পারবে না।

সেই শয়তান হান্ মেজর নিশ্চয়ই জানবে না। কিন্তু থেনডুপ? থেনডুপ কাউকেও বিদ্বেষ ক'রে না এটা তার সম্বন্ধে নতুন কথা নয়। কিন্তু—

পেমা চিন্তাটাকে ছাড়িয়ে উঠবার জন্যে প্রাণপণে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলো। কখনও লাফিয়ে, কখনও কখনও হাতে পায়ে আঁকড়ে ধ'রে। কিন্তু যদি থেনডুপ ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে, তোমার এই পাহাড় জয় করা দৈত্যের মতো শক্তি তখন কোথায় ছিলো?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পেমা বলতে লাগলো, কৃপা করো থেনডুপ, কৃপা করো থেনডুপ।

আরও কয়েক ধাপ এমন ক'রে উঠতে পারলেই সে পৌঁছে যাবে। গিয়াৎসোর মতো থেনডুপ নতুন ক'রে অবিদ্বেষ আর অভয়কে অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিলো। আর থেনডুপেরই আজ বিপদ। কি হবে? কে জানে?

পেমা বললো স্বগতোক্তির মতো: থেনডুপ, বিশ্বাস করো, আমি তখন কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। সে কান্না আমার নিজেরই। কিন্তু যে কাঁদছিলো সে ছাড়াও আর একটা আমি যেন কোথা থেকে জুটে গেলো।

সব শুনে থেনডুপ হয়তো বিড়বিড় ক'রে বলবে, বিদ্বেষ করো না, ভয় আব বিদ্বেষ একই। থেনডুপ তো চমরীকেও তেমন ক'রে অভয় দেয়।

কিন্তু থেনডুপ, বলো, তুমি কি এরপরেও সাম্যকে বিশ্বাস করবে? না কি বলবে বরফের ঠাণ্ডায় কষ্ট হয়, বরফ না থাকলে মরুভূমি। কিম্বা মিথ্যাবাদীরাও সত্যকে ব'য়ে আনতে পারে? তুমি কি বলবে সাম্যই অবিদ্বেষ?

ওই তো ওদের দেখা যাচ্ছে। হান্ সৈন্যরা সবাই চমরীর ভিড়েই জুটেছে দেখো। একটা বড় পাথর ধ'রে ঝুলে ঝুলে অবশেষে পেমা নিজেকে টেনে তুললো তার ওপরে। এখন সে শুধু হাঁপাচ্ছেই না। ঝুলতে ঝুলতে হাতের আঙুলগুলো অবশ হ'য়ে খুলে যাচ্ছিলো প্রায় খাদটার ওপরেই।

আর, তাকে লোকনাথ কিম্বা যাই বলো, দধিকর্ণ যার খচ্চরের নাম, সে ইংরেজদের গোয়েন্দাই ছিলো, অথবা পশমের দালাল যদি নরম ক'রে বলো। যে নাকি খচ্চরকে বিড়ালের নাম দিতে পারে সেও তথাগতের কথা ব'য়ে আনে—বিদ্বেষ না থাকলে ভয়ও থাকে না। আর সেই মন্ত্রে ভয় চ'লে গেলে একজন মানুষ পাঁচশ বছর জেলখানার গুমটিতে একা-একা বেঁচে থাকতে পারে, শরীর শুকিয়ে গেলেও মনের মধ্যে সোনালি ফুল ফোটে। আশ্চর্য, তুমি কি ক'রে তা পারলে, থেনডুপ, ভয়কে এমন জয় করতে? বিচারককেও আর বিদ্বেষ করলে না? যদিও তুমি জানতে লোকনাথ হয়তো ইংরেজের গোয়েন্দাই ছিলো আর এদেশ ছাড়বার সময়ে সে—হয়তো মরুকগে যাক বলেই—তার পিস্তলের চোঙ এদিকের আকাশের দিকে খালি ক'রে দিয়েছিলো। মিথ্যাবাদীরাও, খুনীরাও সত্যকে ব'য়ে আনতে পারে? অথবা কথাটাই মূল্যবান? কারণ মুখ জিভ দাঁত শব্দ তৈরি করলেও

তারা কেউই শব্দ নয়। লোকনাথ—অমিতকারুণ্যে লোকনাথায় অমিতাভায় অমিতকারুণ্যে—

ও কি! আহা! ও কি, আহা, আহা, পেমা আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

থেনডুপকে বেঁধেছে ওরা গিয়াৎসোর সাইমিয়া গাছটার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে। আর সেই লামাটাকেও। সেও ধরা পড়েছে। থেনডুপের বাঁধা শরীর টেনে তুলে সোজা ক'রে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে। আ, দেখো, কতটা লম্বা শরীর থেনডুপের। আহা, ওর বাঁকানো জমাট ধরা কোমর কি এই শক্ত বাঁধনের চাপ সইতে পারে? আহা আহা।

হান্ সৈন্যেরা হাঁটু গেড়ে ব'সে রাইফেল তুলে ধরলো। ওকি, কি করবে ওরা? এক, দুই—, রাখো, রাখো, রাখো, ওকি করছো।

এক মিনিট ধ'রে ছয়টি অটোমেটিক রাইফেল গর্জন ক'রে চললো। পেমা নিজের ডান হাতের মুঠোটাকে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েও আর্তনাদটাকে থামাতে পারলো না। থে-ন-ডু-প—আহা-আ-আ।

হান্ সৈন্যরা উঠে দাঁড়ালো, তারপর মার্চ ক'রে ফিরে চললো তাদের মোটরের দিকে।

চমরীর জিভে রক্ত গড়াচ্ছে আবার। আর সাইমিয়া গাছটার ফুল পাতা সমেত কত ডালপালা ভেঙে পড়েছে। এবারেও দু'জন। তাদের একজন অন্তত স্বদেশকে ভালোবেসেছিলো। আর থেনডুপ, আহা, গাছটার সঙ্গে কি ভয়ঙ্কর চেপে ওকে বেঁধেছে, দেখো এখন মাথাটা আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। থেনডুপ তুমি কি আদৌ ভয় পেতে জানতে না? কি ক'রে তোমার বিচারককে বিদ্বেষ না ক'রে নির্ভয় হ'লে।

আর সবই যেন সেই পুরানো গিয়াৎসোর গল্প।

থে-ন-ডু-প। আ-আ-হা-আ-আ। আর্তনাদ ক'রে উঠলো পেমা।

বিদ্বেষ না থাকলে ভয় থাকে না, বিদ্বেষই ভয়। আর অবিদ্বেষই সাম্য। কেউ যেন বিড়বিড় ক'রে বলছে। অথবা মৃদুকণ্ঠের নরম কথা কেউ যদি একবার শোনে বাতাসের মৃদু মর্মরে, বারবার তা শুনতে পাবে।

সেই দধিকর্ণের সোয়ারে সুরু আর হান্ মেজরে শেষ। স্কাউণ্ড্রেল, যদি তা বলো। কিন্তু এবারেও কি কেউ গাছ হ'য়ে উঠবে? গোলাপী ফুলের মধ্যে কেউ সোনালি ফুলের একটা স্তবক দেখতে পাবে? যেভাবে গাছটা ভেঙেছে তার পরেও? কিম্বা এটাই হয়তো দু'টো গল্পের তফাৎ হ'য়ে থাকবে।

অথবা এ বিষয়ে কে বলতে পারে—

এয়ারফিল্ডের কাছে চারতারা হোটেলের তিন কামরার স্যুইটে রাত আটটা হয়। ট্যুরিস্টের জন্যই এ মাঝারি ভালো হোটেল। সব চাইতে ভালো হোটেলগুলোকে পছন্দ করে নেয়ার আগে এখানে দু'এক রাত হয়তো থাকে তারা। তখন এখানে তারা মিলিত হ'লে ক্ষণস্থায়ী নাটক তৈরি হ'তে পারে যার কথা পরে মনে থাকে না। কোন কোন ট্যুরিস্ট এখানেই থেকে যায় আর সারাজীবনই ক্ষণস্থায়ী নাটকে অংশ নিতে থাকে।

রাত আটটা হয়। এ ঘরটা ডাইনিংরুম, ড্রয়িংরুম মিলিয়ে সাজানো। চার জনের ডাইনিং টেবল। যার উপরে সাদা ঢাকনা। দুটো গ্লাসে ন্যাপকিনের ফুল। কিন্তু পাশাপাশি আর টেবলের ঠিক মাঝখানে রাখা। মনে হবে ডিনারের সময়ে চেয়ারের কাছাকাছি টেনে নিলেই হবে। এখন টেবলের উপরে দু'খানা ছবির পত্রিকা, চেয়ারগুলোও দেয়াল ঘেঁষে সাজানো, টেবলের থেকে আলাদা ক'রে। ড্রয়িংরুমের মতো। এদিকে একটা বড় কনভার্টিবল্ শোফা যাকে শয্যা করা যায়। শোফার পাশে একটা গদিদার বৃত্তাকার হাতলের চেয়ার। যার মুখোমুখী দেয়ালে একটা আয়না যাতে মুখ উঁচু করলে শ্রীলতার মুখের ছবি ফুটছে। ঘরে এখন যে আলো তাতে হাল্কা বাদামির ভাব আছে। প্রায়ই দেখা যায় রঙীন কোন জিনিস থেকে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে কাছাকাছি অন্য অনেক জিনিসকে রাঙিয়ে দিতে পারে। শ্রীলতার পরনের ফিরোজা সিল্ক থেকে আলোটা সারা ঘরে ছড়াচ্ছে এমন হ'তে পারে।

উল বুনছে শ্রীলতা। কাঁটায় কাঁটা লেগে মৃদু কুটকাট শব্দ হচ্ছে। উলের রুপোলি কাঁটা এক ডিজাইন উলে ফোটাচ্ছে নড়ে নড়ে, উল ফুঁড়ে বেরিয়ে বেরিয়ে। কখনও তার কানের সাদা পাথরের দুল, কখনও বাঁউটি আংটির পাথর ঝিকমিক করছে।

মুখ তুললো শ্রীলতা। নিজের মুখের ছায়াই আয়নাতে। তার ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে গেলো। গ্রীবা গরবিনীর মতো হ'লো তারপর।

সে ডাকসাইটে সুন্দরী নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মুখই সুন্দর।

টুটুল মিটুনকে হোটেল হলে ডিনার খাইয়ে নিয়ে স্যুইটে ফিরে কিছুক্ষণ গল্প-

গাছা ক'রে কি ভেবে উঠে সে কানের দুল পালটেছিলো, হাতের বাউটি, শাড়ি পালটেছিলো, চুলের গোড়ায় ঘাড়ে পাউডার দিয়ে এলো খোঁপা বেঁধেছিলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সেটা শোবার ঘরের আয়না আর তাতে কপালের উপরের চুলের থেকে, চোখের ম্যাসকারা থেকে হাঁটুর কাছে সিল্কের কুঁচি পর্যন্ত চোখে পড়ে।

আয়নায়, এখানে, কপাল থেকে কাঁধ অবধি। আয়নার উপরের অংশটা সাদা। চকচকে সাদা নয়। ছবির ক্যানভাসে সাদা দেয়ার পর যেমন। দেয়ালের ছায়াই হবে।

টুটুল অবাক হয়েছিলো। বলেছিলো, মা তুমি এখন বাইরে যাবে নাকি? সিনেমায় যাবে নাকি গো?

একেবারে ওর বাবার মতো কথা বলে, গলার স্বর পর্যন্ত।

আর মিটুন খুব খুশী হয়ে পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়ে সিল্কের উরুতে মুখ গুঁজে, রোগা রোগা সাদা হাতে কোমর জড়িয়ে ধরেছিলো—লক্ষ্মী, মা।

শ্রীলতা হাসলো। তার দু'তিনটে দাঁত সেই লালজাতীয় আলোয় দাড়িমদানার মতো দেখালো। মনে হয় চকচকে পাথরে তৈরি, কিন্তু ভিতরের টস্‌টসে রসের কথাও মনে থাকে।

উলের কাঁটা পাশে সোফায় রেখে, ডান হাত তুলে ডান কানের উপরে চুলগুলোকে আস্তে আস্তে চেপে দিলো সে।

আবার উল কাঁটা নিলো হাতে। এটা এমন যে তুমি ভেবে যেতে পারো, তাতে কাঁটা থামে না। কখনও থমকে যেতে পারে, তারপর কুটকাট ক'রে চলতে থাকে। কখনও চুড়িতে বাউটিতে মৃদু শব্দ হয়।

আয়নায় ওটা মাছ নয়। মুখ নিচু ক'রে ভাবলে শ্রীলতা। দুমুখ চোখা চকচকে বৃত্তাভাসের মধ্যে লেখা হোটেলের নামই, যেমন রেলগাড়িতে থাকে। সাদা আয়নার ফলকের উপরের দিকে ডান কোণে যেন এরোপ্লেনের মতো ভাসানো, যদি আয়নাটা আকাশ হয়। নিচের হাল্কা বাদামি রঙের উপরে সাদা আকাশ। মেঘে ধূসর হ'য়ে ওঠার আগে শেষ বসন্তের আকাশ।

সেখানে লাউঞ্জেও তখন বসন্ত কিন্তু। ডালিয়া, গ্ল্যাডিয়োলা, হলিহক্‌। সোনা হলুদ, ফিরোজা, লাল, সিঁদুর—নানা রং আর কতরকমেরই পাপড়ি। একটা স্বচ্ছ ধরনের রোদে ফুলগুলো, তাদের গাঢ় সবুজ পাতাগুলো যেন বিলাসিনী যাদের সংসারে কোন কাজ নেই। লাউঞ্জের সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে নেমে গিয়ে টারম্যাকে পৌঁছানোর আগে।

ফুলগুলোর এপারে রঙীন বেতের চেয়ারগুলোতে যারা তাদের পোশাকের, চুলের, ঠোঁটের, চোখের ম্যাসকারার, সানগ্লাসের রঙেও, যেমন ডানদিকেই সেই সিকিমি মহিলার সিঁদুর রং ঠোঁট আর নখ, সিপিয়া ব্রোকেডের গাউন যার বোতাম-গুলো চাপকানের মতো পাশে, যেমন শ্রীলতার সাদা-ফুলদার হাল্কা নীল টিশার্ট আর দুধসাদায় হাল্কা লালের রেখা স্ল্যাকসে, হাল্কা লাল ঠোঁট আর নখে, সিপিয়ায় ম্যাসকারা করা চোখের কোলের কালিমায়, এমনকি পুরুষদেরও, যেমন মিস্টার মিটারের ইস্পাতনীল স্যুটে সেই বসন্তই যেন। তেমন এক কবোষ্ণতা। আর মৌমাছিও উপস্থিত ছিলো।

টবগুলোর পরে, বেডগুলোর পরে টারম্যাক, স্টিলের খুঁটিখোঁটা, এলুমিনিয়াম রঙের হ্যাঙ্গার সব শেষে খানিকটা সবজে-নীল দিগন্তের উপরে মন্দারোদের আকাশে দুই কুণ্ডলী সাদা মেঘের সঙ্গে এক কুণ্ডলী ইস্পাতনীল মেঘ, যেন সাদা সিনথেটিক কোন কাপড়ে আঁকা—যে কাপড় ঝিলমিল করছে কিন্তু আসলে যা ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকের বেলা দুটোর রোদে ভরা আকাশ। যে আকাশে ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানটি এইমাত্র দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তখনই কি শব্দ পাচ্ছ? একটা মৌমাছি বরং লাউঞ্জের মানুষগুলোর দিকে ঝুঁকছে। কিছু পরিমাণে ধুলো উড়ানো সেই কবোষ্ণ বাতাসও। কিন্তু বেশ সতর্ক, কারো ঠোঁটে বসছে না, কারো কানের টাপকে সহজে বিশ্বাস করছে না, বেলফুলের মতো বটে কিন্তু নাও হতে পারে। কারণ এখন তো সে বসন্ত প্রায় শেষ ক'রে এনেছে।

আয়নাটাকে দেখলে শ্রীলতা। একটু বেশী উঁচু করেছিলো মুখ। গলা, গলার নিচে হারের পাথর, কাঁধের শাড়ি। ওটা কিন্তু মাছের মতোই।

ফুলগুলো যেন একটু বেশী ফুটে যাওয়া। পাপড়ির ধারগুলো যেন কিছু রোদে ঝলসানো, একটু কুঁকড়ে যাওয়া। হয়তো আরও উত্তরে যেখানে জলীয় বাষ্প আরও বেশী থাকে সকালের কুয়াশায় এখনও, ফুলগুলো হয়তো এখনও তাজা। আজ কলকাতায় কুয়াশা ছিলো বটে, কিন্তু তখন তো, দেখছো, ঝকঝকে রোদের দুপুর। শেষ বসন্তই। শ্রীলতা তার স্ল্যাকস ঢাকা পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। এখন তার আঠাশ বছর হয়েছে।

কেমন একটা আলসেমি জাতের নেশা লাগে না?

একটা নীল মাছিও ভোঁ ক'রে এখান থেকে ওখানে বসার চেষ্টা করলো।

এরোপ্লেনটারও শব্দ শোনা গেলো।

মিস্টার মিটার বললে, ফকার ফ্রেণ্ডশিপই এটা।

এটাই হবে, বললে কমরেড ঘোষ।

মায়ের কোলে ঝুঁকে ছ'বছরের মিটুন বললে, ফকা ফেনছিব বুঝি?

এই প্লেনটাই আমাদের? বললে টুটুল। তার আট বছর হ'লো।

সে বসন্তকে কৃত্রিমও বলা যায়। টবে বসানো। তাছাড়া প্রকৃতিতে ফুলগুলো অতবড় হয় না। দস্তুরমতো গ্র্যাফ্‌টিং ইত্যাদি ক'রে এগুলো এমন, অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। উলের উপরে একটু ঝুঁকেই পড়লো শ্রীলতা। অর্থাৎ একটু গোলমেলে ব্যাপারই।

প্লেনটা যেন রূপোলি চকচকে মাছ যার পেটের নিচে শেষ পাখনার কাছে ইতিমধ্যে ভার। মিস্টার মিটারের মুখটা একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। অনেক মানসিক প্রস্তুতির পরেও অপারেশন থিয়েটারে যেতে যেমন হ'তে পারে হয়তো।

শ্রীলতা ভাবলে, মাছটা অবাক হ'য়ে যায়। ভয় পেয়ে যায়। বড়শি নয় অথচ কিছু যেন বিঁধে গিয়েছে। সকলের থেকে দূরে গিয়ে জলের নিচে শ্যাওলাধরা বুড়ো পাথরের গায়ে নিজেকে ঘষে, যেন ভিতরে যা ঢুকেছে তাকে খসিয়ে দিতে কতরকম ক'রে নিজের শরীরকে বাঁকায়, ভাঙচুর করে, মরার মতো নিজেকে ভাসিয়ে দেয় জলের তলার স্রোতে। তারপর দেখে সে মরে নি। ভয় কমতে থাকে খুব ধীরে ধীরে। সমাজের অভিজ্ঞতা যেন লণ্ঠন হাতে তাকে খুঁজতে বেরিয়ে ডাকা-ডাকি করে।

কৃত্রিম বসন্ত তো বটেই। যেমন মিস্টার মিটারের ম্যানিকিওর করা নখ। যেমন তার সদ্য হেয়ারড্রেসিং করা মাথা যার জন্য পনর টাকা লেগেছে কাল। যেমন তার কান দুটো যা থেকে এক গোছা ক'রে লোম বেরিয়ে থাকতো। হেয়ারড্রেসারের কাছে গিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু মিটার তা পারে নি শেষ পর্যন্ত। যেন নিজের গোপনীয়তায় ডাকা হবে তাতে সেই অ্যাংলো চুলকাটনে-ওয়ালীকে। শেষে বাড়িতে ফিরে শ্রীলতাকে বলেছিলো মিটার সলজ্জভাবে, আর শ্রীলতা বেশ সাহস ক'রে ছোট কাঁচি দিয়ে সেগুলোকে সরিয়েছে।

তা তার সাহস পাওয়ার কথাই, লোমনাশক লোশন দিয়ে গলার নিচে কত-গুলো বেয়াড়া বাড়তি লোমকে নির্মূল করতে সেই সাহায্য করেছিলো এর আগে। কেমন, লজ্জার মতো লাগে না? কৃত্রিম তো বটেই। যেমন শ্রীলতার চোখের কোলের কালিমার কালো ম্যাসকারা। সে তো সত্যি নষ্ট মেয়ে নয়?

কলকাতার মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে মিস্টার মিটারের কারখানা-ফার্ম। এখন তার নাম গমলিং মিটার। আগে গমলিং-ইণ্ডিয়া ছিলো। গমলিং মিটারের প্রেসিডেণ্ট ডুবাই যাচ্ছে। তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকার ফ্যান, এয়ার সার্কুলেটর ইত্যাদির

রপ্তানি বন্দোবস্ত হওয়ার কথা আছে, তাকে পাকাপাকি করাই। কাল বিকেলে কলকাতায় পৌঁছে এয়ারফিল্ডের কাছে এই ট্যুরিস্ট-হোটেলে তিন কামরার স্যুইট নিয়েছিলো তারা।

বন্দোবস্তটাকে কিছু কৃত্রিম মনে হচ্ছে কি? তারা তো আজই ফার্মের বাংলো থেকে সোজা এয়ারফিল্ডে আসতে পারতো যে গাড়িতে এসেছিলো সেটাতেই। হোটেল কেন, হোটেলে রাত্রিবাস কেন? এটাও তৈরি করার, গড়ে তোলার ব্যাপার। শ্রীযুত মিত্র এঞ্জিনীয়ার, পরে গমলিং ইণ্ডিয়ার একজিকিউটিব, ক্রমশঃ মিস্টার মিটার, পরে গমলিং মিটারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে (এ সবই হয়েছে শ্রীলতার বিশ থেকে এই আঠাশে পৌঁছানোর মধ্যে) এই প্রথম মিস্টার মিটার ফরেইনে যাচ্ছে, যদিও হতে পারে, ডুবাই মাত্র কিছুদূরে, ইউরোপের মতো ফরেইন নয়, এই প্রথম তার ফার্ম এক্সপোর্ট কনট্র্যাক্‌ট পেতে চলেছে এত টাকার যার ফলে তার ফ্যাক্‌টরীর প্রোডাকশন্ দ্বিগুণ আড়াইগুণ বাড়বে। কিছু একটা করা দরকার নয়? এই বিশেষ ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করার জন্যই এই হোটেলে থাকা, রাত কাটানো।

বাহ্, হাসলো শ্রীলতা ভাবনার মধ্যে, মানুষ তো শুধু হওয়াই নয়, করাও। যেমন শ্রীযুত মিত্র ক্রমশঃ নিজেকে মিস্টার মিটার ক'রে তোলে। যেমন তখনকার টিশার্ট-স্ল্যাকসে শ্রীলতা, যেমন মিস্টার মিটারের ম্যানিকিওর করা নখের সুদৃশ্যতা। যেমন ছেলেদের ডিনার হয়ে যাওয়ার পরে তত রাতে কোথাও বেরোনোর কথা না থাকলেও, এই চুল জড়ানো ফাঁপা এলো খোঁপায়, এই শাড়ি পালটানো। কানের পাথরটা ঝিকমিক করছে, গালেও তার লম্বা স্বচ্ছ ছায়া পড়ছে।

শ্রীলতার নাভির নিচে একটা গরম অনুভূতি। টেবলের উপরে কাটগ্লাস-গ্লাসে ন্যাপকিন জড়িয়ে ফুল, দুটো গ্লাস। মুখ নিচু করলে শ্রীলতা চকিতে। ভাবনার মধ্যে ঠাট্টা করলে অনুভূতিটাকে—অহাহা, ওটা ক্ষিধেই বাপু। তাছাড়া কিছু নয়।...

মায়ের ছড়িয়ে রাখা স্ল্যাকস ঢাকা দু'পায়ের মধ্যে ঢুকে কনুই দুটো তার উরুতে আর বুকের কাছে মুখ রেখে ছ'বছরের মিটুন বললে—একটা কোকা খাবো। তার সোনালি-হলুদ মুখটাকে এদিক ওদিক করলে যেন মায়ের বুকে ঘষবে। আর তখন শ্যামল রঙের টুটুল তার আট বছরের গাম্ভীর্যে না-শোনার ভান করলে। তার বড় বড় চোখের প্রান্ত দুটো অবিকল মিস্টার মিটারের মতো কিন্তু।...

মিস্টার মিটার বললে, এটাই হবে।

সে হাসলো। কিন্তু তার ঠোঁট আর দাঁত হাসিটা সরলেও সেই ভঙ্গিতেই স্থির

হয়ে রইলো।

ফকার-ফ্রেণ্ডশিপই, বললে কমরেড ঘোষ পিছন সারি থেকে, আর তার হলুদ চিমসে হাত দুটোকে নার্ভাসভাবে ঘষলো।···

তখন তো প্লেনটার পেটের কাছে বাদামী বাদামী রেখা আর ফুটকি ফুটে উঠেছে। মুখ তুললো শ্রীলতা।

ওটা কিন্তু মাছের মতোই। চকচক করছে, আর আয়না আকাশে ডানদিকে উপরে। তখন মনে হলো এখনই ঝুপ করে নেমে পড়ে রানওয়ে ছুঁয়ে মোটরকারের মতো ছুটে চলবে প্লেনটা···

টুটুল গম্ভীর হয়ে বললে, এই প্লেনে বাবা যাবে ডুবাই।

তা যেন স্কুলেব বন্ধুদের কাছে।

মিটুন তার ছোট ছোট হলুদ হাত দুটোকে নেড়ে নেড়ে তালি দিলো, ডুবাই, ডুবাই।

কিন্তু···

ভাবলে শ্রীলতা, দ্বিতীয়বারে কি যে তাড়াতাড়ি ঘটে যায়।

ঝুপ করে নেমে পড়লো প্লেনটা। আর পুরুষরা কি যে ভয় পেয়ে যায়। দ্বিতীয় বারে বোধহয় মাছটা আগের বারের অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে তেমনই ছটফট করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ছটফটানি কিছু কৃত্রিম হয় না?

ওদিকের সিকিমি মহিলা তার সঙ্গীদের নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কি যে তাড়াতাড়ি...

প্রথমে মিস্টার মিটার। তারপরে এক লাইনে টুটুল-শ্রীলতা-মিটুন। পিছনের লাইনে কমরেড ঘোষ যার পাশে, কিন্তু কিছু দূরে, শ্রীলতার আয়া। মাইকে কথা শুরু হয়েছে। প্লেনটা ট্যাকসির মতো চলতে চলতে বাঁক নিয়ে ঘুরে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো। আর তার পরে সাদা সিফন পরা সেই মেয়েটি। প্লেন থেকে নেমে প্লেনের কাছে সে যেন পায়চারি করলো। যেন নিষ্পাপ কিছু।

আসলে কিন্তু দ্বিতীয়বারের সেই অনুভূতিতে ছটফটানি যা থাকে তা হয়তো প্রথমবারের ছটফটানির স্মৃতি। পুরুষরা বরং, আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে যেন মুখ তুললো শ্রীলতা, যেন ফ্লাউয়ার ভাস ভেঙ্গে ফেলে ভয় পায়। উলের কাঁটা সোফায় শুইয়ে ডান হাত তুলে কানের উপরের চুলগুলোকে একটু চেপে দিলো শ্রীলতা।

মুখ নামালো সে। তার খোঁপার চূড়াটা আয়নার নিচের কোণে দেখা গেলো। হয়তো সে এয়ার হোস্টেসই! অনেকক্ষণ সে সেই বেলফুলের মতো সাদা শিফনের মেয়েটিকে দেখেছিলো। যাত্রীরা প্লেনে উঠলো। সব শেষে এয়ার হোস্টেস। তার

পর প্লেন চলতে শুরু করলো, আর অযাত্রীরা রুমাল নাড়তে। টুটুল, মিটুন, শ্রীলতা, কমরেড ঘোষ। কেমন যেন দুঃখের মতো, কিছু হারানোর মতো, ছিঁড়ে যাওয়ার মতো মনে হয়। প্লেনের বাতাসে ওড়া ধুলো চোখে ঢুকে যায়, জল এসে যায় চোখে। তারপর টুটুল বললে, এ মা, তুমি কোন দিকে রুমাল নাড়ছো? বাবা তো প্রথমদিকে। ওদিকে তো এয়ার হোস্টেস ঢুকেছিলো, প্লেনের পিছন দিকে।...

আশ্চর্য, কিন্তু, উল সমেত কাঁটা দুটো থেমে গেলো, হঠাৎ মনে হচ্ছিলো তখন শ্রীলতার নিষ্পাপ কিছু চলে যাচ্ছে। যেন তাকে বিদায় দিতে চোখে জল আসবে।

তারপরেই এক হাত টুটুলকে ধরতে দিয়ে অন্য হাতে মিটুনের হাত ধরে মৃদু দৌড়ের ভঙ্গিতে শ্রীলতা তাদের গাড়ির দিকে গিয়েছিলো যেন ঘাসগুলো স্প্রিং যা পায়ের তলে উঠছে নামছে। আর হাসছিলো তারা সেই দৌড় দৌড় খেলায়।

—আমাদের গাড়িতেই এসো কমরেড ঘোষ।

—আমাকে বলছেন?

—এসো। অনেক জায়গা আছে।

ভাবলে শ্রীলতা ভাবনার মধ্যে অবাক হয়ে হয়ে—আশ্চর্য, কিন্তু মনে হচ্ছিলো তখন নিষ্পাপ কিছু চলে যাচ্ছে যার জন্যে সে মনে করতে পারছে না মিস্টার মিটার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কিংবা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ফিরে দেখেছিলো কিনা, কিংবা রুমাল নেড়েছিলো কিনা, কিংবা কি করেছিলো সে, অর্থাৎ যাকে বিদায় দিতে আসা সে কিভাবে বিদায় নিলো তা দেখা হয়নি।

সেই না-দেখা যেন ছোট একটা কালো গর্ত সময়ের। না ওতে পড়লে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, ওতে যেন বাতাস কম।

দেখো কাণ্ড! ভাবলে শ্রীলতা। আর তারপর আবার হোটেলের লাউঞ্জে। সেখানে একটা গোল টেবল ঘিরে, বরং গাড়িবারান্দার মতো, পিলারগুলোর উপরে ছাদ, দেয়ালগুলো দূরে দূরে, পিলারগুলোর কাছে কাছে পিতলের টবে পাম আর ডালিয়া, ছাদের কাঁচ থেকে টেরচা টেরচা রোদের ত্রিভুজ মতো ফালি, গোল টেবল ঘিরে, একটা পরিবারের মতো বসেছিলো কমরেড ঘোষ, টুটুল, মিটুন, শ্রীলতা, এমনকি আয়াও।

ক্রোম-হলুদ ফ্লানেলের চাইনিজ শার্ট, গ্রে ওরস্টেডের ট্রাউজার পরা কমরেড ঘোষ। বুকপকেট থেকে নীল চেক রুমালের কোণ। তার উল্টোদিকে শ্রীলতা নিজে। সেই সাদা ফুলদার নীল টিশার্ট, আর দুধসাদায় হাল্কা লালের রেখা স্ল্যাকস্। আয়াই বরং সিল্কের শাড়িতে।

শ্রীলতা হেসে বললে, তুমিও বসো।

তারপর কমরেড ঘোষের দিকে চেয়ে বলেছিলো, ওরা কোকা খাবে। আর আমরা চা খেতে পারি।

তখন পিলারগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট আলোই ছিলো। কমরেড ঘোষের গায়ের কাছে একটা টবের ফার্ণে রোদ চকচক করছিলো ; কমরেড ঘোষ বললে, আমরা চা খেতে পারি।

কমরেড ঘোষকে সেই ক্রোম-হলুদে একটু বেশী হলুদ লাগছিলো। প্রকৃতপক্ষে শ্রীলতার চাইতে ফর্সা নয়, টুটুলের চাইতে ফর্সা হতে পারে, বরং মিটুনের মতো। মিটুন অবশ্য অনেক তাজা, অনেক টাটকা তার গায়ের রং।

ছেলেরা কোকাকোলা খেয়েছিলো। শ্রীলতা আর কমরেড ঘোষ, চা।

কমরেড ঘোষকে তুমি ডাকসাইটে সুন্দর বলতে পারো না। দেখো, নাকটা যেন মুখের তুলনায় উঁচু। হিসাব করলে চিবুকটা বরং সরু। অবশ্য, সব মানুষের মুখই সুন্দর।

চা শেষ ক'রে শ্রীলতা বললে, গাড়ি কেনার কথা হয়ে আছে। আমরা এখন রংটা পছন্দ করতে যাবো।

কোম্পানির গাড়িতে, তা অবশ্যই প্রেসিডেন্টের নিজস্ব ব্যাপারও. শ্রীলতা তার ছেলেদের নিয়ে গাড়ির রং পছন্দ করতে চলে গিয়েছিলো।

দেয়ালের গায়ের ছোট্ট গোল সোনালি আর কালো দিয়ে রংকরা ঘড়িটার দিকে চোখ তুললে শ্রীলতা। সাড়ে আট রাত। এখন চা খাওয়া যায় না।

তা ছাড়া···

যেন কান খাড়া ক'রে শুনলো শ্রীলতা। হাসি হাসি হলো তার মুখ। কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। টুটুল মিটুন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডিনারের একঘণ্টার মধ্যেই ঘুমায়। সেটাই ওদের অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে শ্রীলতা। একা একা তাদের ঘুমানোর এই ট্রেনিং দেয়ার ফলে ভালো ঘুম হয় তাদের। বাহ্, সে মা, আর শেখাবে না ?

তাছাড়া···

এ ঘরটার আলো কিন্তু খানিকটা হাল্কা বাদামী। যেন, কি বলবে ? যেন বসন্তের সন্ধ্যা। খানিকটা যেন অন্য কোথাও থেকে আনা। যেমন ধরো শ্রীলতার চুল, যাকে কাক-কালো মনে হয় না বরং যেন খয়েরী। ডান হাতটাকে সোফার উপরে পেতে সেই সিল্কের উপরে চালিয়ে চালিয়ে নিলো শ্রীলতা।

তাছাড়া, সে তো ছিলো এয়ার হোস্টেস। সব সময়ে নিষ্পাপ হয় না তারা বোধহয়। তাই নয় ?

মুখ তুলে হাসলো শ্রীলতা।

আর...

দ্বিতীয়বারে কখনও তোমার তেমন মনে হয় না যে একটা ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসা পিরামিডে তারার আকাশের নিচে চোখে জল ভ'রে একা শুয়ে আছ যখন দূরে দূরে আলোর বিন্দুগুলো তোমাকে, যেন তোমার মৃতদেহকে খুঁজছে।

গাড়ি পছন্দ ক'রে শ্রীলতা ফিরে এসেছিলো।

তখন চারটে হবে বেলা। গাড়িবারান্দার মতো সেই একদিক খোলা লাউঞ্জেই। খোলা দিকটা দক্ষিণে বাড়ানো। সেজন্ম তখনই সেখানে পড়ন্ত বেলার মাঝারি উজ্জ্বলতার আলো। টুটুল মিটুন তখন নাচছে যেন, কেননা টুটুলের কাঁধে একটা ব্যাট, বাঁহাতে লাল বল। তার ক্রিকেট-ক্যাপ মিটুনের ঈর্ষা কমাতে মিটুনের মাথায়। মিটুনের বুকে জড়িয়ে ধরা মস্ত একটা টেডিবিয়ার। আর শ্রীলতার চোখ দুটিও তখন চকচক করে থাকবে, কেননা সে মনের মতো গাড়িটাকে পেয়েছে। যেন খেলনা এমন এক টুসিটার যা যেন টুটুলই পারবে চালাতে, আর টকটকে সিঁদুরে।

তুমি বলতে পারো না, মুখ তুললো শ্রীলতা, আগে থেকে, কি তোমার পছন্দ। তারপর তুমি হঠাৎ, দেখো, পেলে আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এটাই তোমার পছন্দ সেই কবে থেকে। যেন মনে একেই খুঁজছিলে ব'লে শান্তি ছিলো না। আজ শান্তি হ'লো।..

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্বিতীয় পিলারটার পাশেই বেতের চেয়ারে গা ডুবিয়ে, হাতের তেলোয় সিগারেটের বাক্স, কমরেড ঘোষকে দেখতে পেলো শ্রীলতা যেন।

আর প্রথম পিলারের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

যেমন সে নিজের বাংলোর লনে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ কখনও মরার ভান করে আতপ্ত ঘাসে লুটিয়ে পড়ে যার ফলে টুটুল মিটুনের ডাকাত পুলিশ খেলা শেষ হয়। আর শ্রীলতা তখন সত্যি বিশ্রাম করেও নেয়। টুটুল মিটুনদের তাদের বাথরুমে নিয়ে যায় আয়া তারপর।

শ্রীলতা বললে, ওদের নিয়ে যাও আঈ, অনেক ধুলো লেগেছে গায়ে।

তেমন ক্লান্তির ভঙ্গিতেই কমরেড ঘোষের কাছাকাছি আর একখানা বেতের চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়ে হেসেছিলো সে।

—আমি কিন্তু সত্যি আশা করিনি, তুমি কি জানতে আমি মিসেস মিটার?

আর তখন বাদামিতে দুধে মিশানো ঘন আলো চারিদিকে।

—তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—বোধহয় রোদ লাগলো।

—তোমাকে চা দিতে বলবো কি? বললে কমরেড ঘোষ।

ওয়েটারদের কেউ কেউ এসময়ে এই লাউঞ্জে ড্রিংকসের অর্ডার নিতে ঘোরে। উঠে গিয়ে তাদের একজনকে ধরে আনলে কমরেড ঘোষ।

অনেক সময়ে কিন্তু কথা আসতে চায় না। কমরেড ঘোষ সিগারেট বার করলো। ধরালে না।

আজ গরম কিন্তু। বললে শ্রীলতা।

এমনকি ওয়েটার এলো। চেয়ার দুটোর সামনে টিপয় রাখলে। চায়ের প্লেট কাপ সাজালো কমরেড ঘোষ নিজেই।

কমরেড ঘোষ বললে মৃদু হেসে আর তাতেই যেন তার পরিশ্রমে লাল হ'লো মুখ, অথচ এখন বসন্ত নয়?

চা তৈরি করলো শ্রীলতা।

কমরেড ঘোষ চা নিতে যেন দ্বিধা করলো। বললে, আমি জানতুম না তুমিই মিসেস মিটার।

আচ্ছা, সুব্রতবাবু, হাসলো শ্রীলতা।

—কিছু বললে?

—না।

চা নিলে সুব্রত ঘোষ। বললে, এটা একটা যোগাযোগ। যদিও জানতুম তোমার উপাধি মিত্র। কিন্তু তুমি মিসেস মিটার জানতুম না।

কেমন দিন চলে যায়! এই ভয়ানক পুরনো কথাটা বলে সলজ্জ হয়ে হাসলো শ্রীলতা।

এতক্ষণে সিগারেট ধরাতে পারলো সুব্রত।

চাটা পেয়ে ভালোই হলো। বললে শ্রীলতা।

—তুমি কিন্তু বদলাও নি। বললে সুব্রত।

—দেখেই চিনেছিলাম। হাসলো নিঃশব্দে শ্রীলতা। কেউ তো আর সত্যি ছদ্মবেশ পরো নি।

মধুমালা কেমন আছে? মধুমালা দিদি কোথায়?

—ভালোই আছে, বেশ ভালোই। চন্দননগরেই।......

ভাবনার মধ্যে হাসিতে ভাঙচুর হ'লো শ্রীলতার ঠোঁট।

সেটা কিন্তু একটা গোল দ্বীপ। কিন্তু তা যেন কোথাও থেকে আসা। টেবলে পেপারওয়েট ক'রে রাখা একটা গ্লাসবলের মতো। উপরে চকচকে কাঁচ, কিন্তু তার

ভিতরে একটা রঙীন ডিজাইন। উপরে গোল হয়ে নেমে যেন মাটিকে ছুঁয়ে নীল নীল আকাশ, আর তার নিচে লাল লাল ফুল ফোটা সবুজ মাটি, একটা গ্লাসবলের মধ্যে যেমন হ'তে পারে।

এদিকের এ দ্বীপটা কিন্তু বড় ; প্রকৃতপক্ষে তো দ্বীপ নয়। কূলেরই অংশ। কিছু পুরনো পুরনো গাছ, একটা বাংলো বাড়ি সমেত যা সেবারের বর্ষায় কূল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো।

আর দূরে সেই ছোট নীল দ্বীপটা যা শীতের দুপুরে নদীর চকচকে কাঁচের টুকরো ছড়ানো বুকে। এ দ্বীপের একজন অকবি ছবিটাকে প্রায় নষ্ট করে বলে উঠেছিলো—দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বি···

সেটা ছিলো মধুমালার বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। বিয়ের উৎসবে যেতে পারেনি শ্রীলতা। মিস্টার মিটারের মামাতো বোন অধ্যাপক ডকটর মধুমালা বসুর সঙ্গে অধ্যাপক ডকটর সুব্রত ঘোষের বিয়ে। ভালোই হয়েছিলো বিয়ে।···মিস্টার মিটার যেতে পারে নি, গমলিং ইণ্ডিয়ায় ধর্মঘট, শ্রীলতা যেতে পারে নি, টুটুল তখন সদ্যোজাত।

বিয়ের বার্ষিকীর খবর পেয়ে শ্রীলতা সুতরাং আঈর কোলে টুটুলকে নিয়ে গিয়েছিলো। মিস্টার মিটারের পক্ষে সেবারও যাওয়া সম্ভব হয় নি। কেন না তখন গমলিং ইণ্ডিয়া গুটিয়ে নেয়ার কথা চলেছে যে চঞ্চল বিশৃংখলার মধ্যে থেকে গমলিং মিটার ক্রমশঃ জেগে উঠবে।

কথা এসেছিলো এবারের বর্ষায় নদীর ধারের বাংলোটা কূল থেকে আলাদা হয়ে এক দ্বীপ হয়েছে, বাংলো আর তার চারিদিকের লন আর বাগান। সেখানে এখন কেউ বাস করছে না মালি ছাড়া। পি ডবলু ডির লোকেরা বর্ষার সেই চওড়া ফাটলটাতে পাথর আর মাটি ঢালছে, ফাটলটার উপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো আছে।

কথা এসেছিলো কলকাতার জু-তে যাওয়ার পথে এক ঝাঁক বুনো হাঁস নেমেছে দ্বীপটার কাছে।

বাংলোর মালিকের মত নিতে একবার বললেই হয়।

উৎসব রাতে। 'কৌতুকরসে পাগল পরানী'ই বোধহয় কথাটা। পাঁচ-ছজন জুটে গেলো। একটা শটগান। নদীর ধারে পিকনিকের মতো ব্রেকফাস্ট। তারপর নিশ্চয় স্নান হতে পারবে, সুতরাং দু-চারজন বেদিং স্যুট এনেছে। মধুমালা ইতিমধ্যে সন্তান বহন করছে। সুতরাং সে জলে নামবে না। সুতরাং তার একটা ঝকঝকে কালোয় হলুদ অদ্ভুত সাহসী বিকিনি যা সে নিশ্চয় ব্যবহার করেনি শ্রীলতার জন্য সে সুটকেসে ভরে নিয়েছিলো। তারই তো পরিকল্পনা। হেসে বলেছিলো সে,

দেখি বউদি কত সাহস তোমার। আর বাঁশের সাঁকোটা দিয়ে মধুমালার পার হওয়া উচিত নয় বিবেচনা করে প্রায় শূন্য থেকে একটা জেলে ডিঙ্গি যোগাড় করে ফেলেছিলো সুব্রতবাবু নদীর তীরের খোঁটা থেকে। নৌকা তো নয় নৌকার স্বপ্ন বলতে পারো। বোধহয় দুজনের বেশী তিনজনের ভার বয় না। একটা বোঠে, মাঝখানে একটা বাঁশ পোঁতা যাতে উঁচু করে বাঁধা গেরিমাটিতে রং করা বিছানার চাদর যেন একখানা যা নাকি পালের কাজ করবে।

ব্রেকফাস্ট শেষে যখন গাছগুলোর আড়ালে তারা হেসে গল্প করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন সেই বাংলোর মালির কি মনে হচ্ছিলো এরা কেউ মানুষ নয়?

তারপর তারা স্নান আর সাঁতারের জন্য বাগানের শেষে রোদে ঢাকা ঢালু লনে গিয়ে জমা হয়েছিলো, কারণ তা ছাড়া অন্য খেলাটা সম্ভব ছিলো না। কেন না এ দিকের দ্বীপটায় একটা হাঁসও নেই, আর মালি বলেছিলো যদি থাকে তবে তা ওই নীল দেখাচ্ছে সেই দ্বীপটার কাছে।

মালিকে বলা হয়েছিলো তাদের বাংলোর কূলের দিকে সে পাহারায় থাকবে। কেউ এলে বলবে মেয়েরা স্নান করছেন।

তখন বেলা নটা হবে। আর সেই ছোট্ট ডিঙ্গিটা দড়ি দিয়ে লনের ধারের একটা গাছে বাঁধা। এয়ার-গানের মতো চেহারা হাল্কা সরু নলের শটগানটা সেই নৌকায়, যা সে-রকম করে রাখা হয়েছিলো।

সে তো আর ডাইভিং বোর্ডওয়ালা স্নানের ঘাট নয়। নৌকাটায় বরং উঠে দু-একজন জলে লাফিয়ে পড়ছে। কেউ বা তা করার আগে দড়িতে যতদূর যায় তেমন চালিয়ে নিচ্ছে নৌকাটাকে।

বাংলোর বারান্দার ঘরে বেদিং কসটিউম পরলে শ্রীলতা। আর মধুমালা বললে হাসতে হাসতে, তুমি জ্বালিয়ে দেবে, বৌদি।

শ্রীলতা বললে, বেতের চেয়ার টেনে এনে বসতে দিন মধুমালা দিদিকে। আজ ওর বিয়েরই উৎসব, সুব্রতবাবু। ওই সব চাইতে দামী।

এই কথাতেই সকলে হেসে উঠেছিলো, হাসার জন্য এমনই প্রস্তুত ছিলো তারা।

দুবার পালা মত নৌকা থেকে জলে ডাইভ করেছিলো শ্রীলতা। একবার কি বুদ্ধি হলো তার মাথায়, গাছের গোড়া থেকে ডিঙ্গির দড়িটা খুলেও দিলো সে নৌকায় উঠবার আগে। নৌকায় উঠে, অন্যেরা কেউ কেউ যেমন তার আগে, ডাইভ দেয়ার আগে সে সেই গিরিমাটি রাঙানো বিছানার চাদরের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়িতে টান দিতেই পালে বাতাস লেগে গেলো, তরতর করে এগিয়ে গেলো নৌকাটা।...

ডান হাতের উলের ঘরগুলো বাঁ কাটায় তুললে শ্রীলতা। হাসি হাসি মুখে সে ভাবলে, যেন বাথটবে ভাসানো একটা কাগজের নৌকা হঠাৎ বড় হলো আর তাতে উঠে বসেছে কেউ।

আনন্দে উৎসাহে কয়েকজন সাঁতারু সেই নৌকাকে অনুসরণ করলো। লনের উপরে যারা তারা সেই নতুন খেলা উদ্ভাবিত হতে দেখে হাততালি দিলো, হাসলো হো হো করে।

কিন্তু নদীকে দেখে বোঝা যায় না, তার প্রায় স্নিগ্ধ ঘুমন্ত বুকের কোথায় বিদ্যুতের মতো চপলতা থাকতে পারে। কিংবা কথাটা তা নয়, তার মসৃণ শান্ত বুকের আড়াআড়ি একটা তীব্র প্রবাহ থাকে যার কথা জানা যায় না।

দু-এক মিনিটে নৌকার বেড়ে যাওয়া গতির সঙ্গে, গতি তো বেড়েছিলোই, জলের শব্দ হচ্ছিলো নৌকার কাঠে, জল উঁচু হয়ে উঠছিলো আগ্-গলুইএর কাছে। শ্রীলতা তখন ভেবেছিলো পালের যে দড়িটা সে ধরে আছে তা কি ছেড়ে দেবে? ভয় ঠিক নয়, কেন না তখনও তো লনের উপরে যারা তাদের হাসি, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে; মনে হয়েছিলো এবার নৌকাকে ঘুরিয়ে নিলে হয়। সাঁতারুরা, যারা পিছনে আসছিলো, কেউ ফিরে যাচ্ছে, কেউ এক জায়গাতেই সাঁতার দিচ্ছে, শুধু একজন খুব জোরে জোরে সাঁতার দিয়ে নৌকাটাকে ধরে ফেললে।

সুব্রতবাবু নৌকায় উঠে বসলো। ভিজে মুখের উপরে ভিজে চুল। হাসলো সে হো হো করে, যেন খেলার নতুন পর্যায়। শ্রীলতার পাশে বসলো সে, বোঠেটাকে হাতে করলো। লনের উপরে যারা ছিলো তারা কিছু বললে চিৎকার করে, কি বললে বোঝা গেলো না।

নৌকা তখন জোরেই চলছে, নিচে স্রোত আর উপরে পালের বাতাস। সুব্রত-বাবু বন্দুকটা উঁচু করে ধরে লনের লোকগুলোকে দেখালো, যেন বললে দেখি ছোট নীল দ্বীপটায় হাঁস আছে কি না। সত্যি কি তা ভেবেছিলো সে?

কিন্তু পালে বাতাসটা, তখন নৌকা মাঝ নদীতে এসে পড়েছে, আরও বেশী চাপ দিচ্ছে; তখন হঠাৎ আবিষ্কার হলো যেন নদীটা বাথটব নয়, গোলদিঘীও নয়।

শ্রীলতা, আনাড়ি যেমন করতে পারে, পালের দড়িতে ঢিল দিতেই নৌকাটা বেসামাল হয়ে উঠলো। সুব্রতবাবুও এমন কিছু জলের পোকা নয়। চিন্তিত মুখে বললে, ছেড়ো না ছেড়ো না, ভেবে দেখি। ওভাবে নৌকা ঘুরবে না বোধহয়।...

শ্রীলতা ভাবলে, (সাড়ে আট পার হয়েছে রাত্রি) এমন মনে থাকে এক-একটা কথা।...

ছাড়া তো নয়ই। ছেড়ে দিলে নৌকা ফিরতো না। বরং একবার তো দড়ি টেনে টান টান রাখতে শ্রীলতাকে শুয়েই পড়তে হলো। ভাগ্যে পায়ের তেলো আটকাতে পেরেছিলো নৌকার একটা আড়াআড়ি কাঠে। তখন সুব্রতবাবুকেও দড়ি ধরতে হয়েছিলো। কি জোর বাতাস।

সত্যি কি ওই নীল দ্বীপটায়…

সুব্রতবাবু বাঁ হাতে দড়ি ধরেছিলো। শ্রীলতাকে ঘিরে তবে ডান হাতেও দড়ি ধরতে পারলে।

খালি গা সুব্রতবাবুর, তখনও জল গড়াচ্ছে। আণ্ডার-প্যাণ্টের উপরে টাওয়েল জড়ানো। তখন শ্রীলতার মনে পড়েছিলো নিজেকে। পিঠটা একেবারে খালি কোমরের নিচে পর্যন্ত। দু টুকরো সেই দুঃসাহসী স্নানের পোশাক। নাভির নিচে থেকে উরুর কয়েক ইঞ্চি যেমন ঢাকা থাকে এই আধুনিকতায়।

সুব্রতবাবু এমন কিছু মাঝি নয়। লনের নিচে যেখানে তারা জলে নেমেছিলো সেটা বাঁধানো ঘাট না হতে পারে, প্রায়-স্থির শান্ত শীতের জল ছিলো। কিন্তু সেটা সরোবর নয়, জীবিতা নদী।

সুব্রতবাবু বললে, মনে হচ্ছে স্রোতটা আমাদের দ্বীপটার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝ নদী থেকে ফিরতে হলে হাল লাগবে। সে হাসলো। আর ওখানে সত্যি হাঁস থাকতে পারে হয়তো।

ভয় করছিলো তখন শ্রীলতার। কিন্তু হাসিও তো রাখতে হয় মুখে। তখন লনের উপরে যারা তারা অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

সুব্রতবাবু বললে, স্রোতের বোধহয় একটা পয়েণ্ট অব নো রিটার্ন থাকে। সেখানে পৌঁছালে স্রোতের হিসাবই মানতে হয়। নিজে থেকে ফেরা যায় না। দেখি ভেবে। সুব্রতবাবু হাসলো। হয়তো দ্বীপে পৌঁছে ঠিক করতে হবে কি করে নৌকা ফেরে।

না, ডুবে মরার ভয় নয়। নদীটা এখানে বেশ চওড়া আর সাদা। এমন কি সাদা সাটিনে কাঁচের টুকরো আর নয় বোধ পড়ে। এখানে যেন ঢেউ আর তার গতিটাই আসল কথা। তা হলেও সাঁতার দিয়ে কোথাও নিশ্চয় পৌঁছানো যাবে। কিন্তু…

একটু নার্ভাসভাবে হেসেছিলো শ্রীলতা।

নদীতে সত্যি পয়েণ্ট অব নো রিটার্ন থাকে না। কিন্তু তুমি বলতে পারো না, কখন ঝড় উঠবে, অন্তত ঝড়ের মতো বাতাস। তুমি বলতে পারো না, নদীর স্রোতের সেই ঢেউগুলোই বাতাসকে তেমন কাছে টেনে আনে কিনা, যেন নিজের

বুকে, কিংবা বাতাসটা তেমন বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ে তেমন পাগলামি করতে থাকে বলেই নদীতে তেমন ঢেউ উঠে পড়ে।

নীল দ্বীপটাকে ছাড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা উল্টে গিয়েছিলো। আগ-গলুইটা যেন বিপদ ঘটালে আটকে গিয়ে কিছুতে। তখন কিন্তু ভয় করার মতো অবসর থাকে না। জ্যাবড়ানো জড়ানো অনুভূতিগুলো বরং মনে থেকে যায়। জলের শব্দ, দ্রুত চোখের সামনে আলোর রং বদলে যাওয়া, কানে শব্দের চাপ। তলিয়ে যাওয়ার অনুভূতি। পাশে আর একটা ঝপাং শব্দ।

তারপর মাথা তুলেছিলো শ্রীলতা। একটু ব্যথা লেগে থাকবে। কিন্তু কাশতে কাশতে জল ঝেড়ে ফেলতে মাথা ঝাঁকিয়ে সে হেসে ফেললে। জল সেখানে বড়-জোর উরু পর্যন্ত ছোঁয়। সুব্রতবাবু কথা বলতে গিয়ে কাশলো। নৌকাটাই বরং তলিয়ে দূর দূর করে কোথায় চলে গেলো।

খানিকটা দূরে গিয়ে তারা পায়ের তলায় শুকনো বালি পেয়েছিলো।

তাকে অবশ্য ঝড় বলে না। জোর বাতাস। আকাশ কালো হয়নি। বরং সেই বেলা ন'টায় দ্বীপের উপরে আকাশ উজ্জ্বল নীল। কিছু ভাঙে নি। কিছু কি হারিয়েছে?

সুব্রতবাবু হেসে বললে, বন্দুকটা আর নৌকাটা গেলো।

বাতাসটা তখন জেগে থাকবে, যখন মধুমালা দিদির জন্য কেনা কিন্তু ব্যবহার না করা স্নানের জামা যখন পরেছিলো শ্রীলতা।

সুব্রতবাবু হেসে বললে, এখানে রোদ থাকলেও বাতাসটা জলো, কারণ বালি ভিজে। চলো শুকনো জায়গায় যাই।

পিঠে হাত রেখে আবার হেসেছিলো সুব্রতবাবু।

হয়তো দ্বীপের বালি উড়ে তেমন হচ্ছিলো। একটা সাদা যেন সাত-আট ফুট উঁচু, পর্দাই যেন, জলের বুকের উপর দিয়ে, যেন তা কুয়াশা, যার ওপারে বাংলোর লন, বাগান সব আড়াল হয়ে গিয়েছে।

গোল নীল একটা দ্বীপ যার উপরে চকচকে নীল আকাশ, আর পায়ের তলায় ক্রমশঃ শুকিয়ে আসা বালি। যেন টেবলে রাখা গ্লাসবল। যেখানে যে বলের মধ্যে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

শীত শীত করছিলো। তা স্বাভাবিকই। সেটা শীতকাল তো। জলে পড়ার আগেও তো সাঁতরে সাঁতারের পোশাক ভিজেছিলো।

সুব্রতবাবু বললে, আমার এই তোয়ালেটা নাও। গা মুছে ফেলো।

শুকনো বালির উপরে পাশাপাশি বসেছিলো তারা। চারিদিকে বালি উড়ে

উড়ে যেন কুয়াশার পর্দা।

সুব্রতবাবু বললে, তোয়ালেটা প'রে ওগুলোকে বরং শুকিয়ে নাও। সুব্রতবাবুর শুকিয়ে ওঠা পিতল-হলুদ শরীর, যা হাল্কা, যাতে কিছু পেশীর উঁচুনিচু ছিলো, চোখে পড়ছিলো শ্রীলতার।

শীত শীত লাগছিলো তা মিথ্যে নয়। শ্রীলতা বলেছিলো, শীত শীত লাগছে।... শিউরে শিউরে উঠছিলো শরীর।

আর তারপর তারা একটা পরিচ্ছন্ন ছোট বালিয়াড়ির শুকনো কবোষ্ণ ঢালে শুয়ে থেকেছিলো। কবোষ্ণ শীতের রোদ। পাশে রাখা স্নানের পোশাক শুকিয়ে উঠছিলো।

না, দ্বিতীয়বারে কিন্তু তেমন মনে হয় না, যে এক ঘনিয়ে আসা ম্লান অন্ধকারে এক পিরামিডের উপরে তুমি পড়ে আছ। কারণ পাশে দু কনুই নিজের শরীরের ভার রেখে পিঠে রোদ নিয়ে সুব্রতবাবু।...

আয়নার দিকে মুখ ফিরালো শ্রীলতা। সে কি কিছু ভাববে ?...

ঝড় নয় ঠিক। বরং বাতাসে বালি উড়িয়ে একটা কুয়াশার কবোষ্ণ ঘের। যা উজ্জ্বল, সাদা, কিন্তু ভিতরে তোমরা একা, ওপারের কোন দ্বীপের কিছু দেখা যায় না।...

কিন্তু এটা তো হোটেল। আর সেটা তখন ছিলো হোটেলের পোর্টিকো মার্কা লাউঞ্জ, শ্রীলতার বাংলো নয় যার লনে ছেলেরা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে আয়ার সঙ্গে হাত-পা ধুতে গেলে ক্লান্ত শ্রীলতা হয় গরম ঘাসে কিংবা বাগানের বেতের চেয়ারে বসবে।

তা ছাড়া টুটুল নতুন ব্যাট পেয়েছে। দোতালায় উঠবার সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে দুভাই-ই ফিরে এলো আয়াকে নিয়ে।

কোথায় খেলবি ?

টুটুল দোতালার জানলা থেকে হোটেলের পশ্চিম দিকে একটা ছোট লন দেখতে পেয়েছে। আয়াকে বললে শ্রীলতা, তুমি একটু সঙ্গে থেকো। দেখো জানলার কাঁচ-টাচ না ভাঙ্গে।...

পুরুষরা কিন্তু ভয় পায়, যেন কাঁচের পুতুলের হাত-পা কিছু ভেঙ্গে ফেলেছে। অনেক পরে, তখন সুব্রতবাবু ভাবতে শুরু করেছে কি করে ফেরা হবে, তখন প্রায় বিকেল হতে চলেছে, অনেক মানুষের গলার শব্দ, মোটর বোটের শব্দ শোনা গিয়েছিলো সেই কুয়াশা ভেদ করে।

সব চাইতে আগে নেমেছিলো মধুমালা দিদি।

একজন বললে বন্দুকের শব্দ করলে না কেন ? নৌকো ডুবলো যখন।

অন্য একজন হেসে বললে, হাঁস মারতে মারতে গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিলো।

সুব্রতবাবু বললে, তোমার কিছু অসুবিধা হয়নি তো, মধুমালা ?

এখন দেখছি হবে, মধুমালা হাসলো, রাত্রির ভোজের মাংসওয়ালাকে বলে দিয়েছি এত হাঁস আসছে যে, মুরগী-টুরগী দরকার হবে না। নৌকো ডুবলো কি করে ?…

যেতে যেতে আঙ্গি শ্রীলতার পাশে থেমে দাঁড়ালো। বললে, লতাদিদিমণি, ইনি আমাদের চন্দননগরের জামাইবাবু নয় ?

ওমা ? সে কি ? ইনি তো কমরেড ঘোষ। আজই প্রথম দেখছিস এঁকে।

আঙ্গি বিব্রত হয়ে টুটুল-মিটুনের সঙ্গে চলে গেলো।

আর শ্রীলতা বললে, সুব্রতবাবু, মধুমালাদিদির সেবার কি ছেলে হয়েছিলো, না মেয়ে ? অনেকদিন সংবাদ রাখা হয় না।

—মেয়ে।

—নিশ্চয় দিদির মতো হয়েছে। কি নাম রেখেছেন ?

—শ্রীলতা।

—ওমা ! সে কি !

বিব্রত হয়ে যেন চোখ নামালো সুব্রতবাবু।…

দুহাত থেকে উল কাঁটা নামিয়ে দু হাতের আঙুলগুলোকে একত্র করে ফোটালো শ্রীলতা। মাথার কিছু উপরে হাত তুলে আলসেমি দূর করলে। আয়নায় নিজেকে দেখে যেন বিস্মিত হলো।…

পরের দিনও উৎসব ছিলো। রাতের খাওয়া শেষ হলে কাছের অতিথিরা চলে গেলে, আর দূরের যারা, তারা যখন নিজেদের ঘরের দিকে একে একে যেতে শুরু করেছে, হাই তুলে তুলে. শ্রীলতা বলছিলো, আমিও একটু ঘুরে আসি না কেন বাড়ি থেকে ?

—তুই যে ক'দিন থাকবি বলেছিলি। বললে মধুমালা।

—কাল সকালের দিকে ফিরবো।

—এত রাতে যাবি কি করে ?

ওদের হাসাহাসির মধ্যে শ্রীলতা একা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিলো। নিজেদের বাংলোর হাতায় ঢুকে খুব জোরে জোরে ইলেকট্রিক হর্ন বাজিয়ে গাড়ি যখন পার্ক করলো, রাত দুটো বাজে।

দরোয়ান দরজা খুলে অবাক। দোতলার ল্যাণ্ডিং-এ শ্রীযুত মিত্র অবাক।

…শ্রীলতা হাসলো আবার উল হাতে নিয়ে।…

শ্রীলতা বসেছিলো, বসো, স্নান করে আসি।

মিত্র বললে, ওরা কোথায়, টুটুল, আঙ্গি।…

—এমন করে এলে যে একা?

—আহাআ।

অনেক গরম জল আর সাবান দিয়ে যেন পথের ধুলো থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীলতা ঘরে গিয়েছিলো।

মিত্র গম্ভীর মুখে বলেছিলো, অন্যের বিয়ের উৎসবে মেয়েদের কিন্তু নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

—ভারি জানো।

ক্ষতিপূরণ…

স্বামীর বুকের সঙ্গে আদরে গলে যেতে যেতে শ্রীলতা বলেছিলো, আমাকে কিন্তু একটা জিনিস দিতে হবে।

—কি এমন?

—আহা মা। শোন কাল সকালে আমাকে দু' হাজার ক্যাশ দিওতো। একটা নৌকো হারিয়েছি, একটা শটগান।

শ্রীলতা হেসে হেসে নৌকাডুবি আর বন্দুক হারানোর গল্পটা করেছিলো। জেলেটির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আর বন্দুক মধুমালাদিদির পাশের বাড়ির ওদের।

মিত্র বলেছিলো, তাও ভালো। আমি ভাবি টুটুলের বয়স তো সবে এক বছর, এখনই…

সেদিন শ্রীলতার পরনে ছিলো সোনালি হলুদ শিফন। আজ, বিকেলে কেন সকাল থেকেই সুব্রতবাবুর পরনে ক্রোম-হলুদ ফ্লানেলের জামা ছিলো। আর, এক জন কিন্তু সত্যি ভাবেনি, কমরেড ঘোষ সুব্রতবাবুই যখন প্রথম শুনেছিলো একজন কমরেড আসছে।

শ্রীলতা বললে, আপনি অধ্যাপক ছিলেন তখন সুব্রতবাবু।

—এখনও।

—এরা বলছে কমরেড।

—ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করতে ভালো লাগে।

চা শেষ হয়েছিলো তখন।

শ্রীলতা বললে, হঠাৎ তার হাসি পেয়েছিলো যেন তারপর যেন তার বুদ্ধির

বাইরে গেলো ট্রেড ইউনিয়ান আর একটা ফার্মের প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি অবস্থানের ব্যাপারটা।

—কিন্তু আপনি কি মালিকদের একজনকে শুভযাত্রা জানাতে আসেননি ?

সুব্রতবাবু হেসে বলেছিলো, কোম্পানির লাভে ট্রেড ইউনিয়ানেরও লাভ। মিস্টার মিটারের সঙ্গে আলাপও করা বটে। আমাদের এর আগে দেখা হয়নি তো!

—ওরা যদি বলে কমরেড ঘোষ মালিককে খোসামোদ করছিলো ? শ্রীলতা হেসেছিলো।

—মিথ্যা বলবে না। ওঁর কোম্পানিতে যে রিঅ্যাকশনারী পার্টির ইউনিয়ান পাকাপাকি হয়ে বসেছে তাকে সরাতে গেলে আমাদের মালিকের সঙ্গে খাতির রাখতে হবে। মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করবো বলেই আমি এসেছি।

দুজনেই হেসে উঠেছিলো।

কি যে তাড়াতাড়ি ঘটে।...

তুমি কি সুব্রতবাবুর রাজনৈতিক কৌশলটাকে ময়লা মনে করবে ? ছেলেমানুষি নয় ? কি জানি এতে হয়তো কাজ হয়। হয়তো মালিকপক্ষও একে প্রশ্রয় দেয়। পুরুষদের রাজ্যের সংবাদ নাকি এটা, পুরুষালি ব্যাপার ?

কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ছেলেদের নিয়ে আঙ্গ ফিরলো। আর সোফারও। কথা ছিলো বেলা চারটেতে ফেরা হবে। তখন থেকে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে সোফার। এখন তো প্রায় পাঁচটা হয়। সন্ধ্যা ঘোর হওয়ার আগেই পৌঁছে যাওয়া যায় এখনও রওনা হলে।

চারটেতে ফেরার কথা এখন সে সময়টা পার করে দিয়েছে শ্রীলতা। যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো শ্রীলতা। সোফার, আঙ্গ, টুটুল-মিটুন, সুব্রতবাবু সবাই, সবাই যেন সিদ্ধান্তের জন্য চেয়ে আছে শ্রীলতার দিকে। এই সময়েই ফেরার কথা। সিদ্ধান্ত তো আগেই নেয়া আছে।

অবশেষে শ্রীলতা বলেছিলো, আঙ্গ যাবে ফিরে টুটুল-মিটুনকে নিয়ে। টুটুল বলেছিলো, তুমি থাকবে, মা, এখানে একা ?

আর সেজন্যেই যেন সিদ্ধান্ত পাল্টে নিয়ে সোফারের সঙ্গে আয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীলতা।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে শেষ ধাপের উপরে দাঁড়িয়ে টুটুল-মিটুন আয়ার যাওয়া দেখলে।

সুব্রতবাবু বললে, বেশ ছেলেরা তোমার। টুটুল তো একেবারে মিস্টার মিটার যেন।

—মিটুনও আমার কম নয়। ছয় হচ্ছে এবার।

—হ্যাঁ, মিটুনও ভালো।

বয়সের কথা যদি বলো, টুটুলের আট হলো। মিস্টার মিটারের ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। শ্রীলতার আঠাশ। সেদিক দিয়ে সুব্রতবাবুই সবচাইতে অভিজ্ঞ। হয়তো পঁয়তাল্লিশ। কানের কাছে চুলে যেন মরচে রং কিছু। চোখের কোণ কিছু কোঁচকানো। কিন্তু চকচকে চোখ। ক্রোম-হলুদ জামা, আর রোদে-পোড়া পিতল রং-এর মুখ। মনে হয় না—বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আর রঙের কথা যদি বলো, টুটুল বরং শ্যামল। আর মিটুন সোনালি।

তখন শ্রীলতা উঠে দাঁড়িয়েছিলো। দোতলায় তার স্যুইটের দিকে যেতে যেতে লাউঞ্জ পার হতে হতে হেডওয়েটারকে পেয়ে বলেছিলো সাত নম্বরে আজ চারটে ডিনার। দুটো সাতটাতেই। হলে। আর দুটো ঘরে আটটার পরে, কিংবা খবর দেবো যখন।

মায়ের ভুল ধরে হেসে টুটুল বলেছিলো, আমরা তো আজ লোক তিনজন! চারটে বললে কেন? বাবা ডুবাইতে এতক্ষণে।

হেসে সুব্রতবাবু বললে, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তোমার শ্রীলতা।

হেসেছিলো শ্রীলতা। বলেছিলো, ডিনার আটটায়।...

এখন নটা হতে যায়।

ডান হাতের পিঠে ঠোঁট আড়াল করে হাই তুললো শ্রীলতা।

টুটুল-মিটুন এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ স্বাস্থ্য ভালোই ওদের। ভালো রাখতে পেরেছে শ্রীলতা। গড়ন আলাদা হয়, মিটুন হয়তো বড় হলেও ছিপছিপে হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য নিশ্চয় ভালো রাখতে পারবে।

সাতটাতে ঠিক সাতটাতে, চিরদিন যেমন, হলে বসে ছেলেদের ডিনার খাইয়েছে শ্রীলতা। তার বাড়িতেই তাই নিয়ম। একসঙ্গে খেলে ছেলেদের দিকে চোখ রাখা যায় না। পেট ভরে না, কিংবা বাজে জিনিসে ভরায়।

আর তারপরে ওরা যখন খাচ্ছে, শ্রীলতা আজ উঠে পড়েছিলো। বলেছিলো, তোরা খেয়ে আয়। একা একা সিঁড়ি চিনে উঠবি। সে বেশ মজা হবে।

আর শ্রীলতা ঘরে এসে স্নান করে নিয়েছিলো, শাড়ি পাল্টেছিলো। অলঙ্কারে বদলটদল করতে শুরু করেছিলো।

তারপর দুই ছেলের খাটের মাঝখানে চেয়ারে বসে গল্প বলতে শুরু করে-ছিলো। তার বাড়িতেও তাই নিয়ম। তাতে ছেলেদের ঘুম ভালো হয়।

তখন টুটুল জিজ্ঞাসা করেছিলো, শ্রীলতা সিনেমায় যাবে কিনা।

শ্রীলতা গল্প বলেছিলো। সে-সব গল্পই হয় রামায়ণ-মহাভারতের, কখনও একটু ঘুরিয়ে রূপকথার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিয়ে।

শ্রীলতা বলেছিলো : এক রানী একদিন দেখলে তার বড় ছেলেটা বড্ড একা একা। সে তখন ভগবানকে কত বললে, ঠাকুর আমার সোনার টুটুলের একটা ভাই এনে দাও, বন্ধু এনে দাও।

টুটুল বললে, এ তোমার রাম-লক্ষ্মণের গল্প।

—ওমা তাই।

মিটুন বললে, আমি লক্ষ্মণ।

টুটুল বললে, তার চাইতে রানী যদি মন্তর জানতো আর যদি অর্জুনের মতো একটা ছেলে হতো ভালো হতো। জানো মা, এঞ্জিনীয়ার সাহেবের ছেলে আমাকে বলে আমি কোনদিনই ভালো তীরন্দাজ হবো না। যদি আমাকে অর্জুনের মতো ভাই দিতে, সে যদি উড়ন্ত হাঁস মারতে পারতো, রবিনহুডের মতো, তাহলে মণ্টু খুব জব্দ হয়।

—ওমা, তাই ? একদিন তো রানী এক সন্নেসীকে পেলো। অনেক ক'রে বললে তাকে আমার বড়ছেলেকে একটা বন্ধু দাও, ভাই দাও। সন্নেসী কোমর থেকে একটা শিকড় দিয়ে বললে স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে খেয়ে নিস।

টুটুল বললে, আমি কিন্তু বড় হলে লর্ডগট্ হবো।

—সে কি ?

—সেনাপতি।

—না, তুই হবি একজন মস্তবড় এঞ্জিনীয়ার।

—বাবার মতো ?

—হ্যাঁ। তুই সাবমেরিণ তৈরি করবি, জাহাজ তৈরি করবি। মিটুন জামা খুলেছিস কেন ?

মিটুন বললে, আমি কি হবো মা ?

হাসলো শ্রীলতা। তুই একটা নাগা সন্নেসী হবি।

তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো।...

আর কি উল বুনবে শ্রীলতা ? রাত বেড়েছে। এখন বরং শীত শীতই লাগছে। এদিক-ওদিক চাইলো সে। হাসলো। না একে কি তুমি কোনভাবেই নীল বলতে পারো ? যেন অভিজ্ঞতার রং সাদা বাদামীতে মেশানো।

সেই নৌকাটার সেই বিছানার চাদরের মতো ছোট পালটা কিন্তু ছিলো যেন গেরিমাটিতে রাঙানো। যাকে গৈরিক বলে।

শ্রীলতা ঘড়ির দিকে চাইলো। নটা বাজে। একেবারে অবাক হ'য়ে গেলো যেন সে। পর্দা ফেলা থাকলেও দরজা তো খোলাই আছে। সে কি একবার উঠে দেখবে ?

তুমি এখন হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হ'য়ে যাবে ? এসব কি কাণ্ড ? এই রাত জেগে বসে থাকা ?...

এখন সকাল হয়েছে। সকাল ক'রেই উঠেছে শ্রীলতা। এখন অনেক কাজ তার। একদিনের জন্য আসা তবু দুটো সুটকেশ এনেছে। তা থেকে যা বেরিয়েছে তা আবার ভরে নিতে হবে। গাড়িটার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলে দুটোকে সাজিয়ে নিতে হবে। ব্রেকফাস্ট করেই রওনা হবে তারা। কাল বিকেলেই তো ফেরার কথা ছিলো।

টুটুলের ব্রাশে পেস্ট দিয়ে, মিটুনের ব্রাশ নিজে নিয়ে মিটুনের দাঁত মাজতে বসেছে সে বাথরুমের দরজার কাছে। মিটুন মিষ্টিমিষ্টি পেস্ট খেয়ে ফেলে, নয় মোটেই মুখে দেয় না ব্রাশ। টুটুল ব্রাশ নিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে পায়চারি করে আর দাঁত মাজে। কি ক'রে যে ছেলেরা যার যার বাবাকে নকল করে। আশ্চর্য নয় ?

কাল রাতে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে প্রথমে বারান্দায়, পরে ল্যাণ্ডিং-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো শ্রীলতা। তখনও হোটেলে অনেক আলো ছিলো। কিন্তু আলোটাকে হলদে আর বাসী মনে হয়েছিলো। রাত ন'টা, তবু যেন ক্লান্ত রাতজাগা আলো।

সে বরং শুতে গিয়েছিলো।

তখন টুটুল বেশ ভালো ঘুমাচ্ছে। যেভাবে ঘুমায়। ডানপাশ ফিরে ডানহাত তুলে বাঁ কাঁধের উপরে রেখে। ঠিক যেন, হেসেছিলো শ্রীলতা, গমলিং মিটারের প্রেসিডেণ্ট, শুধু ঠোঁট দুটো এখনও লাল।

কিন্তু—

ভয় পেয়ে গিয়েছিলো মৃদুভাবে শ্রীলতা। মিটুনের বিছানায় সে তো নেই। খুঁজতে বেশী হয়নি। অন্য শোবার ঘরটিতে ঢুকে শ্রীলতা দেখেছিলো মিটুন মায়ের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে, একেবারে নাগা সন্নেসী। আচ্ছা—সত্যি কি ও কখনও একা একা বোধ করে ? তা কি সম্ভব ? ঝগড়া করে না, কিন্তু যেন পৃথক হয়ে থাকতে চায় আর সকলের থেকে। কিন্তু তা কি সম্ভব ? হঠাৎ নিজের শোবার ঘরেই টুটুলের পাশে তার থেকে পৃথক মনে হয়েছে নিজেকে ? নাকি ভয় পেয়েছিলো ? তাই মায়ের বিছানায় ?

ইস্। কি ঠাণ্ডা। এই শীতে যেন বরফে স্নান করে উঠেছে। দেরি করতে পারলো না শ্রীলতা। তাড়াতাড়ি মিটুনের পাশে শুয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে,

যেন নিজের গায়ের উত্তাপ দিয়ে তার গা গরম করে তুলবে।

টুটুল দাঁত ব্রাশ করতে করতে পায়চারি করছিলো। সে তাড়াতাড়ি এসে বললে, দেখো কাণ্ড! ফ্ল্যাটের দরজা খোলা? কে খুললো? সারারাত খোলা ছিলো নাকি?

—ওমা! তাই?

তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়ে দিলো মিটুনের শ্রীলতা। টুটুলকে বললে তাড়াতাড়ি স্নান করে নে। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা।

মিটুনের মুখ মুছে দিলো শ্রীলতা। তার লাল গোলাপের মতো ঠোঁট ভাঙচুর হ'লো। তার তা দেখে সেখানে চুমু খেলো শ্রীলতা।

টুটুল বললে, মা, আমি কিন্তু কোনদিন একটা পাইনে ওখানে।

শ্রীলতা হেসে বললে, আয়, আয় স্নান করি। ব্রেকফাস্টের আগেই গাড়ির দোকানকে টেলিফোন করতে হবে।

তিনজনে স্নান করতে শুরু করলে তারা। তত গরম নয় জল। ঠাণ্ডাই। শীত শীত করে। শ্রীলতা বললে, সাহস করো। সেও সাহস ক'রে প্রচুর সাবান দিয়ে অনেক ঠাণ্ডা জল ঢেলে স্নান করতে শুরু করলো। টুটুল মিটুনও কম যায় না। মিটুন তো টবে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মিটুন ভিজে শাড়ীর আড়ে মায়ের বুক দেখতে পেয়েছিলো। ছুটে এসে কোলে বসে মুখ লাগালো।

শ্রীলতা বললে, ছাড়, ছাড়, দস্যি, নাগা কোথাকার।

টুটুল বললে, তুই আর বড় হবি না, মিটুন।

তিনজনে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এলো তারা।

আয়, আয়, জামা পর। কোনটা পরবি কে? টুটুল তুই এই ইস্পাতনীল স্যুটটা নে। মিটুন বললে, সোনারটা পরবো।

—আচ্ছা বোকা, ওটা কি সোনা? উলের? হাত দিয়ে দেখ। আর রং ক্রোম ইয়লো। জরদা, তাই নয় মা? টুটুল বললে।

পর, পর আমার শীত লেগে গেলো। শ্রীলতা বললে আবার হেসে। ছেলেদের জামা পরিয়ে (ইস্পাতনীলে টুটুল, মিটুন ক্রোমইয়লো জ্যাকেট) টেলিফোন করলে গাড়ির দোকানে শ্রীলতা।

না, তাদের কোন আপত্তি নেই। ন'টায় গাড়ি পৌঁছে দেবে হোটেলে।

সাড়ে আটেই ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে। ন'টাতে গাড়ি এলো। হোটেলের জন্য

একটা আর গাড়ির জন্য একটা দুটো চেক্ সই করলো শ্রীলতা। এটা তাদের জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট। তা, এটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক চেক্ অবশ্যই সই করতে হয় গমলিং মিটারের প্রেসিডেণ্ট মিস্টার মিটারকে। এটা যে বিশেষ কি অ্যাকাউণ্ট তা বর্ণনায় ধরা পড়ে না। সব খরচই তো দুজনের। তা হলেও এটা পৃথক। বলবে কি খেলার ? অন্তত একটা বৈশিষ্ট্য দেখো। এটায় মিস্টার মিটারের সই পরিষ্কার বাংলা হরফে শুভব্রত মিত্র। প্রত্যেকটা অক্ষর যেন স্নিগ্ধ, স্পষ্ট, যেন খেলার হাসিতে ভরা। সেই সই-এর তলে তলে নিজের নাম সই করলে শ্রীলতা। যেন যৌথ জীবনের প্রমাণ। আর কত স্নিগ্ধ।

লাল টক্‌টকে সিঁদুর রঙের ছোট্ট গাড়ি। যেন লনে টুটুল মিটুনও অনায়াসে চালাতে পারবে বলেই কেনা। খেলনা বললে হেসো না।

পিছনের সিটে দু'ভাই পাশাপাশি, শ্রীলতা চালাচ্ছে।

তা, এ ভাবেই তো দু'ভাইয়ে সারাজীবন পাশাপাশি থাকতে হবে। হ্যাঁ, তাদের সম্বন্ধে পরিকল্পনা আছে শ্রীলতার।

শ্রীলতা খুব উচ্চাভিলাষী তার ছেলেদের সম্বন্ধে। দোষ কি তাতে। তার মনের নিভৃতে, যেন তা এক নীল নীল দ্বীপই, যেখানে সে তাদের লালন ক'রে কেউই তার খবর পেতে পারে না। সুতরাং কেউ তাকে ঠাট্টাও করতে পারবে না।

ইস্পাতনীল স্যুটে সুন্দর দেখাচ্ছে টুটুলকে। সে এঞ্জিনীয়ারই হবে। তার বাবার চাইতেও বড়। এমন এক এঞ্জিনীয়ার যে দেশের জন্য নতুন সাবমেরিণ, নতুন ফাইটার তৈরি করে দেবে।

কাউকে কাউকে কিন্তু হলুদ হলুদ, ক্রোম-ইওলোই বলো, জামায় বেশ দেখায়। তা লাগে কেন ? সন্ন্যাসীরা কি সে ধরনের রঙের জামা পরে ব'লে ?

নৌকোর সেই পালটার রং ছিলো কিন্তু গেরুয়া, গৈরিকই বলতে পারো। আবার দেখতে পেলো মিটুনকে সে গাড়ি চালানোর আয়নায়। ক্রোম-ইওলো (নাকি পীত ?) জ্যাকেটে, যেন সূর্যমুখী ফুলের মতো।

মিটুন সম্বন্ধে সে এখনও কিছু ঠিক করেনি। সে কি ইণ্ডাস্ট্রির প্রেসিডেণ্ট হবে কিংবা অধ্যাপক, কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ? কেমন অবাক হয়ে দেখছে না ? সে ভাবছে হয়তো এমন ভারি ভারি ট্রাক, লরি, বাস এ সবের মধ্যে দিয়ে খেলনার মতো সিঁদুরে রঙের ছোট্ট পলকা গাড়িটাকে মা কেমন মসৃণ সহজভাবে চালিয়ে নিতে পারে যখন চারিদিকে বিপদের মতো ধেয়ে আসে বড় বড় গাড়ি।

শ্রীলতা ভাবলো, তুমি বলতে পারো না। কেমন যেন একটু গোলমেলে, একটু অসাধারণই বলতে হবে। তেমন হলে সে পরে কি সন্ন্যাসী হতে চায়। সন্ন্যাসীরা

হলুদ পোশাকও পরে কখনও কখনও।

হয়তো সন্ন্যাসী হ'লেই তাকে মানায় সেই অসাধারণত্বের জন্তে। অসাধারণত্বই নাকি? হঠাৎ যেন জল এসে যেতে পারে শ্রীলতার চোখে। হয়তো তাই মানায়, সন্ন্যাসী হওয়াই মানায়। কোনদিনই অন্ত কোন পুরুষেব সাহায্য নিতে হয় না—আর তাই যেন ভালো। কিন্তু…তারা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, খুব নরম পায়ে সে চলা। আঘাত দিতে তো চায় না। কিন্তু তাতে কি লজ্জা সত্বেও পৃথিবী বলে না তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না। ঠিক মায়ের মতো? তবু সে চলে যেতে থাকে যেন এক সুনীল আকাশের খোঁজে। আর যেন তার চলে যাওয়া পৃথিবীকে বলতে থাকে তুমি পাপী। সকলকে জানিয়ে বলে না, ব্যথা দেবার জন্ত বলে না, মনে করিয়ে দেয় শুধু, শুধু চলে গিয়ে! …তাই যেন মানায় এসব বেলায়।

আর কত নীল, কত গভীর নীল হয় সেই সন্ন্যাসীর আকাশ। শ্রীলতা ভাবলে, না পৃথিবী, না মেয়েমানুষ, আমরা এই সন্ন্যাসীদের মনকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। কত নীল আর কোথায় সেই নীল আকাশ।

শ্রীলতা হাতের পিঠে চোখ ছুঁইয়ে নিয়ে ভাবলে এখনও কত ছোট মিটুন, কতটুকু দেখছো না? হলুদ জ্যাকেটের বড় বড় কলারের মধ্যে ওর মুখটা সূর্যমুখীর মতোই দেখাচ্ছে। সে হাসলো।

ঠোঁটের কোলে প্রায় নিঃশব্দ শিষে একটা গানের কলি ফোটাতে ফোটাতে পটুহাতের ষ্টিয়ারিং-এ বিপদের মতো ধেয়ে আসা কালো, ধূসর ট্রাক, লরি।

বাসের মধ্যে দিয়ে সহজ মসৃণ গতিতে লাল খেলনার মতো নতুন গাড়িটাকে চালাতে লাগলো শ্রীলতা হাসি হাসি মুখে পথের নিরাপদ গলিগুলোকে চকচকে চোখে খুঁজে খুঁজে।

পায়রার খোপ

রানী স্বর্ণকুমারী জুবিলি হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচার গগন আচার্য স্বপ্ন দেখছিল নিজের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে। ভোরের স্বপ্ন, যে স্বপ্ন নাকি সত্য হয়।

অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচার বলতে সাধারণত যে তরুণ বয়সের একজনকে মনে আসে, তেমন নয়। গগন আচার্যর বয়স এবার ষাট হল। পাড়ার বয়স্ক লোকেরা বলে গগনবাবু, ছেলেরা বলে দাদু। চাকরি প্রায় শেষ হয়ে এল। আর দু মাস আছে। ষাটেই চাকরি যাওয়ার কথা, যদি না যায় তবে তার একমাত্র কারণ হবে যে সে উদ্বাস্তু। না, না, না। আর কোন কারণ নেই। সে মনে রাখতে চায় না। সে একেবারে ভুলে যেতে চায়। সে সেই ব্যাপারটার দরুন কোন সুবিধা নিতে চায় না। সেই চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। তখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। এখন রোগা-রোগা হাড়েমাসে জড়ানো তামাটে রঙের এক বুড়ো মানুষ, মুখে অধিকাংশ সময়ে দু-একদিনের দাড়ি, ঘোলাটে চোখ, মাথার সাদা চুল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

আজ সে স্বপ্ন দেখছিল পায়রার খোপটার দরজা কী করে কার ভুলে আবার খোলা ছিল, আর আজ আবার সেখানে কিছু ছেঁড়া পালক পড়ে আছে যা প্রমাণ করবে আবার সেই অন্ধকার থেকে তৈরি ভাম এসেছিল আর আর-একটা পায়রা কমেছে। স্বপ্নে যেমন হয়, কিছুতেই হাত উঠছিল না, কিছুতেই পা দুটো তাকে বইতে পারছিল না, এমনকি চেষ্টা সত্ত্বেও সেই ভামের চেহারা নেয়া অন্ধকারকে যে দূর দূর বলবে এমন শব্দ কিছুতেই তার মুখে তৈরি হচ্ছিল না।

চাপা বোবা কান্নার মতো শব্দ করে সে উঠে বসল। না, স্বপ্ন সে মানে না। স্কুলে সে বিজ্ঞান পড়ায় না? সে তো সেই সেকালে চল্লিশ বছর আগে বি-এসসি পাশ করেছিল বটে। স্বপ্ন ফলে, এরকম বিশ্বাস সে করে না। স্বপ্নের অন্য রকমের ক্ষমতা আছে অবশ্য, তা মিথ্যা হলেও শরীরটাকে যেন থেঁতলে দিয়ে যায়। ঘুম ভেঙে গেলেও উঠে বসলেও হাত পা চলতে চায় না। ক্লান্তিতে গোটা শরীরটাই ধুঁকতে থাকে।

পাড়ার হোমো-ডাক্তার বলেছে এমন সব স্বপ্ন দেখার কারণ নাকি ডিস-পেপসিয়া। তা, ঘুমের থেকে উঠে এখন মুখের মধ্যে বিস্বাদ লাগছে বৈকি।

সে বিজ্ঞানের মাস্টার বটে। সে মনোবিজ্ঞানের বিষয়ও কিছু কিছু শুনেছে।

তার ক্লাশে পড়ানোর ফিজিক্স কেমিস্ট্রির তুলনায় কিন্তু সে বিজ্ঞানকে বরং নভেল-টবেলের মতো ধোঁয়াটে আর কাল্পনিক মনে হয়। তারা, তা সত্ত্বেও, স্বপ্নের এক-রকম ব্যাখ্যা করে।

পায়রার খোপ একটা সত্যই আছে তাদের বাড়িতে। কাল রাত্রিতে শোবার আগে কি কেউ কমে-আসা পায়রাগুলো সম্বন্ধে কিছু বলছিল, সেজন্যই কি স্বপ্ন? তাও যদি হয়, কী ব্যাখ্যা কাল সকালের স্বপ্নের?

গরম, গরম। গরমের স্বপ্নই সে দেখছিল। গরম, জ্বালা। আগুন নয়, জ্বালা। কাল ভোরের স্বপ্ন, সে স্বপ্ন যেন সেই জ্বালা থেকে পরিত্রাণের জন্য। আরও জল, আরও গভীর জল, পুরু জলের প্রলেপ। নদীর তলার জলে, স্ফটিকের থামের মতো একটা বৃষ্টিধারার মধ্যে ডুবে গিয়ে, ঢুকে গিয়ে সে জ্বালা ভুলে স্থির হয়ে যেতে চাইছিল। যে জ্বালায় প্রতি রোমকূপ পুড়ে উঠছে, কপালের খুলির নিচে যেন গ্রীষ্মের একশ চল্লিশ ডিগ্রি তাপ। আর সে তাপে অবিরত চেষ্টা করছে যে জলের থামের মধ্যে ঢুকতে পেরেছে তাকে আরও শীতল করতে, যেন তা সমেত নদীর গভীর তলায় তলিয়ে যেতে।

ভয়ে আঁ আঁ ক'রে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কাল। দু-এক মিনিট যেন বুঝতেই পারেনি কোথায় আছে সে। সারা শরীর ভিজে। সারা মুখে জল। খুব কাঁদলে যেমন নাকেও সর্দি হয়, সে উঠে বসে কোঁচার খুঁটে নাক মুছেছিল।

অবশেষে সে আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল সে তার নিজের ঘরেই বটে। চোখের মণি দুটিকে যেন খানিকটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে তবে সে দেখতে পায়। তেমন করে দেখেছিল ব্রজবালা (কী আশ্চর্য, ব্রজবালাই তো তার স্ত্রীর নাম) মেঝেতে ব'সে সেই ভোরে নেকড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে সলতে পাকাচ্ছে। সলতে! আশ্চর্য, কত সলতে লাগে সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে? সেই সন্ধ্যায় প্রদীপ দেয়া হবে তার জন্য দুপুরে, রাতে, এই সকালে······

আজ কিন্তু ব্রজবালা সলতে পাকাচ্ছে না বন্ধ ঘরের মেঝেতে বসে।

গগনবাবু দেখলে দরজা খোলা। তাহলে ব্রজবালা আগেই উঠে গিয়েছে। সে বিছানা থেকে নেমে ঘরের মেঝেতে দাঁড়াল।

অবশ্য, অন্য কাজ কী-ই বা আছে? আজ দুদিন ধরে মেজ বউমা রান্না করছে। রান্নাই বা কী? তিনকৌটো চালের ভাত, একমুঠো ডাল, তিন-চারটে আলু-পটলের তরকারি। মাছ···

তার আগে অবশ্যই এক কাপ চা। হ্যাঁ, চা বৈকি। চায়ের পরে একটা বিড়ি। তাহলেই গগন আবার পৃথিবীর মুখ দেখতে সাহস পায়। না, মাছ···

পৃথিবীর মুখ ? কী যেন বলে···না, মাছ কখনই নয়। কী আশ্চর্য, মাছ কেন হতে গেল ? তার বেশ মনে পড়ছে, মেজবউমার একটা নাম আছে। সে যেন খুঁজে বার করল, মেজবউমার নাম স্বলতা।

তাহলেও এটা বোধ হয় ঠিকই যে তার আর স্কুলে পড়ানো উচিত নয়। সে ভুলে যাচ্ছে অনেক কিছু। মনে থাকে না, মনে এলেও তার আধখানা যেন হারিয়ে যায়। পাড়ার হোমো-ডাক্তার বলেছে, এটাও নাকি পাকস্থলীর দোষে হয়।

স্বলতা প্রথম একমাস পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুবি তাকে দিয়ে চা করাত সকালে আর সন্ধ্যায়। আজ তিন-চারদিন থেকে স্বলতা রান্না করতে পারছে আবার। তাহলে স্বলতা ফিরেছে। আর সেই সুযোগে ব্রজবালা আবার সলতে পাকাচ্ছে।

তা সলতে পাকানো বরং ভালো স্তব্ধ হয়ে বসে। না, না। না। না, না। না। কাল খেতে বসে যেমন হল। বুদ্ধিটা কার যেন ? মনে পড়ছে না। যাক, ব্রজবালাকে সময়মতো স্নান করানো যাচ্ছে। তারপর একদিকে গগন, মাঝখানে ব্রজবালা, অন্যদিকে ও। ও, মানে, ছোট ছেলে। দাঁড়াও। এখুনি মনে হবে, সুবিই তো তার নাম। সুভাষ থেকে সুবি। কার এমন নাম আর বাংলাদেশে সুভাষের মতো। এই বুদ্ধি করেছিল সে-ই। ব্রজবালাকে মাঝখানে বসিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দুদিন ভালোই হয়েছিল। কাল প্রথম গ্রাস খাওয়ার পর, দ্বিতীয় গ্রাসের জন্য পাতে হাত দিয়ে কী যেন মনে পড়ে গেল ব্রজবালার। যেন ভাবছেই, ভাবছেই। হঠাৎ বললে —ও মা। কেউ খায়নি যে। সকলের আগে নিজে খেতে বসার লজ্জা যেন। তারপর ভাতমাখা হাতে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে হু হু করে কেঁদে উঠে বলতে শুরু করলে—কেউ খায়নি, কেউ খায়নি···

গগন বলেছিল (এই তো বেশ মনে পড়ছে তার), আহা, অমন করে না, অমন করে না। দেখো, দেখো, দেখো, মেজবউমা কাঁদছে। আমাদের মেজবউ, দেখো।

দড়ি থেকে গামছা নিয়ে মুখ মুছলে গগন। চোখ মুছলে। নাক ঝাড়তে হল।

মেজবউমার পরনে পাড়ওয়ালা শাড়িই বটে। কিন্তু সিঁথি সাদা, কপাল সাদা। সেও হাঁটুর উপরে মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল।

—না, না। সুবি, কখনও মাছ নয়। এ বাড়িতে আর কখনও মাছ আসবে না।

—না, বাপু,তার চাইতে সলতে পাকানো ভালো। তবু তো স্তব্ধ হয়ে থাকে। আর যেন সারাদিনের চেষ্টায় সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় গলায় আঁচল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কী যেন বলে, কী যেন বলে।

গগন ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরে কিছু একটা যেন ফোঁপাচ্ছে।

সকাল হয়েছে বৈকি। রোদও উঠেছে। না, বারান্দাতেও নেই ব্রজবালা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে, উঠোন পার হয়ে কলতলার দিকে গেল গগন। তখন তার চোখে পড়ল রান্নাঘরের পাশে চারটে বাঁশের খুঁটির উপরে বসানো বাজে কাঠের তৈরি পায়রার খোপটা। রোদে জলে জীর্ণ। তাই টিনের টুকরো, বাঁশের বাখারি দিয়ে মেরামত করা।

গগন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তখন তার অনুভব হল আজ যেন বিশেষ কিছু। কী যেন আজ, কিসের জন্য যেন আজ খুব বিখ্যাত। কে বলে দেবে তাকে? কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়?

মিনিট পনেরো পরে কলতলা থেকে ফিরল গগন। উঠোনটা পার হতে গিয়ে আবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

এবার সে দেখতে পেল। রান্নাঘরের উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার। তার মধ্যে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে মাটিতে বসে আছে ব্রজবালা।

আঃ হাঃ! হলদে অক্ষিগোলক, ধোঁয়াটে মণি। গগন এদিক ওদিক তাকাল। বারান্দার উপরে ঘরের দরজা খুলে সুবি বেরোল। হাই তুলল সে।

রান্নাঘরের মুখোমুখি সুবির দরজা। সে রান্নাঘরের ধোঁয়া আর তার মধ্যে ব্রজবালাকে দেখতে পেল। একটু ভাবল সুবি। ধোঁয়াটা দম বন্ধ করার মতো নয়? যেন দারুণ পরিশ্রম করে এসেছে সে এমনভাবে সে দু-একবার হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল।

বারান্দা থেকে উঠোনে, উঠোন থেকে কলতলায়। সুবি। সে কল খুলে দিল। ট্যাপের মুখে হাত পেতে জল নিতে গেল। কিন্তু আঙুলগুলো জোড়া লাগল না। আঙুলের ফাঁকগুলো দিয়ে জল পড়ে যেতে লাগল।...বড়দা, মেজদা, মুকুল...। আবার হাত পাতল সুবি ট্যাপের মুখে। আঙুলগুলো একত্র না হয়ে ফাঁক-ফাঁক হয়ে বেঁকে বেঁকে গেল।...শমু, সুধীর, মুকুল...হাতের উপরে জলপড়া দেখতে লাগল সুবি স্তম্ভিত হয়ে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সে আঙুলগুলোর সাহায্যে জল ধরার মতো অঞ্জলি তৈরি করতে পারল।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এলো সুবি। তার এই ঘরটা নানা দিক দিয়ে অর্ধসমাপ্ত। তিন দিকে ইটের দেয়াল। চার নম্বর দেয়ালটা বাঁশ-চাটাইয়ের। দুদিকের দেয়ালে প্ল্যাস্টার ধরানো হয়েছে। তৃতীয়টিতে এসে হঠাৎ যেন কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্ল্যাস্টার করানো হয়ে ওঠেনি। একটা দরজা আর তিনটে জানলায় পাল্লা বসানো

হয়েছে, কিন্তু রং করা হয়নি। কাঠ পুরনো হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, একটা চেয়ার। সরু বিছানাটায় আধময়লা বালিশ, চাদর। টেবিলে বেশ কিছু বই, খাতা। অগোছালো, প্রায় স্তূপাকারেই রাখা যেন।

টেবিলটার সামনে দাঁড়াল স্থবি। বইগুলোর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল সে। কী যেন ভাবতে হবে? কিন্তু সে ভাবতে পারলে না, বরং তার মন যেন এক-এক খানা বই তুলে দেখবে।···ও, হ্যাঁ, মুকুল···টেবিলটার কাছ থেকে সরে এলো সে।

তার ঘরের বাঁদিকে মেজবউদির ঘর। দুটো ঘরের মধ্যে দরজাটা খোলা। অথচ মেজবউদির ঘরের বারান্দার উপরে দরজাটা বন্ধ দেখে এসেছে এমন মনে পড়ল যেন। দুটো ঘরের মধ্যে দরজাটা খোলা থাকে এইজন্য যে মেজবউদি কোন কোন রাত্রিতে ভয় পায়। আর্তনাদও করে ওঠে।

স্থবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজাটাকে দেখল। ফ্রেমে আঁটা একটা শূন্যতা যেন, যার দুদিকেও এমন শূন্যতা যা কোন চেহারা নেয় না।

কাল সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত স্থবি পথের ধারে ঝাউয়াগাছটার নিচে মুচির পাশে বসে কাটিয়েছে। মুচি তার চটে বসে, আর সে একটা ইটের উপরে। মুচি কখনও ঠুকঠাক করে কাজ করছিল, কখনও গাহাকের আশায় বসে থাকছিল, স্থবি ছ-সাত ঘণ্টা চুপ করে বসেছিল। যেন জায়গাটাতে একটা ঠাণ্ডা-ভাব আছে। দু-একবার মাত্র দু-একজন পরিচিত লোক তাকে লক্ষ্য করেছিল। তারা সকলেই ভেবে নিয়েছিল সে জুতো সারাচ্ছে। ঠাণ্ডা-ভাব সত্য, অন্যদিকে কিন্তু, ভাবো, দুপুরের রোদ তার মাথা মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছিল, মুখ গলা হাত পিঠ বেয়ে জামাকেও ভিজিয়ে তুলছিল।

সে কি আজকেও যাবে, তেমন করে সেখানে বসে থাকতে? স্থবি মেজবউদির ঘরে ঢুকল।

ঘুম ভেঙেছে সুলতার। চুল সারা গায়ে ছড়ানো, কাপড় আলুথালু। তখনই উঠে বসেছে সে। হাঁটু বেড় দিয়ে এগিয়ে রাখা দু' হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে ধরে রেখেছে। সুলতা পায়ের শব্দ শুনতে পেল না, চোখেও যেন দেখতে পেল না। স্থবি দেখলে সুলতার দুচোখ থেকেই মোটা দুই ধারা চোখের জল নিঃশব্দে গাল বেয়ে নামছে। গাল থেকে গড়িয়ে গলায়—সব নিঃশব্দে।

এই সকালেই, ঘুম থেকে উঠে বসেই! হয়তো দৃশ্যটাই মনে পড়ে গিয়েছে। স্থবি বললে, বউদি, মা রান্নাঘরে গিয়েছে। চা করো গে।

সুলতা দরজা খুলে বেরোল। দরজাটার একটা অভ্যাস আছে শব্দ করার। আর

সেই শব্দে চমকে উঠল স্থবি।

আবার সে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। সে ভাবলে, এখন কি কিছু ভাববে সে? কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে না ঘরের এই আলোকে? আর সেই আলো পড়ার ফলে ঘরে যা কিছু সবই অবাস্তব হয়ে যায় যেন। ওই দরজা খোলার শব্দটায় যেন অবাস্তবকে ভাঙার চেষ্টা ছিল।

দু-তিন মিনিট সে দাঁড়িয়ে থাকল টেবিলের সামনে। তারপর হঠাৎ মনে এল কথাটা, 'এই বইগুলো সবই বড়দার কেনা।' একটা নিয়ম এই আছে, একটা কথা মনে হলে পরপর অনেকগুলো কথা মনে আসতে থাকে। সাধারণ কথা, খুব সাধারণ কথাই, তবু মনে আসতে থাকে। বড়দা রেলের মিস্ত্রিদের মতো প্যাণ্ট আর জামা পরত, সে জামা-প্যাণ্টে তেলকালি মাখা। হাতে একটা ক্যানভাস ব্যাগ। তার গায়েও তেলকালি। সেই ব্যাগে বড়দার কাজের যন্ত্রপাতি থাকত। মনে হত যেন একটা নাটক; সেই নাটকে সে তেমন জামাকাপড় পরে রেলের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির অভিনয় করছে।

ঠিক যেন তাই। যে দাদা সকালে উঠে মুড়ি আর চায়ের বাটি নিয়ে বসে থাকত স্থবি এলে খাবে বলে, মা চা জুড়িয়ে গেল বললেও বলত, এই তো, ও আসুক, একসঙ্গে খাই; খাওয়াটা তো সুখের নয়, সুখটা একসঙ্গে খাওয়ার। আর যে দাদা রেলমিস্ত্রির পোশাক পরে কাজে যেত—এই দুই যেন এক নয়।

বড়দার, কিছুদিন পর থেকে, অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতে হত। কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে, মিস্ত্রির পোশাক ছেড়ে বেড়াতে বেরোলেই ফিরতে অনেক রাত হত। প্রথম প্রথম মা বসে থাকত খাবার নিয়ে। পরে ব্যবস্থা হয়েছিল। স্থবির ঘরে বড়দার খাবার ঢাকা থাকত। কারণ স্থবি তো অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে, জেগেই থাকে। পরে স্থবি মাকে বলেছিল, আমাদের দুজনের খাবারই একই সঙ্গে রেখে দিও ঢেকে। বড়দা এলে একসঙ্গে খাব। স্থবি বলেছিল বড়দাকে নকল করে—খাওয়া ব্যাপারটা এমন সুখের কিছু নয়, একসঙ্গে খাওয়াটাই সুখ।

মনে এল, স্থবির বড়দা প্রথম রাতে অবাক হয়েছিল। রাত তখন এগারোটা বাজে। শুনে বলেছিল, তাহলে তুই বোস। আমি স্নান করে আসি। এত রাতে স্নান? বড়দা বলেছিল, কেমন যেন ঘেন্না লাগে, বাইরের তেল, কালি, ধুলো।

তেমন একদিন রাতে বড়দা প্রথম বলেছিল হেসে, ভালোই হয়েছে। তোর আর একটু বেশি পড়া হয়ে যায়। তারপর খাওয়া হলে বড়দা তার ব্যাগটাকে টেনে নিয়ে একটা প্যাকেট বার করছিল। বলেছিল, এটা কিন্তু ভালো মোলায়েম খদ্দর, বাবার পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গিয়েছে, মা কাল তালি দিচ্ছিল। আর এটা

দেখ। 'কারেন্ট' নাম। একেবারে সব হালের সংবাদ। আর এই এখানে দেখ আই এ এস পরীক্ষার প্রশ্ন আর তার উত্তর। আমার মনে হল আই এ এস পরীক্ষা দিতে হলে এখন থেকেই এসব পড়া দরকার। এই পত্রিকাটা এখন থেকে নিয়মিত কিনব।

তখন স্থবি হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন থেকেই বড়দা রোজ অন্তত একবার করে মনে করিয়ে দিত আই এ এস পরীক্ষার কথা। আর তখন থেকেই বই কেনা শুরু তার। এই টেবিলের সব বই, পড়ার বই-এর চাইতে যাকে বড়দা আউট-বুক বলত। সাহিত্যের, ইতিহাসের, রাজনীতির বই। কবিতার বই। আই এ এস হতে গেলে শুধু পড়ার বই পড়াই শেষ কথা নয়। কী পাগল, কী পাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল স্থবি। কী বলবে, পাগল? বলবে, পেতিবুর্জুয়া। না, না। কী সব গোলমাল হয়ে যায় স্থবির মধ্যে।

মেজদার নাম গৌতম। তা থেকে বুদ্ধ, ক্রমশ সেটা বড়দার মুখে বুদ্ধু। আদরের ডাকই, কিন্তু কখনও কখনও তা গালাগালিও হয়ে যেত। যেমন একদিন মেজদা বলেছিল, কেন স্থবির কষ্টের কারণ হচ্ছ? উঁচু জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছ, যখন তা ব্যর্থ হবে, শান্তি থাকবে? রিফিউজি ইস্কুল-মাস্টারের ছেলে কখনও আই এ এস হয় না।

তুমি সত্যিই বুদ্ধু, স্কুল টীচারের ছেলেরা আই এ এস হয়েছে তার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে।

মেজদা চটে উঠেছিল। বললে, যেমন তুমি এঞ্জিনীয়ার হয়েছ।

বড়দা তর্ক করেনি। কিন্তু তখন তো তার পরনে রেলের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির তেলকালিমাখা, ঘামেভেজা ময়লা জামা-প্যাণ্ট। সে বরং তার কাজে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার মুখখানা থমথম করছিল তখন।

মা বলেছিলেন,—এমন করে বলিস কেন?

মেজদা বলেছিল, আমি তো ওকে, ওর চাকরিকে অপমান করতে চাইনি। আমি বোঝাতে চাইছিলাম, আমাদের পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। কী হয়েছে ওর? স্থবি ভালো, খুবই ভালো ছাত্র, কিন্তু তুমি ভেবে দেখো, দাদা বরাবর তার স্কুলে ফার্স্ট বয় ছিল। বই ছিল না, পড়া দেখে দেয়ার কেউ ছিল না, আধপেটা খেয়ে পরিশ্রম করে, তবু সে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। হল এঞ্জিনীয়ারিং পড়া? যেদিন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারলে না, পলিটেকনিকে যেতে হল, তখনই বোঝা যায়নি চিরকালের জন্য ওঠার পথ বন্ধ হয়ে গেল?

স্ববির ভালো লাগেনি। সে নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলের সামনে বসেছিল। কিন্তু চিরকালকার স্বল্পভাষী মেজদা সেদিন কিছু প্রমাণ করতে চাইছিল। স্ববির পড়ার কাছে গিয়ে চুপ করে বসেছিল।

মেজদা বললে, আমি চিরকালই সব বিষয়ে মেজো। স্কুলেও 'এ' ক্লাস ছিলাম না। 'বি' ক্লাস বলতে পারিস। কিন্তু তুই স্কুলের কথা কি জানিস না? বল, সব-চাইতে উগ্র বামপন্থী শিক্ষকরা আমাদের স্কুলে কখনও কোন ছাত্রের খাতা দেখে দেয়? বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার বলে দেয়? তারা তো জনগণের জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করে রেখেছে, কিন্তু জনগণের ছেলে অর্থাৎ যারা প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারে না, বাড়িতে বইখাতা নেই, পড়ার জায়গা নেই, তাদের কোনদিন পড়ায়? প্রাইভেট টিউশানি করে না তারা? স্ববি বলেছিল, কী হবে, মেজদা, এসব বলে? বাবা যে ক্লাশে পাগলের মতো পড়ান, তাতেই বা কী লাভ?

—না লাভ কিছু নয়। আমি কী বলতে চাইছিলাম তাই শোন্। কলেজে যখন অনার্স পড়তে যাবি তখনও দেখবি অধ্যাপকরা পড়াচ্ছে না। সেখানে তো টেক্সট্ বুকের বাইরে অনেক কিছু জানতে হয়। কে জানাবে তোকে? 'বি' ক্লাসের কোন স্ববিধা হয় না। তারা নিজের হাস্যকর চেষ্টায় পরীক্ষায় হাস্যকর রকমের ফল পেতে পারে। প্র্যাকটিক্যালি দেখবি, যারা অধ্যাপক রাখতে পারে প্রাইভেট টিউশানির জন্য তারা, আর নতুবা বংশপরম্পরায় যারা অনার্স নিচ্ছে তারাই ভালো ফল করছে। আর আই সি এস? আমার খুবই কষ্টবোধ হয়, বিশ্বাস কর, খুবই কষ্টবোধ হয়, তোকে হতাশ করতে, কিন্তু আই সি এস স্বাধীন ভারতবর্ষে তারাই হয় যারা উঁচুদরের টাকা খরচ করে সাহেবি-সাহেবি উচ্চারণে সাহেবি মিশনারিদের কলেজে পড়ে। তুই কি দেখিসনি যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হচ্ছে, ভালো কলেজে অধ্যাপক হচ্ছে, তারা হয় অধ্যাপকদের ছেলে, জামাই, ভাগনে ইত্যাদি।

মেজদা খুবই প্র্যাকটিক্যাল। দর্শনে বি ক্লাস অনার্স পেয়ে একেবারে দার্শনিক হয়ে গেল। বলত, আমি তোমার আদর্শবাদে বিশ্বাস করি না, দাদা।

মেজদা আর বড়দায় কী রেষারেষি ছিল? মেজদাই বলেছিল একদিন, তা তো হয়ই। মেজোর মনে খানিকটা হিংসা থাকেই। বড় আর ছোটর যতো আদর, মেজোর তত আদর থাকে না। সেজন্য মেজো হিংস্যুটে আর একবগ্‌গা হয়।

এর মধ্যে কতটা সত্য ছিল তা দর্শনের ছাত্র মেজদার জানার কথা। কিন্তু কিছু একটা হয়েছিল, বড়দা আর মেজদা যেন দুজন দুজনকে এড়িয়ে চলত। মেজদাই বেশী। যেমন বড়দার খাবার নিয়ে স্ববিই চিরদিন বসে থেকেছে, মেজদার খোঁজও করত না।

কিন্তু সেদিনকার কথা ভাবো। মেজদা বারান্দায় বসে তার পুরনো ক্যানভাস জুতো জোড়া নিয়ে কী করছিল। বড়দা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ না ধুয়ে তার কাছাকাছি একটা কাঠের বাক্সের উপরে গিয়ে বসেছিল।

—কী করছিস ? জুতো সেলাই ?

—দেখতেই তো পাচ্ছ।

—কেন ? আবার ইণ্টারভিউ নাকি ?

—ইণ্টারভিউটা কি ঠাট্টার জিনিস ?

—তা নয়।

—অনেক হয়েছে। হাতমুখ ধোও গে। মা চা করতে গেল। মেজদা বলেছিল।

দুজনে জোরে জোরে কথা বলছিল। সুবি এগিয়ে গিয়েছিল। সুবি বললে, দাও না আমাকে, মুচিকে দিয়ে সারিয়ে আনি।

মেজদা 'সাগরেদ এলেন', বলে বিরক্ত মুখে জুতো হাতে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

ক্যানভাসের বেরঙা জুতো। দু পাটির কড়ে আঙুলের জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। বড়দা সেই কাঠের বাক্সর উপরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সুবি নিজে হাত-মুখ ধুয়ে এসেও দেখেছিল বড়দা তেমন ভাবেই বসে আছে। আর তার কালো-হয়ে-যাওয়া চোয়ালের উপরে গর্তে-বসে-যাওয়া চোখ দুটো থেকে স্পষ্ট জলের ধারা নেমে আসছে।

সুবির মনে হল, তেমন ভালো করে সে দাদাদের দেখেনি কখনই যেমন সেদিন সে দেখেছিল। বড়দা যে কেমন কালো হয়ে গিয়েছে, তার মুখ চোখ যে তেমন শুকনো তা যেন আর কোনদিনই সুবির চোখে পড়েনি। রাত এগারোটায় বাড়িতে আসে, অনেকদিন সুবি উঠবার আগেই বেরিয়ে যায়, সেজন্যই কি ? তার মনে হয়েছিল সে যেন অত্যন্ত পটু অভিনয়দক্ষ যে রেলের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির চাকরির সঙ্গে মানিয়ে যেমন পোশাক, তেমন তার সঙ্গে মানিয়ে গায়ের রং আর স্বাস্থ্য করে নিচ্ছে যেন বড়দা।

আর মেজদা কি সত্যি স্বার্থপর ছিল তখনই? ব্যায়াম করত, স্বাস্থ্য ভালো করে তুলছিল ; গায়ের রং ফর্সা হয়ে উঠছিল, মাথার চুলগুলো চকচকে। আর ভাবো সেই নিজের হাতে জুতো সেলাই-এর কথা। ক্যানভাসের ছেঁড়া জুতোর মতো তুচ্ছ জিনিস মুচির কাছে নিয়ে যেতে লজ্জা ? কিংবা তার চাইতেও বেশি পেতিবুর্জোয়া-সুলভ রুচি যে ক্যানভাসে চামড়ার তাপ্পি লাগিয়ে নেয়ার চাইতে নিজে হাতে রিফু করে দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখা। পচা নিম্নমধ্যবিত্তের ভাবালুতা।

না, না। হঠাৎ যেন স্থবির বুকের ভিতরে কেউ গালাগালিগুলোকে প্রতিবাদ করে উঠল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে নিজেই যেন হাঁপাতে লাগল। কিন্তু সে যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছে। সতর্ক হয়ে গেল সে। নিচের ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

পায়ের শব্দ স্থলতার। সে চা নিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে চা নিল স্থবি। তাকে এখন শক্ত হতে হবে। এই এককাপ চায়ের অনেক দাম। এটা খাদ্য বটে। ভাত ছাড়া একমাত্র কিছু যা সকলের পেটে যায়। তাছাড়া সে সাহস করে চা না খেলে অনেকেরই চা খাওয়া হবে না। স্থবি বললে,—তুমি চা খাও গে, বউদি, তুমি চা খাও গে।

ঘরের মধ্যে ঠিক তেমন টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে স্থবি চা খেতে শুরু করল। চোখের জলের এই কৌতুক আছে, চোখ ছাপিয়ে না এলে গলার ভিতরে নামতে পারে। নোনতা লাগল স্থবির চা।..

বারান্দায় কাঠের বাক্সের উপরে বসে চা খেতে খেতে গগনবাবুর মনে হল—এই বাক্সটাও এনেছিল তার বড় ছেলে পায়রার খোপ মেরামত করতে। উঠোনে যে পায়রার খোপটা সেটাও তারই তৈরি। তখন হায়ার সেকেণ্ডারি পড়ে সে। স্কুলে এক্স্ট্রা-কারিকুলার কোর্স ছিল দুটো—দর্জি আর ছুতোরের। এই কোর্স দুটোকে নেয়ার আগে স্কুলে আলোচনা, তর্কাতর্কি হয়েছিল। এরকম কোর্স না নিলে স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারি বলে স্বীকার করবে না। অথচ ভালো এক্স্ট্রা-কারিকুলার কোর্সের শিক্ষক রাখতে অনেক টাকা লাগে। একজন ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া দর্জি, আর একজন ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া ছুতোরকে মাস্টারমশাই করে এই কোর্স দুটো চালু করা হয়েছিল।

গগন ভাবলে, এইসব ব্যবস্থা যারা করে তাদের হয়তো অনেক লেখাপড়া; কিন্তু বোকা নয় তারা, সেইসব শিক্ষা-সেক্রেটারি, শিক্ষামন্ত্রীরা? যে গরীব বাপ-মা কষ্ট করে ছেলেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পড়াচ্ছে সে কি দুঃস্বপ্নেও ভাবে তার ছেলে বড় হয়ে দর্জি কিংবা ছুতোর হবে? নাকি সেইসব শিক্ষা-সেক্রেটারিরা ভাবে এরা প্রকৃতপক্ষে দর্জি, ছুতোর, মিস্ত্রি হওয়ারই উপযুক্ত শুধু।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল গগনের। তার বড় ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েছিল। এঞ্জিনীয়ার হবার উচ্চাশা ছেড়ে বড়জোর ওভারশিয়ার হওয়াই তখন তার উচ্চাভিলাষ। তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে রেলের মিস্ত্রি। তখন কি, তখন কি শিক্ষা-সেক্রেটারি খল খল করে হেসে উঠে বলেছিল—আমি আগেই জানতাম, গগন।

হাঁপিয়ে উঠল গগন। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। যেন সে বলবে আমি

স্কুলের মাস্টার, তাই এসব কথা মনে হয়। আমি, আমি এসব এড়িয়ে যেতে চাই। আসলে আমার বড় ছেলে, সত্যি তো তার নাম ভুলিনি, সদানন্দ ছিল নাম, আনন্দময় ছিল সে। সে কাঠ দিয়ে একটা পুতুলবাড়ি তৈরি করেছিল। ছোট ছোট দরজাসমেত একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। দরজাগুলো খোলা-বন্ধ করা যেত যেন সত্যিকারের বাড়ির সত্যিকারের দরজা। মাস্টারমশাইরা বলেছিলেন—এ ছেলে এঞ্জিনীয়ার না হয়ে যায় না। কিছুদিন পরে চারটে বাঁশের উপরে রান্নাঘরের দক্ষিণে ওই ওখানেই বসিয়েছিল সে। তারপর দুটো পায়রা কিনে এনেছিল সে। আর তা থেকে সে যখন হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিচ্ছে তখন একঝাঁক পায়রা হয়েছিল। তাদের রকমসকম দেখে···।

তারপর ভাম ধরল পায়রার খোপকে। রাত্রির অন্ধকার হঠাৎ কখন ঘন হয়ে একটা জন্তুর চেহারা নেয়। তারাগুলো কখন হঠাৎ তার ধারালো দাঁত হয়, তা কি ধরা যায়? শব্দ শুনে, কাতর চীৎকার শুনে বাইরে গিয়ে দেখবে শান্ত রাত্রির অন্ধকারে ঝকঝকে তারা হাসছে। মানুষ কী করতে পারে সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধে? গগন এদিক ওদিক দেখলে। এই সকালেই, দেখো, কী অন্ধকার।

বিড়িদেশলাই নিয়ে এল ব্রজবালা। বললে,—চা খাওনি?

—খেলাম তো।

ব্রজবালা হাত বাড়িয়ে ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া আধখাওয়া চায়ের কাপটা গগনের হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখল।

ব্রজবালা জানে আজকাল তার এই ছোট্ট বাড়িটাতে ছোট্ট একটা ঘটনার পিছনে অনেক কথা, অনেক অনেক শব্দ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, চাপ দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে হলে কথা দিয়ে বাঁধ দিতে হয়। এদিকের কথার শব্দ হলে ওদিকের শব্দ এগোয় না। সে তাড়াতাড়ি করে বললে, স্কুলে যাবে না আজ? যদি যাও বাজারে যেতে হয় এখন।

বিজ্ঞানশিক্ষক গগনবাবু ভাবলে, প্রকৃতপক্ষে এখন তো দিনের বেলা। অন্ধকার কোথায়? অন্ধকারের যে অনুভূতি হয় সেটা এজন্য যে তার চোখে এখন চশমা নেই। আর এই বাতাসের অভাব বোধ হচ্ছে, চারদিক থেকে দেয়াল চেপে আসছে যে তার কারণ বোধ হয়···

সে বললে,—আজ গুমোট নয়?

—না। তেমন নয় বোধ হয়। ব্রজবালা বললে,—থলিটা আনব? থলি আনতে গেল ব্রজবালা।

আর তখনই গগনবাবুকে কেউ যেন বলে দিল,—দেখো তো, এই অন্ধকার

যা কখন লম্বা নিচু শরীরের লম্বা লেজের একটা ভাম হয়ে যায় তুমি জানতে পার না. তারই মধ্যে এই বাজার ? যে বললে এই কথাটা সে যেন কথাটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। ব্রজবালার ব্যবহারে। সমস্ত নারীজাতির ব্যবহারে। আমরা পুরুষ, আমাদের কিছুতেই আর ইচ্ছা যায় না। আর যারা মা হয় তারা ভাবে বাজারের কথা, আলুপটলের কথা। হয়তো লঙ্কা আনতেও বলবে। অথচ এমন গুমোট···কেমন সহানুভূতিহীনা, প্রায় নির্দয়া, নিষ্ঠুরা মনে হয় না ? যেন, যেন এই পৃথিবীর মতো হৃদয়হীনা ? অথচ তারা সব নিজের রক্ত মাংসে তৈরি, তাদের কথা যেন ভুলে যায়।

কাঁধে গামছা ফেলে বাজারের থলি হাতে বার হল গগনবাবু। ব্রজবালা ভাবলে, তা জামাটা এখন না পরা ভালো। বাজার থেকে ফিরতে ঘামে ভিজে যায়। ইস্কুলে যাওয়ার সময়ে সেই ঘামে-ভেজা জামা পরতে ভালো লাগে না। ব্রজবালা দেখলে, ডান উরুর উপরে গগনের ধুতিতে মস্ত একটা সেলাই। অবাক হচ্ছে না সে। সে তো নিজেই সেলাই করেছে। ছ' মাস এ বাড়িতে কেউ জামাকাপড় কেনার কথা ভাবেনি।

পথে বেরিয়ে গগন ভাবলে, কিন্তু প্রদীপ জ্বালায় তো। সারাদিন ধরে সেই প্রদীপের জন্যই সলতে পাকাচ্ছে। প্রদীপের আলো কি মায়ের স্নেহের মতো, মায়ের হাসির মতো ওদের দিকে উঠে যায় কোন এক অন্ধকারের ভয়ে আশ্বাস হয় ? ওদের ছুঁতে পারে ?

আঙুল তুলে চোখের কোণ দুটি মুছে নিল গগন। বেশ রোদ্দুর পথে। তার গায়েও পড়ছে। গরমই তো। কিন্তু কিছু বাতাস যেন আছে। গুমোট নয় অন্তত।

হঠাৎ থমকে গিয়ে যে পথে বাজারে ঢোকে গগন সে পথে না গিয়ে অন্য পথে এগোল। কয়েকদিন থেকে সে পথটায় ভবেশের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। আর ভবেশের একই কথা। সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে সরকার থেকে মাসোহারা পাচ্ছে, এমন কি যে বছরদুয়েক জেল খেটেছে, এমনকি যারা দু-এক বছর অন্তরীণ ছিল দু-একটা বক্তৃতা দিয়ে ; তুমি কেন চাকরি রাখার জন্য বলবে না তুমি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলে ? চোদ্দ বছর আন্দামানে থেকেও কেন মাসোহারা নেবে না ?

না, না। না। গগন তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। চাকরি আর দু' মাস আছে। তারপর ? না, না। তাই বলে সেই চল্লিশ বছরের পুরনো ঘটনাকে সে আর সামনে আনতে পারবে না। হাঁপাতে লাগল গগন। সেই পুলিশ ইন্সপেক্টরের ছেলে সুরেন বলেছিল আর্ত চীৎকার করে—আমার বাবাকে মেরো না, গেনু, দোহাই সমীর, আমার বাবাকে মেরো না। সে কেঁদে উঠেছিল। তখন সমীর

বলেছিল, গুলি কর, ওকে গুলি কর, গেনু, চিনতে পেরেছে। কিন্তু গগন পারেনি। সে বলেছিল,—ওর কী দোষ? ওর কী দোষ?

এ পথে একটা পরিচিত গন্ধ। আর পুলিশ ইন্সপেক্টরের ছেলে সুরেনের সাক্ষ্যতেই সমীরের ফাঁসি হয়েছিল। আর গগনের যাবজ্জীবন। না, না।···

গরম খুবই গরম। এই দেখো, গরমে সে হাঁপিয়ে উঠছে। ঘামছে সে। আর কেমন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ এখানে। তাকে কি পাপ বলবে না? না, আমি জানি না। আমি তো নিতান্ত গরীব এক বি-এসসি মাস্টার, বুঝি না, বুঝি না।

সুবি অবশেষে চা শেষ করতে পারলে।

সেদিন বড়দা কাজে না গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসেছিল। মেজদার জন্য একজোড়া জুতো নিয়ে। মেজদা দেখলে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গম্ভীর মুখে বলেছিল, বেশ। এটাকে ধার বলে নিলাম। প্রাইভেট টিউশানির টাকা পেলে শোধ করে দেব। বড়দা কি আশা করেছিল মেজদার মুখে হাসি ফুটবে? বড়দার মুখটা একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল। এ কি পিঠোপিঠি ভাইদের সুপ্ত হিংসা? দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা।

সুবি ভাবলে, বড়দার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। যেমন চাকরি তেমন পোশাক, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে যেন বড়দার চেহারা বদলে যাচ্ছিল। গায়ের রং পুড়ে যাচ্ছে, গর্তে ঢোকা চোখ, বসে-যাওয়া গাল। শুধু চোখের দৃষ্টিটা ছিল ঠিক। মায়ের মতো ছিল বড়দার চোখ; টানা, বড় বড় আর স্নিগ্ধ।

সুবি বলেছিল একদিন,—বড়দা, রোজ এত রাত অবধি···

—ওভারটাইম থাকে।

—রোজ, রোজ ওভারটাইম?

—তা না হলে বাড়িঘর করব কী করে? একজন আই এ এস অফিসারের পৈতৃক বাড়িতে কিছু ডিসেন্সি তো আনতে হবে। তুই বরং আর একটু পড়।

—রাত বারোটা হল। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, খেয়ে নিই। আর একটু সকাল সকাল এসো। সন্ধ্যায় রাঁধা এই ডালভাত এখন বাসি হয়ে গেছে। রোজই তুমি আজকাল ফেলে দিচ্ছ। একটু গরম থাকলে খেতে পারতে।

অবশেষে একদিন সুবি বুঝতে পেরেছিল বড়দার গায়ে যে সোঁদা-সোঁদা সেন্টের মতো গন্ধ আজকাল থাকে তা মদের; বড়দা শ্রমিকদের মতো মদ ধরেছে। যেমন চাকরি, যেমন পোশাক, তার সঙ্গে মিলিয়ে জ্বলে-যাওয়া রং আর সবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এই সস্তা মদ।

প্রথম যেদিন বুঝতে পেরেছিল দু'হাতে মুখ ঢেকে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠেছিল সে, কিন্তু সেদিন রাতেই বড়দা ফিরেছিল আর-একটা বই নিয়ে। বলেছিল,—এখন পড়বি না। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আরম্ভ করবি। শেয়ালদা স্টেশনের বই-এর দোকানে বলে রেখেছিলাম।

বড়দা, স্থবির অনুরোধেই যেন, এক রাতে আগে আগে এল। তখন বাবা-মা, মেজদা ঘুমিয়ে পড়েছে। কড়ানাড়ার শব্দে আকস্মিকভাবে বড়দা এসেছে ভেবে আনন্দে উজ্জল হয়ে স্থবি দরজা খুলে দিয়েছিল। আর তখনই যেন আঘাতটা পেয়েছিল। সিঁড়ির উপরে কোমরে হাত দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে বড়দা।

ধরে এনে নিজের বিছানাতেই শুইয়ে দিয়েছিল বড়দাকে স্থবি। আর বড়দা যেন ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাবে। কী করবে সে, কিসে ব্যথা কমে? ডাক্তার ডাকবে নাকি? বাবা-মাকে এখনই জানানো দরকার।

বড়দা নিষেধ করেছিল। কামড়াতে কামড়াতে নিচের ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে তখন। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কোনরকম দম নিতে নিতে বলেছিল—দেখ, ঝোলার মধ্যে একটা ছোট খামে দুটো বড়ি আছে। লাল বড়িটা দে।

সেটা নিশ্চয়ই দারুণ রকমের কোন নেশার বড়ি। বড়দা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মায়ের মতো টানা টানা বড়-বড় ডাগর চোখ ছিল বড়দার। সেই নীল-নীল চোখ হলুদ হয়ে গিয়েছিল। রক্তছোপ লাগানো মরা-মরা হলুদ।

তখন হায়ার সেকেণ্ডারির ফল বেরিয়েছে, প্রথম দশজনের নাম। না, তাতে স্থবির নাম ছিল না। অসহায়ের মতো ছটফট করেছে স্থবি। কাকে বলবে সে? সে কি দুঃখ করবে, না সুখী হবে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে বলে? বড়দা সেই সকালে আজ তার সেই একমাত্র ভালো পোশাক নীল জিনের জামা প্যাণ্ট পরে কোথায় বেরিয়েছে।

সন্ধ্যার সময়ে এক চাঙ্গারি খাবার নিয়ে ফিরেছিল বড়দা। সে কী আনন্দ তার। স্থবি, তোর সবচাইতে প্রিয় বন্ধুদের খবর দিয়ে আয়; মা, আজ রান্না করতে হবে না. এত মিষ্টি এনেছি। আমাদের স্থবি মুখ রেখেছে। প্রথম দশজন না হোক, ফোর্থ সাবজেক্ট ছাড়াই সে তেয়াত্তর পার্সেণ্ট নম্বর পেয়েছে, ঠিক এগারো জনের নিচেই। মেজদা বলেছিল, খবরটা ঠিক তো। বড়দা বলেছিল, ত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের চোখে ট্যাবুলেশন শিট দেখে এসেছে সে।

প্রিয় বন্ধু শম্ভু, সুবীর, মুকুল এসেছিল আনন্দের ভাগ নিতে। আর সেদিন স্থবি যখন সকলকে প্রণাম করছে বড়দা হঠাৎ বলে উঠেছিল: একেই তিমির-তপস্যা

বলে, যা সূর্য প্রসব করে।

মেজদা আদর্শবাদী নয় বলত নিজেকে, তবু সেও বলেছিল, সুবি, আমরা যা পারলাম না তেমনভাবে তুমি বংশটাকে প্রতিষ্ঠিত করো।...

গগনবাবু দেখলে সে পালাতে গিয়ে আমের বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এই সোঁদা-সোঁদা, টক-মিষ্টি, গন্ধ আমেরই। সামনে আর এগোনোর উপায় নেই। সে সেই আমের চাঙারি, চুবড়ি, ডালার সারির মধ্যে দিয়ে ফিরতে শুরু করল।

আমের কথাই তো। কী যেন? কেউ কিছু বলছে নাকি? ওদিকে কি কোথাও ঝগড়া লেগেছে? না। ও। না। তার বড় আর মেজ ছেলে। তারা তখন ছেলেমানুষ। একটা আমের আঁটি কে খাবে তা নিয়ে ঝগড়া করছিল। গগন দুজনকেই দুটো চড় মেরেছিল। চড় খেয়ে দুজনেই কেঁদে উঠেছিল। গগন বলেছিল: তোমরা ব্রাহ্মণের ছেলে, স্কুলশিক্ষকের ছেলে, তোমরা সামান্য আমের লোভে ঝগড়া করবে, এমন আদর্শহীন!

ও, ও। গগন তার ডান হাতটাকে চোখের সামনে আনল। শক্ত, কড়াপড়া হাত। খুব ব্যথা লেগেছিল ওদের। আহা! খুব বেশি ব্যথা। গগনের ঠোঁটের ডান কোণ, ডান গাল চোখের কোল অবধি কোঁচকাতে লাগল। তাড়াতাড়ি ফিরতে লাগল সে আমের বাজার থেকে।

না, এটা কান্না নয়। সে তো কবেকার কথা। জোর করে সে নিজের মুখকে স্বাভাবিক করতে গেল। সে তো বিজ্ঞানের শিক্ষক। আর সে তো তখন আদর্শ অনুসারে মানুষ করার সময়। না, না, একে প্রকৃতপক্ষে মুখের মাংসপেশীর সাময়িক পক্ষাঘাত বলে। কী যেন ইংরেজি নামও আছে।

সুবি ভাবলে কথাটা হয়তো বড়দার নিজের তৈরি নয়, কিন্তু মানিয়েছিল তার মুখে। তিমির-তপস্যার সূর্য-প্রসব। তা কি হয়? একটা আদর্শ সামনে রেখে যে কোন উপায়ে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যর হিসাবকে তুচ্ছ করে, তার দিকে ছুটে চলা কি সত্যি সম্ভব হয়? আদর্শ ঠিক হলেই হল, পথ পচা পাঁকে ডুবে থাকলেও ক্ষতি নেই এমনকি সম্ভব হতে পারে?

আবার একদিন ব্যথা উঠেছিল লিভারের। সুবি সেই রাতে বলেছিল একটু ব্যথা কমতে, আমার আর ভাল লাগে না, বড়দা। কী হবে লেখাপড়া করে? ওরকম আদর্শ আমাদের মতো লোকের চোখের সামনে থাকা উচিত নয়। এর চাইতে লজেঞ্জ ফিরি করে বাড়িতে দু-চারটে টাকা আনি, তুমি এ চাকরি ছেড়ে দাও।

সুবি ভেবেছিল তখন, না হোক এঞ্জিনীয়ার, পলিটেকনিকের ইলেকট্রিক

এঞ্জিনীয়ারিং-এর লাইসেন্সিয়েট তো বটে, তাকে যদি মিস্ত্রির কাজ করতে হয়, ভুলে থাকতে তাকে মদ খেতে হবে।

সেদিন বড়দা সুবিকে নিজের বুকে টেনে নিয়েছিল, বলেছিল, তোকে পড়তেই হবে, সুবি। তুই কি ভেবেছিস আমি তোর পড়া শেষ হওয়ার আগে মরে যাব? বড়দা সুবির কান নিজের হৃৎপিণ্ডের উপরে চেপে ধরেছিল; বলেছিল, শুনতে পাচ্ছিস কেমন ধকধক করছে। কী জোর। আমি কখনও মরতে পারি। কষ্ট হচ্ছিল বড়দার, তবু থেমে থেমে বলেছিল, তারপর আই এ এস হয়ে বাবা-মার, গৌতমের, বংশের ভার নিলে আমি না হয় তখন অনেক দূরে চলে যাব, নদীতে নদীতে স্নান করে সব ময়লা ধুয়ে ফেলব, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াব, পাহাড়ের চূড়াগুলোর কথা ভাবব, দেখব কী করে মাটির উপরে দাঁড়িয়েও কী করে আকাশ ফুঁড়ে সূর্যের আলোয় মাথা রেখে ঘুমানো যায়, কী শান্তি আর আলো।

এ কী অদ্ভুত আদর্শবাদ।

তাহলে, এখন কি পড়বে সুবি? টেবিলের উপরে বইগুলো ঝড়ের পরে ধ্বংস-স্তূপের মতো সাজানো। গুছিয়ে নিতে আর কতক্ষণ লাগবে। হ্যাঁ, এখন তো পড়ার সময়ই। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। টেবিলের কাছেই তো সে। বড়দার কিনে দেয়া কবিতার বইগুলো। দু বছর পড়া হয় নি, কিন্তু কিছুই সে ভোলে নি।

টেবিলের দিকে এগোল সুবি। যেন বই নেবে এমনভাবে হাত বাড়াল। কিন্তু দুখানা হাত টেবিলে রেখে সে হাহাকার করে উঠল। যেন দু'হাতে কারো পা ধরেছে। তার সেই অব্যক্ত, অনুচ্চ হাহাকারের মধ্যে দিয়ে সে অস্ফুটস্বরে বললে, মুকুল, শমু, সুবীর, মেজদা···। না, বড়দা, না বড়দা, তুমি আর আমাকে পড়তে বোলো না।

মুকুল, মুকুল···। মুকুল তার বন্ধু ছিল ক্লাস ফোর থেকে। সুন্দর, সুঠাম চেহারা ছিল মুকুলের। শিব্রাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প পড়তে ভালোবাসত। যেখানে সেখানে যখন তখন চিৎকার করে রবীন্দ্রনাথের গান করে উঠতে পারত মুকুল। না, না, মুকুলের গায়ে সে অন্তত ছোরা বেঁধায়নি, অন্তত তার গলায় ব্লেড বসায় নি সে। মুকুল, মুকুল···

মুকুল পরীক্ষার ফিস জমা দিতে গিয়েছিল। সেই ছাত্রদের লাইন থেকে সুবিই তাকে ডেকে এনেছিল 'কথা আছে বলে'। মাস্টারমশাই বলেছিলেন দেশের এ অবস্থায় পরীক্ষা দেয়া অপরাধ। কিছুক্ষণ পরে, ট্রামে সুবিকে চুপ করে থাকতে দেখে মুকুলের মুখ চিন্তাকুল হয়েছিল। ধরমতলার কাছে মুকুল আর সুবি নামতেই শমু এসেছিল। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা লাটের বাড়ির দিকে গিয়েছিল।

তখন কি মুকুল ভাবছিল সাচ্চা মার্কসিস্টের মতো, ভুল করে ফেলেছি, বন্ধুদের কাছে আত্মসমালোচনা করে আবার পুনর্বাসন হতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তা সত্ত্বেও সবগুলো জেটি পার হয়ে গঙ্গার পাড় ধরে তারা হাঁটতে শুরু করেছিল। মুকুল দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে ঘামছিল। সে কি বুঝতে পারছিল—এটা সাধারণ বেড়ানো নয়। এমন সময়ে সুবীর দেখা দিয়েছিল, তার হাতে একটা চটের থলে আর দড়ি, খবরের কাগজে জড়ানো থাকলেও তা নিশ্চয় মুকুলের চোখে পড়েছিল। সে কি অবাক হয়েছিল, অজ্ঞাত কোন ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু গঙ্গার ধারে তারা যখন বসেছিল তখন মুকুলের মুখ আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে, তার চোয়ালের মাংসপেশীগুলি মনের জোরে দৃঢ় হচ্ছে। সে হয়তো ভাবছিল আজও আবার চার বন্ধুতে তাত্ত্বিক তর্কাতর্কি হবে। না, মুকুল, না।···হাঁপাতে লাগল সুবি।

শমু হঠাৎ খপ করে মুকুলের হাত বেঁধে ফেলেছিল। তখন বোধ হয় মুকুল বুঝতে পারল, আন্দাজ করল। সে প্রাণপণে সেই নাইলনের দড়ির বাঁধন ছিঁড়তে গেল। আর সেই সুযোগে তার পা দুটোকে বেঁধে দিল সুবীর। আর তখন আতঙ্কে মুকুলের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল, পেচ্ছাপে প্যান্ট নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। আর সুবীর বললে,—নিকেশ করে দাও, সুবি।

না, সুবি বসায়নি ছুরি, সুবি বসায়নি মুকুলের সুন্দর গলায় ব্লেড। মুকুল একবার মাত্র ওমা বলে কান্নার মতো চিৎকার করে উঠেছিল যখন সুবীর ছোরাটা তুললে হাতপা বাঁধা মাটিতে পড়ে-থাকা মুকুলের বুক লক্ষ্য করে। আচ্ছা, সবাই কি, সব মানুষ কি, সব প্রাণী কি সে সময়ে ভয় পেয়ে মাকে ডাকে শেষবারের মতো ?

সুবি দু'হাত তুলে দু'চোখের জল ঢাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তার আড়ষ্ট আঙুলগুলো একত্র হচ্ছে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল আসছে।

কিন্তু যখন মুকুলকে চটের থলেটায় ভরে দিচ্ছিল সুবীর আর শমু, তখন থলেটা ধরে রেখেছিল সুবি। একবার শুধু সুবি বলেছিল—আরে ওর শরীরটা এখনও গরম ; একবার শুধু তার চোখে পড়েছিল মুকুলের ফাঁক-হওয়া গলার মধ্যে থেকে সাদা কিছু বেরিয়ে আছে, তার হাঁ-করা মুখ থেকে দাঁত বেরিয়ে আছে, তার একটা চোখ তখনও দেখতে পাচ্ছে।···

সুলতা এসে বললে, সুবি, ঠাকুরপো, বাবা বাজার না করে ফিরে এসেছেন। বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছেন।—এসো তো, এসো তো।

চোখ মুছে বাইরে গেল স্থবি। গগন স্থির হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার মুখের একটা পাশ থরথর করে কাঁপছে। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। বলেছে নার্ভের অসুখ। এখন মাঝে মাঝে হয়, এরপরে সব সময় হতে থাকবে, হয়তো একটা হাত, হয়তো ঘাড়ও কাঁপবে। অন্য একজন বলেছে,—হয়তো এটা মানসিক ব্যাপার। নতুবা যাওয়া-আসা করত না রোগটা।

ব্রজবালা বাতাস দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও গগনের ঘাম কমছে না। স্থবি বললে,—একটু চা করে আনো বউদি। সুলতা উঠে গেল। স্থবি দেখলে গগনের বোজা চোখের পক্ষ্মগুলোর গোড়ায় গোড়ায় জল দেখা দিচ্ছে। তারপর সে জল পক্ষ্ম ছাপিয়ে চোখের কোণে জমা হল। স্থবি নিশ্চিন্ত হল। সহজেই এবার সুস্থ হবে গগন, কাঁদতে পারছে। দু-একবার হাহাকার করতে পারলেই স্নায়ুগুলো স্বাভাবিক হবে।

স্থবি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এল। প্রথম দিনের কথা তার মনে আছে। বাবা বউদিকে ডেকে নিয়ে বাড়ির ঘরগুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরছিলেন, যেন বউদি নতুন এসেছে, যেন বউদি তার আগে ঘরগুলোকে দেখেনি। ঘরগুলোর সবগুলো শেষ করা হয়নি। একটি পুরোপুরি, তার পরেরটি বারো আনা, এরকম অঙ্কের হিসাবে শেষেরটি সিকি পরিমাণ গড়া হয়েছিল। সুলতা বলেছে, প্রথম ঘরটির ইলেকট্রিক লাইন বসানো কত সুন্দর হয়েছে তাই বোঝাচ্ছিল গগন। বলছিল, এ কি আর সাধারণ মিস্ত্রির কাজ? তোমার ভাশুর, আমার বড় ছেলে, তাকে আমি এঞ্জিনীয়ার করতে পারিনি, কিন্তু পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর লাইসেন্স ছিল। বলতে বলতে হঠাৎ শুরু হল। আর্ত চিৎকার শুনে স্থবি ছুটে গিয়ে দেখেছিল অদ্ভুতভাবে ঘরের মধ্যে একটা সুইচের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে গগন। বাঁ হাতটা ঝোলানো, ডান হাতটা সুইচটার দিকে তোলা, ডান পা-টা ভাঁজ করা, বাঁ পা-টা সোজা, সব মিলে যেন এক নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা একটা স্ট্যাচু-ভঙ্গি। চোখবন্ধ, নিঃশ্বাস পড়ছে না। স্থবি বলেছিল,—কতক্ষণ হল? প্রায় দু'মিনিট। যেন ইলেকট্রিকের শক লেগেছে। কিন্তু সুইচ পর্যন্ত হাত পৌঁছায়নি। সকলে মিলে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল গগনকে। ডাক্তার এসেছিল। ইনজেকশন-টিনজেকশন দিয়েছিল। বিকেলের দিকে গগন ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, স্থবি, ইলেকট্রিকে তো আগুন দেখা যায় না, কিন্তু সে কি আরও ভয়ঙ্কর বেশি জালা?

স্থবি বুঝতে পেরেছিল তার বাবা বড়দার মৃত্যুর কথাই ভাবছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্থবি বলেছিল,—শুনেছি ইলেকট্রকিউটেড হলে হৃৎপিণ্ড সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, যন্ত্রণা টের পায় না। বলে সে দৌড়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এসেছিল।

বড়দা একদিন রাতে ফেরেনি। সকালের খবরের কাগজে ছবি আর সংবাদ দেখে, (না, নাম ছিল না কিন্তু ফটোটা স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল) চমকে উঠেছিল গগন, তারপর সুবি। রেলগাড়ির ছাদে কী যন্ত্র থেকে কী চুরি করতে গিয়ে একজন তার-চোরের মৃত্যু হয়েছে।

মুকুল, শমু, সুবীর আর সুবি গিয়েছিল মৃতদেহ আনতে। কোথাও কাটা-ছেঁড়া নেই, অথচ মানুষটা শেষ হয়ে গিয়েছে। শমু বলেছিল পুলিশদের, কী বলছেন, তার-চোর ? একজন কর্মচারী ছিলেন উনি রেলের। তারা বলেছিল, দু-তিন বছরের মধ্যে এরকম নামের কেউ মিস্ত্রি হল না শেয়ালদা ডিভিজনে। রেলের এক-জন লোক বলেছিল, আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখেছি, কিন্তু ভাবতাম মিস্ত্রি হিসাবেই কাজ করছে। পুলিশের লোকেরা বলেছিল, হয়তো গোড়ায় টেম্পোরারি চাকরি ছিল। সুবীর লজ্জায় মুখ নিচু করেছিল, শমু সামনে থাকতে না পেরে উঠে উঠে বাইরে যাচ্ছিল ; কিন্তু মুকুল, বড়লোকের ছেলে মুকুল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সুবি, তুই আর সুবীর এদের কাগজপত্রে সই দিতে থাক, শালারা অনেক কাগজে অনেক সই নেবে, আমি আর শমু খাটিয়া আর ফুল নিয়ে আসি। কী ফুল ভালোবাসতেন রে ? সুবীরকে বলেছিল, মুখ তোল শ্লা, একজন ছাঁটাই শ্রমিক আমাদের এই বড়দা। তারপর সেখানে পুলিশের পোশাকেই মেজদা এসেছিল। না, মেজদা সেদিন বড়দাকে অস্বীকার করেনি। একজন পুলিশ অফিসার বলেছিল —আনফরচুনেট্। মেজদা কিছু বলেনি। তার দু-চোখভরা জল ছিল। শমু আর মুকুলের আনা খাটে, মেজদার যোগাড় করা পুলিশের ট্রেলারে ফুলে ফুলে ঢেকে বড়দার দেহকে তারা বাড়িতে আনতে পেরেছিল।

মুকুল যতই বলুক, বড়দা চিরদিনের মতো চোর এই ছাপ নিয়ে গিয়েছে।

তখন মেজদা দিন পনেরোর জন্য নিজের ঢাকুরিয়ার বাসা থেকে এই বাড়িতে এসে ছিল বউদিকে নিয়ে। মেজদাই শ্রাদ্ধ করেছিল।

অথচ একটা আবাল্য রেষারেষি ছিল যেন বড়দা আর মেজদায়। রেষারেষি বলেই কি বড়দার প্রায় সব ব্যাপারে সমালোচনা করত ? দুজনের আদর্শের সংঘাত নাকি ? নাকি পিঠোপিঠির রেষারেষিতেই ওদের আদর্শ পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

মেজদা ইণ্টারভিউ দিত। একবার বাড়িতে এসে বললে, এবার আমাদের দুঃখ যাবে। চাকরি পেয়েছি। সকলেই আনন্দ করে উঠেছিল। তারপর প্রশ্ন উঠল, কী সে চাকরি।—পুলিশের এ এস আই। গগন বলেছিলেন,—বি এ অনার্স হয়ে পুলিশের এ এস আই ? মেজদা হাসতে হাসতে বলেছিল,—সুবির আই এ এস-এর অক্ষরগুলোকে উল্টে পাল্টে নিলে এ এস আই হয় না ? গগন বলেছিল, -কিন্তু

পুলিশ! যেন একটা অনেক দিনের চাপাপড়া ঘৃণা। বড়দা বলেছিল,—আমাদের বাড়িতে পুলিশ? যেন একটা দুর্ভাবনার কথা।

মেজদার কি পৃথক কোন আদর্শ ছিল? না কি সে এক আদর্শহীনতা? মেজদা কি জানতে পেরেছিল বড়দা কী করে? তাতেই কি তার বিরক্তি? মেজদা কি দারুণ রকমে রিঅ্যাকশনারি ছিল?

চাপা একটা অসন্তোষ, চাপা হলেও যার পরিমাণ যেন বেড়ে উঠছিল। বড়দা একদিন বলেছিল,—আমাদের বাড়িতে কি পুলিশ মানায়? তখন মেজদার সদ্য বিয়ে হয়েছে। উদ্যোগ করে বড়দাই বিয়ে দিয়েছিল প্রায় চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এখন মনে হয় তার পিছনে মেজদাকে একটা পৃথক বাড়িতে গুছিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল।

সেদিন মেজদা খুব শান্তভাবেই বলেছিল,—বুঝি, বুঝি সবই, কিন্তু চাকরি কি ইচ্ছামতো পাওয়া যায়? কী বুঝেছিল মেজদা? বাবার সেই বহুদিনের পুরনো পুলিশ-বিদ্বেষ তাঁকে ক্রমশ অতৃপ্ত করে তুলেছিল? বড়দার কি অসুবিধা হচ্ছিল নিজেদের বাড়িতে পুলিশ থাকায়?

একদিন মেজদা বলেছিল,—সুবি, গভর্নমেণ্ট থেকে আমাদের বাসাভাড়া দেয়। ভাবছি ঢাকুরিয়ার দিকে একটা বাসা ঠিক করে উঠে যাব তোর বউদিকে নিয়ে।

সুবি বলেছিল,—মেজদা, লোকে কিন্তু তোর খুব নিন্দে করবে। মেজদা বেশ খানিকটা সময় চুপ করে বসে থেকে বলেছিল,—জানিস, সুবি, মুকুল বলছিল আমাকে, আমার এ পাড়া থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়াই ভালো।

মেজদার মুখটা কালো দেখাচ্ছিল, তা কি দুর্ভাবনার, কি দুঃখের, কি রাগের —তা বোঝা যায় না। সুবি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মুকুল? মুকুল একথা বলতে গেল কেন? মুহূর্তে সুবির গলার ভিতরটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে কি আতঙ্ক? মেজদা কি রিঅ্যাকশনারি ছিল? দারুণ রকমে রি-অ্যাকশনারি? শ্রেণীশত্রুদের স্পষ্টতম প্রতীক?

একদিন মেজদা বলেছিল বটে, ভণ্ডামিটা ভালো নয় রে, সুবি। তারা কখনই ভালো ছাত্র হতে পারে না। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা পর্যন্ত বলছে সেই খুনীরা নাকি ভালো ছাত্র সব। তুই নিজেই বল, তুই যে হায়ার সেকেণ্ডারিতে ভালো রেজাল্ট করেছিলি তা কি দিনরাত লেখাপড়াকে ধ্যানজ্ঞান করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করার ফল নয়?

—তুমি কি এসব বাইরেও বল, মেজদা?

—বাঃ, কেন বলব না। এই তো আজ সন্ধ্যেতেই গাড়িতে আসতে আসতে

বললাম, তোদের অধ্যাপক নিখিলানন্দবাবুকে। সাধারণ লোকেরা রোম্যান্টিক কথাবার্তা বলতে ভালোবাসে। ডাকাত হলেই তাদের মনে গরিবের প্রতি দয়ালু একজন বীরপুরুষের ছবি ভেসে ওঠে, যে বড়লোকদের উপরে অত্যাচার করে গরিবদের সাহায্য করে। কিন্তু শিক্ষিত লোক, নিজে যে একজন অধ্যাপক, সে কী করে সায় দেয় যে সেইসব খুনীরা ভালো ছাত্র হতে পারে। বললাম, আপনিও কি বিশ্বাস করেন নাকি ?

নিখিলানন্দবাবু বললেন,—হতে পারে তারা ভালো ছাত্র।

আমি বললাম, আপনি তো অধ্যাপক। পরীক্ষার ফল ভালোই ছিল নিশ্চয়। আপনিই বলুন দিনরাতে কত ঘণ্টা বই মুখে বসে থাকতে হত।

একজন যাত্রী বলেছিল, মেধাবীদের পক্ষে কম পড়লেও চলতে পারে।

বললাম, কার কম পড়লে চলেছিল ? বিদ্যাসাগর, ব্রজেন্দ্র শীল, স্যার আশুতোষ ? আসলে জানিস, স্থবি, এটা একটা প্রচার। আমি নিখিলানন্দর সামনে বললাম, একজন যে খুন করে এসেছে, কিংবা খুন করার সংকল্প করেছে, কিংবা ক্রমশ খুনের সাথে জড়িয়ে পড়ছে, তার মন এমন শান্ত কখনই হতে পারে না যে বই-এর কোন থিয়োরি, থিয়োরেম তার মাথায় ঢুকবে সহজে। যদি তা সত্ত্বেও বেশি নম্বর পায়, ভালো ছাত্র বলে প্রমাণিত হয়, বুঝতে হবে তারা যে দলের কেডার তার দলপতিদের কেউ কেউ আছে অধ্যাপকদের মধ্যে যারা কামুফ্লেজের জন্য পরীক্ষার আগে সেইসব ছাত্রকে পাঁচ-সাতটা করে প্রশ্ন মুখস্থ করিয়ে দেয়। কিংবা পরীক্ষার খাতা দেখে ভালো ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত নম্বর দিয়ে দেয়।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল নাকি তখনই স্থবি ? কেন বলতে গেলে এসব কথা ? কী দরকার ছিল ?

বড়দার মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই মেজদা নিজে বাসা করে চলে গিয়েছিল বউদিকে নিয়ে।

একদিন মুকুলকে জিজ্ঞাসা করেছিল স্থবি, তুই নাকি মেজদাকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেছিস। নাকি বলেছিস, চলে যাওয়াই ভালো।

মুকুল অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে একটা চাপা অশান্তি কিংবা উত্তেজনায় পুড়ছে।

মুকুল বলেছিল, সেই তো ভালো হল। (কেমন যেন উদাস শোনাল তার গলা) একটা কথা বলব তোকে, কাউকে বলিস নে, স্থবীর-শমুকেও না। হয়তো—

—কী এমন কথা যে বলতে পারছিস না ?

—হয়তো এমন হতে পারে তোকে বা আমাকে বলা হল মেজদার উপরে

অ্যাকশন নিতে ?

আতঙ্কে দিশেহারা হয়েছিল নাকি তখন সুবি ?

মেজদার সঙ্গে মাসে একবার করে দেখা হত সুবির । সুবিই যেত মার চিঠি নিয়ে । আর মেজদা টাকার খামটা দিত । বড়দার মৃত্যুর আগে শেষ চিঠি দিয়েছিল মেজদা । লিখেছিল, আগামী মাসে মাইনা বাড়বে । আগামী মাস থেকে বাড়তি টাকাটা তোমাকে পাঠাবো । মা, আমি ভিহিকেল ডিপার্টমেন্টে কাজ করলে ঘুষ-ঘাষে আরও অনেক বেশি পেতে পারতাম । তোমাকে দিতেও পারতাম । কিন্তু আমি স্কুলমাস্টারের ছেলে বলে ঘুষ-ঘাষ নিতে পারছি না ।

সুবি হাঁপাতে লাগল । হাঁ করে-করে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে তাকে । মুকুল কি আন্দাজ করেছিল ? নাকি সুবীর-শমুর কাছে অ্যাকশনের হুকুমটা শুনেছিল ।

তখন মুকুল চলে গিয়েছে । মুকুল, মুকুল···আমি অন্তত আমার দুই হাত দিয়ে চটের থলেটা ধরে ছিলাম ।

সেদিন মেজদার বাসার কাছাকাছি গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে সুবীরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সুবি । আর একটু এগিয়ে একটা গলির মধ্যে একটা চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেছিল শমুকে । অথচ তারা কেউ যেন সুবিকে দেখতেই পেল না ।

ঘণ্টা দুয়েক ছিল সুবি মেজদার বাসায় । বউদি আর মেজদা তাকে কত আদর করেছিল । টাকা দিয়েছিল মাকে দিতে । বউদি বলেছিল, চলো ঠাকুরপো, আজ সিনেমা দেখে আসি । মেজদা বলেছিল, তোর কি শরীর খারাপ লাগছে । একটু শুয়ে নিবি ? চা জলখাবারের পর বউদি গা ধুয়ে এল, পরিপাটি করে চুল বাঁধল । সুবি বাড়ি ফিরতে আর মেজদারা সিনেমার জন্য তৈরি হল ।

একটা প্রচণ্ড চাপে সুবির দম বন্ধ হয়ে আসছে । কালো কালো গ্যাসে তার বুক এমন ভরে উঠেছে যেন তা ফেটে যাবে । আকাশে ঝড়ের মেঘ যেমন বিদ্যুতে ফাটে আর জল নামে গলগল করে তেমন হলে হত ।

মেজদা বউদি বাসা থেকে পঁচিশ গজ যেতে সুবীর-শমুকে দেখতে পেয়ে থেমেছিল । পাড়ার ছেলে ছিল তো । মেজদা কথা বলতে থেমেছিল । আর ঠিক তখনই শমু ছোরাটা বসিয়ে দিল মেজদার পেটে । আর মেজদা পড়ে যেতেই সুবীর ক্ষুর দিয়ে মেজদার গলাটা কেটে দিল । তখনও সুবি বিশ গজ দূরে যায়নি ।

সুবি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল গলা দিয়ে শব্দ বার করতে, চোখ মুচড়ে চোখে জল আনতে । সে বলেনি, মেজদা শমু-সুবীরকে দেখে এলাম । মেজদা তুমি আজ বেরিও না । সে বলেনি মেজদা তুমি শমু-সুবীরকে পাড়ার ছেলে মনে কোরো

না। সে মেজদাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেনি, মেজদা তোমাদের রিভলবার ছাড়া বেরোনো উচিত নয়। বউদি মেজদার শরীরের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুবি এ-গলি ও-গলি ঘুরে বাড়ি ফিরে এসেছিল। বাড়ির নিরাপত্তায়। না, অন্তত সে মেজদাকে সতর্ক করে দিতে পারত, যা সে করেনি। না না···

একটা জান্তব, চাপা আর্তনাদ বার হল সুবির গলা থেকে।

সুলতা এসে বললে, ডাকছো আমাকে?

সুবি চেয়ে দেখল, সুলতা এসে দাঁড়িয়েছে। মলিন পাড়-ছেঁড়া শাড়ি পরা। সে অনুভব করলে এবার অনেক জল আসবে চোখে। কিন্তু দারুণ গরমের হলকা উঠতে থাকলে যেমন বর্ষার মেঘ উড়ে যায় উদাস হয়ে, দু-একটা ফোঁটা মাত্র জল পড়ে শুকনো ধুলোয়, সুবির চোখেও জল এল কি এল না।

সুলতা বললে,—নারায়ণ কি ধারে একসেরটাক চাল দেবে? ওর দোকানে তো আলুপটলও আছে? দেবে ধারে সামান্য কিছু?

অস্ফুটস্বরে সুবি বললে,—মেজদা, মেজদা···

সুলতা বললে,—কিছু বলছ? সুলতা দেখলে, সুবির চোখের সাদা অংশ সব যেন কুয়াশায় ঢাকা, সেজন্যই যেন সে চোখ পিটপিট করছে। সুলতা জানে এ বাড়িতে যে-কোন লোকের যে-কোন সময়ে তেমন হতে পারে সুবির যা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে গেলে তুমি আর ধারে চাল কিনতে যেতে পারবে না।

সুলতা চলে গেলেও সুবির বুক আর গলা থিরথির করে কাঁপতে থাকল। সে নিশ্চয় মেজদার সুন্দর সুগঠিত গলার নালীতে ক্ষুর বসিয়ে দেয়নি কিন্তু, কিন্তু···

কিছুক্ষণ পরে দু-তিন ফোঁটা জল পড়ল সুবির চোখ থেকে। হ্যাঁ, এ বাড়িতে সবকিছুই ঘটছে মেজদা চলে যাওয়ার পর থেকে। সে শুনেছে দমদমের দিকে কী এক অ্যাকশন হয়েছিল এক সন্ধ্যায়। পরের দিন সকালে কাছাকাছি একটা গলিতে সারা রাত্রির ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শমুর শরীরটাকে পাওয়া গিয়েছিল। সে শুনেছে সুবীর কয়েকটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে।

তিন মাস হল মেজদা নেই, এই তিন মাসে এ বাড়ির ঘটনাগুলো এখন অদ্ভুতভাবে আটপহুরে এমন সাদা-হলুদ রঙে আঁকা যে ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে তোমার দৃষ্টি চলে যায়—এবং ওপারেও কিছু থাকে না। মনে করা যায় ঘটনাগুলোকে—কী লাভ? কী লাভ?

যেমন পাঁচ-ছ দিন আগে সকালে মুখ হাত ধুতে গিয়ে সে বড়দার শখের পায়রার খোপটার দরজাগুলো খুলে দিতে গিয়েছিল। সেই কুড়িটি পায়রার মধ্যে তিন-চারটি তখনও ছিল ভামের আক্রমণের শেষে। হঠাৎ খোপের নিচে চোখ

পড়েছিল সুবির। রক্ত নাড়িভুঁড়ি জড়ানো কয়েকটি শাদা পালক চোখে পড়েছিল তার।

যেমন চার-পাঁচ দিন আগে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইলেকট্রিসিটি আগুনের চাইতে শক্তিশালী, তাহলে কি জ্বালাটা আগুনে পুড়ে যাওয়ার চাইতেও বেশি? সে তো বড়দার কথাই। যারা বিদ্যুৎ লেগে মারা যায় তারা হয়তো কিছু অনুভব করে না বলে সুবি পালিয়ে এসেছিল।

যেমন এরই মধ্যে একদিন মা এঁটোহাতে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিলেন—ওরা কেউ খায়নি। সে তো বড়দা আর মেজদার কথাই। কেমন একটা রুক্ষ অনুর্বর গরম বোধ হচ্ছে যেন, যেন সাদা-হলুদ এই শূন্যতার দরজা-বন্ধ-করা একটা গুমোট আছে।

যেমন দু-তিন দিন আগে দুপুরে বউদি তার নিজের ঘরে কাঁদছিল। যেন এক দারুণ অনুতাপের বুকচাপা কান্না। তখনই সুলতা বলেছিল, কী লজ্জা, কী ভয়ংকর হৃদয়হীন লজ্জার কাজ করেছে সে। চার মাস হল সুবির মেজদার মৃত্যু হয়েছে, আর এখন দেখা যাচ্ছে সুলতা চার মাসের গর্ভবতী। কী করে সে বলবে একথা মাকে, কী করে প্রকাশ করা যায় এই হৃদয়হীনতার কথা?

যেন এই রাজ্যে, এই পৃথিবীতে, এই সাদা-হলুদ শূন্যতায় যা ক্ষণে ক্ষণে ধূসর, সেই সময়ে এই নির্লজ্জ প্রাণের অঙ্কুরের কথা প্রকাশ পাওয়া। যেন স্বামীর কাছে থেকে সন্তান গ্রহণ করার চাইতে নিলাজ পাপ আর কিছুতেই হয় না।

আর সুবি উপায়ান্তর খুঁজে না-পেয়ে বলেছিল—আজকাল আইন আছে বউদি। ওকে সরিয়ে ফেলো। চলো হাসপাতালে যাই। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ফিসফিস করে কথা বলছিল সুবি তখন। আর সুলতাও তখনই হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সেই মুহূর্তেই ছেঁড়া আধময়লা শাড়িটা পাল্টে, ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বলেছিল ফিসফিস করে, আমার এই হারটাই আছে—প্রায় তিন ভরির হার। এতে হয়ে যাবে বোধ হয়। যন্ত্রচালিতের মতো জামা গায়ে গলিয়ে এসেছিল সুবি। সে কি তখন হাঁপাচ্ছিল। হয়তো সে নিজে নয়, তার বুকের ভিতরে কেউ।

কিন্তু হঠাৎ না-না বলে তীক্ষ্ণ কান্নায় ভেঙে পড়ে বউদি চৌকির উপর বসে পড়েছিল। সামনে আকুল হয়ে হাত ছড়িয়ে দিয়ে যেন কাউকে রক্ষা করবে।

সুবি ভাবলে,—আচ্ছা, সেই ছেলে বড় হয়ে যদি একদিন আধো-আধো ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, তোমার গায়ে কত জোর কাকা, আমার বাবাকে বাঁচাতে পারলে না কেন?

আবার স্থবির গলার কাছে শিরাগুলো তিড়বিড় করে কাঁপতে শুরু করল।

যদি আরও বড় হয়ে বলে,—কাকা, তোমার দাদা, তোমার নিজের দাদা, তোমার মায়ের পেটের ভাই, তুমি প্রতিশোধ নাওনি কেন?

জোরে জোরে ফুঁপিয়ে উঠল স্থবির বুক। না, কিছুতেই জল আসতে দেবে না সে।

যেমন কাল। কাল সারাদিন স্থবি জনক মুচির কাছে বসে ছিল। জনক মুচি কাজ করছিল। জুতো মেরামত, স্যাণ্ডালে লোহা ঠোকা, জুতোয় রং। আর সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। রোদে, ধুলোয় একটা ইটের উপরে বসে ছিল স্থবি। একেবারে চুপ করে নয়। খড়কুটো উড়ছিল। একটা লম্বা খড় পেয়ে সেটাকে নখ দিয়ে কুটিকুটি করে আনমনে সেই হলুদ-সাদা রোদের গুমোট দুপুরটা কাটিয়ে দিতে পেরেছিল সে।

স্থলতা বাজার থেকে ফিরেছে। একটা কাগজের মতো কিছু হাতে করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে সে ডাকলে স্থবিকে,—স্থবি, স্থভাষ, দেখে যাও।

স্থবি গেল স্থলতার ঘরে। স্থলতা বললে,—দেখো তো এটা কী?

স্থবি দেখলে খবরের কাগজে একটা ঠোঙা, যার গায়ে ছবি। স্থবি বললে,—চাল এনেছ, সেই ঠোঙা?

কিন্তু সে দেখতেও পেল। চমকেই উঠল সে। একটি আলুথালু মহিলার ছবি, শোকে মুহ্যমান বোঝা যায়, এমন কি মুখ দেখে মনে হয় শোকে হাহাকার করছে। সেই ছবিটার কোণে কেটে বসানো একটা ছোট পৃথক ফটো একটি তরুণের। স্থবীর। কী আশ্চর্য স্থবীর।

স্থলতা বললে, সংবাদটা দেখো।

স্থবি পড়লে, অধ্যাপক নিখিলানন্দ আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছিলেন। অসুস্থ হয়ে হসপিট্যালে ছদ্মনামে ভর্তি হয়েছিলেন। স্থবীরের বাবা নিখিলানন্দ। মৃত্যুর পাঁচ-ছয় দিন আগে নিজের পরিচয় দিয়ে স্থবীরকে আর তার মাকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ সরকার স্থবীরের মাকে সংবাদটা জানিয়েছিল মৃত্যুর পরে। তবু সে অভাগিনী স্বামীর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সরকার জেল থেকে স্থবীরকে পিতার শেষকৃত্য করতে, এমনকি শ্রাদ্ধ করতেও ছেড়ে দেয়নি।

ঝিমঝিম করছে স্থবির শরীর। সে যেন ঘরেই নেই। বহুদূর থেকে যেন বউদি স্থলতার গলা ভেসে এল। স্থলতা বললে,—বাস্তবিক, কী নিষ্ঠুর না এই সরকার? এরকম সাংবাদিকতার জন্য পুরস্কার পাওয়া উচিত। দশটা প্রবন্ধর চাইতে এই একটা ছবি, এই এক কলম সংবাদ বেশি কাজ করে।

সুবি কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিলল।

সুলতা বললে,—তুমি দেখো, ঠাকুরপো, আমাদের এই দাশগুপ্ত পুরস্কার পাবে।

সুলতা যেন হাসল। কিন্তু হঠাৎ যেন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—কিন্তু, সুবি, কিন্তু সুবি, আমার ছবি, আমার ছবি কোন সাংবাদিক কি ছাপবে না?

সুবি ভাবলে, আজও সে কি জনক মুচির পাশে সেই ইটটার উপরে চুপ করে বসে সারাটা হলুদ আলোর দুপুর কাটিয়ে দিতে পারবে? বলো, পারবে? হয়তো বাতাসে উড়ে-আসা একটা খড়ও পেতে পারে আবার আজ সময় কাটাতে।

শহরটার নামেই এখন যেন যাত্রা-পালার কথা মনে হয়ে যায়।

একটা ছোটখাট, আঁটসাঁট, আদালত—থানা—জেলখানা আর তাদের হাকিম-সমেত শহর ছিল। তার পর শহর বাড়তে শুরু করেছিল, একটা দোকান, একটা মেরামতি কারখানা, একটা খুপরি ঘর, এইভাবে হাইওয়ে-বরাবর। তার পর এক সময়ে এমন হল, প্ল্যানট্যানের কথা কেউ ভাবে না, যার যেখানে খুশি বাড়িঘর তুলছে। সে সময়ে নতুনদের মধ্যে উদ্বাস্তুরাই ছিল বেশি। আগে শহরটা ছিল চৌকোণ। এখন লম্বায় বাড়তে বাড়তে পুব দিকে এক ফরেস্টের ধার-ঘেঁষা জংলি গ্রামের কাছাকাছি, বিপরীত দিকে একটা রেলজংশনের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। শহরের পশ্চিম দিকে ছোটখাট কল-কারখানা, তাদের সংলগ্ন ঘিঞ্জি-ঘিঞ্জি বস্তি। পুব দিকে শহরের পুরনো সীমানা নালাটা পার হলেই চাষের জমি আলে-আলে ভাগ করা। আর সে-সব জমির মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ঘরবাড়ি—কোনোটি কাঠের, কোনোটি ইটের, বেশির ভাগ কিন্তু বাঁশ আর খড়ের, যাদের পিছনে দূরে মেঘের মতো জঙ্গলের আভাস।

একবার কি হল : কাঠের খাম্বায়-খাম্বায় তার টেনে বিদ্যুৎ এগোল পুব দিকে শহরতলিতে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বিদ্যুৎ নেয় নি। সেই উন্নয়নের ঝোঁক প্রমাণ করতে একটা কাঠের খোঁটার মাথায় একটা শেড ছাড়া বাল্ব দিনরাত জ্বলে।

শহরের আইন-আদালত, থানা, জেলখানার হাকিমদের কাজ নিশ্চয় চলছে। ছোট-ছোট কারখানাগুলোও বসে নেই। ঘিঞ্জি বস্তিতে মদ খাওয়া, মারপিট করা, কেনাকাটা, দু-একটা ছিনতাই—এ-সবই আছে, যেমন শহরে থাকে। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে, যারা অন্তত খোঁজ-খবর রাখে অর্থাৎ নিজেদের গ্রামে-গঞ্জে যারা যাত্রা-পালা নিতে চায়, এ শহরটার মূল্য ধান-পাটের জন্য নয়, সেই-সব ছোট-ছোট কারখানার পিতল-কাঁসার বাসন বা লোহার গ্রিলের জন্যও নয়, বরং এই শহরটা দু-দুটো যাত্রাদলের হেড কোয়ার্টার বলে।

শহরের লোকেরাও এই যাত্রাদলের কথা জানে। কারণ দুটো দল মানে দেড়শ জন লোক। দুটো দল মানে দু-দলের রিহার্শাল, প্রতিযোগিতা, বাইরে থেকে আসা নট-নটী, কাজেই শহরের লোকদেরও কানখাড়া করতে হয় মাঝে মাঝে।

হাইওয়ে-বরাবর পুব দিকে চলতে-চলতে হাট-খোলার কাছাকাছি এসে বিদ্যুতের সেই কাঠের যে-খুঁটি থেকে দিনরাত আলো জ্বলে, তার নীচেই একটা বড় টিনের তৈরি গুদাম। অনুমান হয় এক সময়ে কারো ধান বা পাটের গুদাম ছিল। এ ঘরটাতেই মৃন্ময়ী অপেরার রিহার্শাল বসে থাকে। গুদামটার কাছাকাছি এদিকে ওদিকে ছড়ানো কয়েকটা ইট আর টিনের আধ-পুরনো বাড়ি। বাড়ি-গুলোর এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে কয়েকটা পায়ে-হাঁটা গলি তৈরি হয়েছে। অপেরার যে-সব অভিনেতা অভিনেত্রী অন্য শহরের লোক, যাদের সে-সব শহরে ফিরে যাওয়ার টান নেই, কিংবা দল বদল করার মতো ভালো অভিনয় যারা আর করতে পারে না, তারা প্রায় স্থায়ীভাবে এই-সব ঘরে থাকে। অন্য-সব অভিনেতারা সাইকেল করে শহর থেকে আসে। রিহার্শাল যখন খুব জোরদার, তখন কেউ-কেউ এই গুদামেই থাকার ব্যবস্থা করে নেয়।

যাত্রাদলের লোকেরা কোথাও স্থায়ীভাবে থাকে না, পুজোর পর থেকে শীতের শেষ, এমনকি বৈশাখের ঝড়বৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত, তাদের তো ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। যখন যেখানে পালা গান তখন সেখানেই। বর্ষার সময়টা অনেকেই যাদের ঘরবাড়ি আছে, আত্মীয়স্বজন আছে তারা চলে যায়। কিন্তু তা হলেও এবার যেন একটু বেশি ফাঁকা-ফাঁকা। কামিনী, দুর্গা, আর যদু আছে এক বাড়ির তিনখানা ঘরে। বড় চউরি ঘরখানায় রসিক বেহালাওলা, আর তার ছেলে চাঁদু। ঘরটার পাশ দিয়ে গেলে রসিকের বাঁশি আর চাঁদুর বেহালার ক্যাঁকো শুনতে পাবে। দলের অন্য বাজনদারদের সাড়াশব্দ নেই। কামিনীদের বাড়ির পিছন দিকে গজা, কালি, আর সুরেন। গজা আর কালি কখনও কখনও পালায় নামে, কিন্তু তাদের আসল কাজ পোশাক-আশাক ঠিক রাখা, পরচুলোটুলো ঠিক আছে কি না দেখা। আর সুরেন টিকেট বিক্রি করে, হিশাবপত্র লেখে। চিঠিপত্র দেয়া-নেয়া করে। সুরেনবাবুই তার নাম।

এখন বর্ষাকাল বটে, কিন্তু তাই বলে এমন ছন্নছাড়া বোধ হয় হওয়া উচিত নয়। কথাটা ভবকুমারের মনে লেগেছে।

আজ হাটের দিন। আজ কিছু লোকজন হবে এ-অঞ্চলে। শহরের বাজারের ফড়েরা যেমন, শালবাড়ি, চিকলিগুড়ি, মান্দাস এ-সব বুনো গ্রাম থেকেও ক্রেতা-বিক্রেতারা আসবে। কিছুদিন থেকে একজন করে কনস্টেবলও আসছে। আগে তাও আসত না। কলকারখানার বস্তি অঞ্চলে রাতেও পুলিশ থাকে কখনও কখনও। এ-দিকে যদি পুলিশ আসে, সে দিনের বেলায়, হাটের দিন, মাঝে-মাঝে —আর তা হয়ত সস্তায় থানার বাবুদের জন্য কেনাকাটা করতে।

অবশ্য বলতে পারো কোনো-কোনোদিন রাত করে দু-একজন লোক আসে বাইরে থেকে এ-অঞ্চলে, তা কিন্তু রিহার্শালের পরে। তারা নটীদের কারো কারো পরিচিত হতে পারে। কারা আসে, সংখ্যায় তারা কতজন, কোন্ অভিনেত্রীর ঘরে বসার সুবিধা আছে—এ-সব খবর অত রাতে কে রাখতে যাচ্ছে ? একবারই একটা গোলমাল হয়েছিল, সেই যে কামিনীকে বেশি মদ খাওয়ানোর ফলে। কেঁদে-কেটে কামিনী এমন হৈ-চৈ বাধিয়েছিল যে মনে হবে তাকে মারধোর করা হয়েছে। বয়স হওয়াতে কামিনী এখন সাধারণত বিধবা, শাশুড়ি, সন্ন্যাসিনী এ-সব পার্ট করে। কিন্তু একটা পার্ট এখনও বোধ হয় তার বাঁধা, সেই যে দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা।

গোলমালটা একটু কমই এ-অঞ্চলে।

খাকি প্যান্ট, জামাটা খাকির চাইতে বরং তামাটে, বোঝা যায় ইউনিফর্মের নয়। বুটের উপর দিকটা কেটে ফেলে যেন তৈরি, এমন পাম্প জুতো। পিতলের তাগা পরানো খাটো মোটা বেতের লাঠি। কনস্টেবলই, কিন্তু খানিকটা কর্তব্যে, খানিকটা বেড়াতে এসেছে এমন ভাব। বাসটা চলে গেলে সে পথের ধারের তিনটি দোকানের একটিতে গিয়ে বসল। তেল নুন মশলার বেনেতি দোকান, কিন্তু সামনে পথের ধার ঘেঁষে পাতা ময়লা একটা উঁচু বেঞ্চে সাজিয়ে রাখা হলদে-হলদে কাচের গ্লাশ দেখে বোঝা যায় অন্তত হাটের দিনে চা বিক্রি হয়।

দোকানদারের সামনে একজন ক্রেতা ছিল, তা সত্ত্বেও চোখের কোণে কনস্টেবলকে দোকানে ঢুকতে দেখে নিয়েছিল। দোকানের সামনের দিকে একজন গ্রামবাসীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দোকানদার তাকে উনুনে একটু হাওয়া দিতে বলে কনস্টেবলকে বললে, বসেন, আজ্ঞা।

কনস্টেবল বললে, থাক থাক এখনই চায়ের দরকার নাই। এদিকে বৃষ্টি হয় নাই, কেমন ? দোকানদার বললে, বনের দিকে চেপে সকালে বৃষ্টি ছিল।

ঘরের ভিতরে একটা হাতলভাঙা চেয়ার। তাতে বসল কনস্টেবল। এদিক ওদিক তাকাল। রাস্তার সমান্তরাল বাঁশের দেয়ালে একটা পুরনো ক্যালেণ্ডারে কাল্পনিক এক চিত্রতারকার ছবি। সিনেমার অন্ধকার নয়, সুতরাং সেই বুক উরু ইত্যাদি সোজাসুজি দেখতে লজ্জা বোধ হল কনস্টেবলের। সে বরং সামনের দেয়ালের দিকে চাইল। অনেকদিন থেকে আছে, বড় বড় রঙিন অক্ষরে লেখা পোস্টার, যাত্রারই। মৃন্ময়ী অপেরার বিশেষ অবদান। অবদানের তারিখে দিন, মাস আছে, সন নেই। কতদিনের পুরনো তা বোঝা যায় না। শাদা কাগজ পেয়ে কিছু হিশাব লেখা এক কোণে, এক কোণ ছেঁড়া, মাঝখানে দোলের রঙিন পিচ-

কারির ছোপ। 'বিপ্লবকারী নাটক লেলীন'। ঈ-কার, আর ল-য়ে এ-কার এবং ন'য়ের চাইতে বেশি রঙ ধরে বলেই বোধ হয় পোস্টারটা বেশি চোখে পড়ে।

বিপ্লব শব্দটাই একটু গোলমেলে : গোলমাল, বোমফাটা, রক্ত, মাটিতে পড়ে থাকা জখমী মানুষ—এ-সব মিলে এমন একটা চাপ দিতে থাকে যে উদাসীন থাকা যায় না, পক্ষে বিপক্ষে কিছু একটা করতে হবে মনে হয়। এক পা অন্য পায়ের উপর তুলে জড়সড় হয়ে বসল কনস্টেবল। বললে, বৃষ্টি না হলে ঘাস হয়ে যাবে ধানক্ষেতে। দোকানদার বললে, সকালে বৃষ্টি হয়েছিল সামান্যই।

সে চায়ের গ্লাশটা ধরিয়ে দিলে কনস্টেবলের হাতে। বৃষ্টির সংবাদটা জমল না। চায়ে মন দিল কনস্টেবল।

দোকানদার বললে, হাট জমবে না আজ।

কেন ?

হাটাই নেই ত হাট। দোকানদার দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ করে থুতু ফেললে।

একটা শূন্যতার মধ্যে দিয়ে যেন কথাটাকে ধরতে পারলে কনস্টেবল। বললে, হাটাই, মানে ইজারাদার নেই। হঁ্যা, তাই ত। ঘন ঘন দুবার চুমুক দিলে কনস্টেবল চায়ের গ্লাশে। এটা অন্তত বৃষ্টি হওয়া না হওয়ার চাইতে দরকারি কথা যেন, এমন অনুভব হল তার।

হাটের দিন। একজন ক্রেতা আবার দোকানের সামনে। লোকটির পরনে বেঁটে ধুতি, গায়ের জামাটা ছেঁড়া। নাক চাপা, চোখের গড়ন তেরচা। আদিবাসী হবে। শতকরা হিশাবে এখন তারা ক্রমশ কমছে পূর্ববঙ্গের 'মাইগ্রেশন' যত বাড়ছে ; মোট সংখ্যায় বোধ হয় এখনও বেশি। এক সময়ে শালবাড়ির এদিকে-ওদিকে তারাই সব ছিল। দোকানদার তার ওজন বাটখারার বাক্সর দিকে গেল।

কিন্তু বিক্রি হল না। তেলের দাম নিয়ে মৃদু কথা কাটাকাটি হল।

মুদি ভাবলে, পাচ্ছ তুমি এগার টাকার কমে সরষের তেল। ব্যাটা রাভা। দেখ না কোন্ দোকান দেয়। দোকান ত আর একটাই যেখানে তেল পেতে পার। আর সে দোকানদারের সঙ্গে কাল মাঝরাতে আমার এই দোকানে বসেই মাল ভাগা-ভাগি করেছি। হুঁ হুঁ একই তেল, একই দাম : আসলে এই রাভাদের জাতের ঠিক নেই। ছিল রাভা, মানে হিন্দুই না। হল হিন্দু। এখন আবার বলছে, শুয়োর খাওয়া বন্ধ করে, পচানি খাওয়া বন্ধ করে হিন্দু হয়েও কি লাভ, যদি সকলের নীচেই থাকা ? আদিবাসী থাকা ভালো, সরকার সুবিধা দেয়। আসলে সরকারই করেছে মুশকিল। প্যাঁক-প্যাক করে রেডিও বাজছে। কি ? না, সরষের তেল দশ টাকা। আর কাজ পেল না, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলতে হয় সরষের তেলের দাম ;

বলতে হয়, গাঁয়ের লোকদেরই সুবিধা দিতে হবে। আদিবাসী নিয়ে ত সব পার্টির টানাটানি।

কনস্টেবল বললে, কেউ না কেউ ত হাটাই হবে।

হয় কই? দোকানদার বিরস মুখে এই বলে ভাবলে, তা ওপার থেকে এদিকে পার হয়ে আসার পর, সে নিজেও কিছু করেছে তেমন। ওপারে তারা ছিল বারুজীবী, পানের বরজ ছিল না। তা হলেও জল চলত না। এপারে এখন কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তার ছেলে যে বকসিহাট জুনিয়ার হাইতে মাস্টার, সে বলেছে কাগজপত্তরে শিডুল থাকা ভালো। সরকারের সুবিধা ধরতে হলে কায়স্থ হয়ে লাভ নেই। জাতে ওঠা কিংবা টাকা-পয়সায় ওঠা কোন্‌টে ভালো?

একটা বড়ি গিললে যেন দোকানদার, আর সে বড়ি যে ভয়ানক তেতো তা তার মুখ দেখলে সন্দেহ থাকে না। সাতপুরুষের নামধাম বদলে ফেলার মতো, কেমন যেন অপমানের মতো বোধ হয়, ঠিক চালাকি করার সুখটা হয় না।

কনস্টেবল বললে, তা কেষ্ট সা-র ত অনেক ওয়্যারিশান থাকার কথা।

আছে। মামলাও চলছে।

দোকানদারের বিরসমুখ কনস্টেবল দেখতে পেলে না। দোকানদার তার চট-ঢাকা গদিতে গিয়ে বসল। কনস্টেবল চা শেষ করে একটা সিগ্রেট ধরালে। সে অবাক হয়ে ভাবলে, বড় হাট নয়। তা হলেও লাভ হওয়ার কথা, অথচ কেউ খাজনা তোলে না। দোকান পার হয়ে, মেঠো রাস্তার উপর দিয়ে হাটের জমিটার দিকে সে যেন এই সমস্যাটাকে হেঁটে যেতে দেখলে। এটা তার ডিউটি নয়; চার পাঁচ মাস থেকে এই হাটে সে আসছে। যেন থানার অভ্যাস হয়ে গেছে, হাটের দিন করে তাকে পাঠানো। তা ভালো, সস্তায় কিছু কেনা হয়। সে বললে, হাট বসতে ত সেই দুটো। ঘুরে আসি।

মুদি বললে, আজ্ঞে যান।

দোকান থেকে বেরিয়ে সামনে যে রাস্তাটা সেটা ধরেই হাঁটতে শুরু করলে কনস্টেবল। কিছুক্ষণ সে পরিচিত দৃশ্যগুলোতে ঋতুর জন্য যে পরিবর্তন হয় তা দেখতে দেখতে হাঁটল। পথের ধারে দু-একটা গাছপালা চোখে পড়েই। তা দেখতে-দেখতে হঠাৎ তার মনে হল: এখন পাকা পেঁপের সময় নয়। তা ছাড়া আগে যেমন গৃহস্থের মাচা থেকে ইচ্ছামত লাউ-কুমড়ো, গাছ থেকে কাঁটাল, পেঁপে ছিঁড়ে নেয়া যেত এখন তা যায় না। পাঁচ-সাত বছর আগেও এমন ছিল না।

তার পর সে ভাবলে, আসলে এটা তার চিন্তার বিষয় নয়। হাটের কথাই সে

ভাবছিল। সেটাও নতুন কথা নয়। গত হাটবারে এসে মুদি দত্তমশায়ের কাছেই শুনে থাকবে।

ইজারাদার ছিল কেষ্ট সা। তার ঝোঁক ছিল যাত্রার। নিজে সাজত না। দলকে টাকা দিত। প্রথমে সুদে। পরে যাত্রা তাকে পেয়ে বসেছিল। দলের সঙ্গেও ঘুরত। ছোটখাট পার্ট পেলে সন্তুষ্ট হত। কালডোবার হাটে একটা ঘর ছিল সেখানে কিনত ধান আর তিসি। এই বুধাটি শালবাড়িতে ছিল গুদাম। এখানে কিনত পাট আর তামাক। বড় টিনের দেয়ালের ঘরটাই তার গুদাম। শহরের ভিতরে থানার পাশে বাড়ির সামনের দিকে পিতল-কাঁসার দোকান। সে বাড়িতে বউ আর মেয়ে। কালডোবার ঘরে একজন মেয়েমানুষ থাকত। অন্তদিন সে কি করত জানা যায় না। হাটের দিনে সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে কেষ্ট সা-র জন্য অপেক্ষা করত। এ-সব জানাই যেত না তদন্ত না হলে। তা ছ-মাস হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। কালডোবার হাটের ঘরে কৃষ্টচরণ মরে পড়ে ছিল। সেই মেয়েমানুষটা তার বন্ধ ঘর হাটের দিন ছাড়াও খোলা থাকতে দেখে অবাক হয়েছিল। রাতে কখন এসে থাকবে ভেবে এগিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়ানো কৃষ্টচরণের এক্কা দেখেও অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল সাত-সকালেই ফিরে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে চা খাবে কি না এই খোঁজ নিতে গিয়ে সে অবাক হয়েছিল। অর্ধেক পাতা বিছানায় কৃষ্টচরণ ঘুমাচ্ছে। কিন্তু সে টের পেয়েছিল সেটা ঠিক ঘুম নয়। কষের কাছে বালিশটা লাল। নাকের ফুটোতে রক্ত, জামার বুকের কাছেও রক্তে ভেজা। তার পর জানাজানি। তার পর পুলিশ। তদন্তে জানা গিয়েছিল কৃষ্টচরণের গলার চেন হার, হাতের আংটি, পকেটে সোনার সিগারেট কেস সব ঠিক আছে। জানা গিয়েছিল তার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না, তালাটা খোলা অবস্থায় কড়া থেকে চাবি সমেত ঝুলছিল, সে মশারি টাঙায় নি, বিছানা পাতে নি। খুন? বুকের উপরে ছোট একটা ক্ষত, পেরেক হতে পারে, কিংবা গুণসূচের মতো কিছু। কিন্তু তা হল কোথায়? ব্যাপারটা ঘটার পরেই কি কৃষ্টচরণ এক্কায় করে এই ঘরে এসেছিল; নাকি এখানে ঘটার পরেই সে এক্কায় করে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সব নিঃশব্দে। হয়ত অনেক রাতের ঘটনা, কিন্তু সে-অবস্থাতেও কি লোকে সাহায্যের জন্য লোক ডাকাডাকি করে না? পাকস্থলীতে মদ ছিল। তা হলে কি মদের ঘোরে নিজের ভালোমন্দ বুঝছিল না? বুকের সেই ঘা-টার উপরে ন্যাকড়া পুড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সে কি ভেবেছিল ঘা-টা মাংস ফুটো করলেও ভিতরের কোনো যন্ত্রে লাগে নি? বিশ্রাম করলেই ক্লান্তি সেরে যাবে?

কনস্টেবল মুখ তুলে চাইল। সে গ্রামের পথেই চলেছে। এতক্ষণ ডান দিকে একটা জলা ছিল। এবার পায়ে-চলা পথটা একটা গাছের সামনে এসে বাঁক নিয়েছে। আগে হাটে আসার সুবিধা ছিল। লোকের মাচা থেকে শসা-কুমড়ো, ক্ষেত থেকে ঝিঙে-পটল তুলে নেয়া যেত। পেঁপে-কলা চাইলে পাওয়া যেত। দু-পাঁচ বছরে কি পরিবর্তন। নিজে ক্ষেতে নামলে গাল দেয়, চাইলে হেসে হেসে ঠাট্টা করে। একজন ত একবার বলেছিল—সরকার মাইনা দেয় না বুঝি আজকাল? কিন্তু এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে গ্রাম থেকে হাটের জন্য আনা তরি-তরকারি ফলমূল মাথায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কখনও কখনও। ঝুড়ি নামাতে রাজি করা গেলে কিছু সস্তায় পাওয়া যায়।

তা, কালডোবার সে-মেয়েমানুষটাকে তিনমাস হাজতে রেখেও খুনের কোনো হদিশ হয় নি। চাপাই পড়ে গিয়েছিল। নতুন দারোগা জগন্নাথবাবু আবার নতুন করে তদন্ত করতে চায়। দারোগাবাবু তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলছিল, ওটা ত তীর হতে পারে। কঞ্চির চোখা মাথায়, কিংবা কঞ্চিতে বাঁধা সরু লোহার চোখা শলা। তীর? এই শব্দটাতেই নতুন চিন্তা শুরু হয়েছে। তীর মানে আদিবাসীরা যা এখানে-ওখানে আবার হাতে নিয়েছে। খবরের কাগজ সবাই পড়ে। কনস্টেবলরাও একেবারে পড়ে না এমন নয়। আর সে-সব তীর চালানোর বুদ্ধির সঙ্গে শহরের ছাত্রটাত্রদের যোগ আছে।

কনস্টেবলের সামনে ত একটা পরিচিত গ্রামই। এখানে-ওখানে আখের ক্ষেত, এখানে-ওখানে ধানের জমি; এখানে-ওখানে আলের মাথায় পায়ে-হাঁটা পথ। চওড়া পায়ে-চলা পথের ধারে এখানে-ওখানে আগাছার ঝোপ, এখানে-ওখানে একটা শিমুল, একটা তল্লী, একটা বাঁশ ঝোপ। দূরে দূরে চাষীদের কুঁড়ে, একটা-দুটো জোতজমাওয়ালা লোকের বাড়ি। দুপুরের রোদ। দিনের আলোয় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অপরিচিত পথও নয়। ঋতুর পরিবর্তনে রঙে কোথাও কোথাও যা তফাত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল এ-সব ঢেকে যেন কোথাও কিছু আছে যা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। যদি ওটা সত্যি আদিবাসীদের তীর হয়ে থাকে, যা আজকাল নাকি শহরের ছেলেরাও ছোঁড়ে। তার মনে পড়ল গতবারের হাটে যে হঠাৎ গোলমাল উঠেছিল, যাকে দোকানদাররা ভবকুমারের অ্যাকটিং বলেছিল, তার মূলে অন্য কিছু ছিল নাকি? ভবকুমার নাটক করে বলেই সে হাটে দাঁড়িয়ে পার্ট বলছিল? এখন যাত্রাপালা হচ্ছে না বলে? না কি হাট করতে এসে গ্রামের লোকেরা শুনতে চেয়েছিল? হঠাৎ ভয়ে ভয়ে কনস্টেবলের কপাল, ঘাড়, গলায় বিন্ বিন্ করে ঘাম ছুটল। এদিক ওদিক চেয়ে সে তাড়াতাড়ি হাইওয়ে

ধরার জন্য হাঁটতে শুরু করলে।

হাট উপলক্ষ করে কনস্টেবলের গ্রামে আসা। দেখা যাচ্ছে হাটের সুবিধার সঙ্গে কর্তব্য মিলিয়ে অন্য কেউ কেউ আসে শহর থেকে। শহরের এক ডাক-পিওন আর এক প্রোসেস সার্বারও এসেছে। ডাক-পিওনের কাছে আছে যে-সব গ্রামে তার সপ্তাহে তিনদিন যাওয়ার কথা তাদের কিছু চিঠিপত্র। গ্রামে যাওয়ার পরিশ্রম তার বেঁচে যাবে। প্রোসেস সার্বারের কাজ আদালতের নোটিশ শমন গ্রামে জারি করা। বছর ত্রিশেক বয়সের কালো শুঁটকো চেহারা। জামাটার হাতা এত ছোট দেখে মনে হয় সেটা তার নাও হতে পারে। প্যাণ্টটা হয়ত এক সময়ে নীল ছিল। ধুলো মাখা পায়ে রবারের চপ্পল। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা। শহরের এই অঞ্চলে সে এই প্রথম আসছে। যদিও আদালত থেকে দু-তিন মাইলের মধ্যেই। হয়ত আরও দেরি করে আসত। কিন্তু যে-পক্ষ নোটিশ জারি করাচ্ছে তারা তাকে নগদ পাঁচটি টাকা দিয়েছে, সুতরাং তার পরে প্রথম যে-হাট পড়েছে তারই সুযোগ নিয়ে সে এসেছে।

বাস থেকে নেমে সেও একটা চায়ের দোকানে উঠল। দোকানটার পিছন দিকটায় দেয়াল, আর তিন দিক খোলা। মেঝেটা দেখে বোঝা যায় আজই হয়ত ঘাস চাঁচা হয়েছে। পথের ধারে একটা কাঠের প্যাকিং কেসের উপরে কয়েকটা কাপ উপুড় করে রাখা। একটা জলচৌকির উপরে কাচ দেয়া টিনের বাক্সে স্লাইস করা রুটি, রঙের ফোঁটা লাগানো শাদা শাদা বিস্কুট, তার পাশেই দোকানদারের হাতবাক্স। বসবার জন্য খানকয়েক মোড়া, একটা সরু বাঁশের মাচা। শুধু হাটের দিনেই হয়ত এই নতুন দোকানটা খোলা হয়। তা হলেও সেই একমাত্র দেয়ালে কাচের ফ্রেমে আবদ্ধ, যথেষ্ট পরিমাণে নগ্ন, স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্রহরণের ছবি। একটু খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে ছবিটা থেকে চোখ সরালে প্রোসেস সার্বার, আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে গেল। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, খ্যাংরাকাঠির মতো গোঁফ কয়েকটির নীচে দুটো ভেঙে যাওয়া দাঁতের ফাঁকে মুখগহ্বরটায় কালচে জিভ দেখা গেল। হুঁ, তা এখানে থাকাই উচিত। বেশ বড়ো চৌকোণ পেণ্টবোর্ডে মৃন্ময়ী অপেরার বিজ্ঞাপন। কোনো শহরের রাস্তার ধারে বসানোর মতো করে বানানো। আর পালাগুলোও দেখ, নটী বিনোদিনী, বিপ্লবী লেলীন, সোনাই দীঘি। যেন এগুলো পরপর হবে এমন করে লেখা। প্রোসেস সার্বারের কান দুটো গরম হয়ে উঠল যেন খুব দোক্তা দিয়ে পান খেয়েছে। তিনটি পালাই সে দেখেছে। নটী ত দু-দুবার!

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে জিভ পুড়ে ঝাঁকি লাগল তার মনে। চিন্তাটা

একদিকে যেতে পথ পেলে। সে ভাবলে : যাত্রা শুনে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় না। কিন্তু তার পরেই পরিবর্তন হয়েছিল। পালার নাম শুনে গোলক দত্ত আর হারান চক্রবর্তী—দুজনে দল বেঁধে প্রোসেস সার্বারদের সকলকেই প্রায় যাত্রার আসরে নিয়ে গিয়েছিল। একজনও যেন বাদ থাকে না, এরকম চেষ্টা ছিল তাদের। সেই পালা দেখার পরে যাত্রা ছাড়া কারো মনে অন্য কোনো কথা ওঠে নি যেন। আগে অ্যাসোসিয়েশনের যে ভাব ছিল তা বদলে সব আঁটসাঁট হয়ে উঠল যেন। আগে মুনসেফের বাজার-টাজার করে দিত প্রোসেস সার্বাররা। সে-সব বন্ধ হয়ে গেল। এখনও যদি মুনসেফের ব্যক্তিগত কাজ কেউ করে দেয়, তা গোপনে। কেরানিবাবুদের ব্যাপারেও পরিবর্তন হয়েছিল। আগে তাঁদেরও মুনসেফের মতো খাতির করতে হত। দেখলে উঠে দাঁড়াতে হত। এখন আর তা হয় না। এবারকার পয়লা মে-তে বক্তৃতা দিয়েছিল গোলক দত্ত। কাছারির বটগাছটার তলায় রেলিং দেয়া মুহুরিদের বসার সেই চত্বর, যেন সেই সে জাহাজ, যা থেকে গোলা দেগে মুনসেফের আদালত, এস. ডি. ও.-র আদালত, বকসিহাটের সব বড়-বড় বাড়িঘর উড়িয়ে দেয়া হবে। গরিবদের কুঁড়েগুলো কোনোরকমে বেঁচে যাবে হয়ত। কিন্তু আসলে,···

প্রোসেস সার্বার দোকানদারকে লক্ষ করলে। বয়সটা অনুমান করলে। দোকানদারের পক্ষে চার-পাঁচ বছর আগেকার সেই পালাগুলো দেখে কি অনুভব করা সম্ভব ছিল? হ্যাঁ, সেই নটী বিনোদিনী। ও-পালাটা দেখতে দল বেঁধে যাওয়া হয় নি। একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে যাওয়া। এখনও ভোলা যায় নি। কি রূপ, আর কি অভিনয়! একবার দেখলে আর একবার না-দেখে থাকা যায় না। জানা গেল বকসিহাটের পরে গৌরীপুরে হচ্ছে। বাসের ভাড়ার পয়সা খরচ করে পালা দেখতে গিয়েছিল অনেকে। লুকিয়ে-লুকিয়ে যেন, কিন্তু গিয়ে দেখেছিল অনেকেই উপস্থিত। নটী বলতে সেই ঠাট-ঠমক, হাসি? কি রূপ! কি অভিনয়! আর লজ্জাই বা কি? স্বয়ং রামকৃষ্ণের কৃপা আছে না? কিন্তু···

হারান চক্রবর্তীর এমনিতেই রোগা-রোগা চেহারা। কিন্তু তার পর থেকে কি যে হল তার। লোকে বললে, অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে গোলক দত্তর কাছে হেরেই তেমন হল। চুল উঠে গেল মাথার, গায়ের রঙ মরামাছের মতো। চোখে-মুখে কথা বলত, সে মুখে বাক্যি সরে না।

কিন্তু আসল মজা, কৌতূহল বোধ করলে প্রোসেস সার্বার—এমন একটা রঙ-চং-এর পোস্টার এখন এখানে এল কোথা থেকে?

গলা খাঁকারি দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় হবে?

কি ? দোকানদার অবাক হল।

আঙুল দিয়ে যাত্রার পোস্টার দেখিয়ে প্রোসেস সার্বার চায়ের কাপে মন দিলে।

ও! দোকানদার চায়ের গ্লাশে চিনি ঘুঁটতে ঘুঁটতে বললে, হয় আর কই ?

দোকানের আর এক গ্রাহক বললে—মাঝে মাঝে প্যাঁপো শুনি। দলের তেমন জোর কই। দোকানদার তাকে চা দিয়ে বললে, হলে সেই পুজোর পরে হবে, এখন কি ?

প্রোসেস সার্বার জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে পুরনো পোস্টার ?

পোস্টার ? কথাটা দোকানদারের জানা ছিল না। সে নতুন গ্রাহককে বললে, গজা গত হাটে বলছিল আমি গেলে নাকি পার্ট দিতে পারে।

নতুন গ্রাহক বললে, তুমি সাজবে ? কাণ্ড ? এত লম্বা মানুষের কোন্ পার্ট ?

আমিও তাই বলি।

বেলা দুটো হতে পারে, কিন্তু ঠিকঠাক বলতে পার না, ঘড়ি পাচ্ছ কোথায় ? আকাশে মেঘ থাকায় রোদটা পিঠপোড়ানি নয়। কিন্তু তা হলেও গরম লাগছে। সকাল হতে-না-হতে বাসি রুটি আর আলুপোড়া খেয়ে ক্ষেতে গিয়েছিল তারা, তার পর একটানা কাজ হয়েছে দুটো অবধি। কি ঝাল সেই আলুতে। বুদ্ধিটা গজুর। ঝাল আর নুন চড়া হলে স্বাদ-বিস্বাদের কথা মনে থাকে না। বরং বাসি রুটি জিভকে ঠাণ্ডা করে বলে তাকেই সুস্বাদু মনে হয়।

স্বাদ ? কথাটা এ-অঞ্চলে প্রথম কর্ত্তীর মুখেই শুনেছিল ছিধর। এ-অঞ্চলে আসার মাস দু-এক পরে। সেদিন রাঁধুনি কোনো কারণে রান্না করে নি, কর্ত্তী নিজেই করেছিল। ছিমন্ত আর গজু যেমন টপটপ সপসপ করে খাচ্ছিল, ছিদাম তা পারছিল না। এখন সে পারে। আর গজুর কথা ধরতে গেলে তার আরও বেশি করে খাওয়া উচিত। কারণ এখানে যা সে পায় কাজ করে তা খাবার। কাজ থাকলেই ছিমন্ত দিনের শেষে চার টাকা পায়। ছিধরের মাসে মাসে ত্রিশ টাকা পাওয়ার কথা যা আজ প্রায় একবছর কর্ত্তীর কাছে জমে যাচ্ছে। জমছে ত তার কথামতোই, গজু বলার আগে সে-বিষয়ে কেউ কিছু ভাবে নি। একদিন গজু, তার চাকরির ব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে সব শুনে বলেছিল, তা তোমার নাম ছিরেই হোক, কিংবা ছিধর, টাকাটা মাসে মাসে নিয়ে নিজের কাছে রেখো। ছিমন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন, কর্ত্তী কি মেরে দেবে ? তা কেন, বলেছিল গজা, কোথায় কোন্ কাজে খরচ হয়ে যাবে, তোমার দরকারের সময় পাবে না।

আপাতত ছিধর যা পাচ্ছে তা খাবার। সকালে চা রুটি আর আলুসিদ্ধ, দুপুরে ডাল-ভাত, রাত্রিতে ডাল-রুটি, কোনোদিন একটু তরকারি। কর্ত্তী কোনো কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করে, পেট ভরল ছিরে? কিন্তু ছিধর স্বাদের কথা ভাবছিল। স্বাদ, ও হ্যাঁ, স্বাদ। তুমি জানতেই পার না কোথায় কোন্ স্বাদ লুকিয়ে থাকতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে সেই লম্বা লোকটা, কোমরের আধ-হাতী গামছার কথা বাদ দিলে যাকে উলঙ্গ বলতে হয়, একটা জলার ধারে বসে কুড়িয়ে আনা কাঠকুটোর আগুনে নিচু হয়ে ফুঁ দিচ্ছিল। ছিধর চমকে উঠে আবার জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তখন মনে হয়েছিল, এ আগুন কি রান্নার? এখানে কি কিছু খেতে পাওয়া যায়? সেই লোকটাই পরে ছিমন্ত বলে তার পরিচিত হয়েছে। তখন ক্ষেতে কাজের সময় নয়। ধান পাকতে একমাস দেরি। এখন ছিধর জানে ছিমন্ত তখন বনজঙ্গলে খাদ্যের খোঁজে ঘুরত। এখন ছিধর জানে সেদিন মেটে আলু আর মাছ পুড়িয়ে খাচ্ছিল ছিমন্ত। এটা ছিমন্তর অদ্ভুত সৌভাগ্য যে সে জানে শালবাড়ির জঙ্গলে কোথায় মেটে আলু থাকে মাটির নীচে, শুকিয়ে ওঠা কোন্ জলার কাদায় কালো কালো সাপের মতো সেই মাছগুলো থাকে গর্ত করে। শালপাতায় ধোঁয়া-ওঠা মেটে আলুপোড়া আর কুঁচলা মাচ পোড়া খেয়েছিল ছিধর। এখন তাকে মাছ বলে জানে ছিধর। কিন্তু তখন এক হাত দড়ির মতো কিছু থেকে পোড়া মাটি খোসার মতো খুলছিল ছিমন্ত, ছিধর বুঝতে পারে নি সেটা কি হতে পারে, কিন্তু শাল পাতায়, পরে, সেই গরম ধোঁয়া-ওঠা মাংস আর মেটে আলুপোড়া ছিধরকে দিয়েছিল ছিমন্ত। দু-তিন দিন কিছু না খেয়ে বনে-বনে ঘুরে খোসা-সমেত মেটে আলু, আর কাদার প্রলেপ দিয়ে পুড়িয়ে নেয়া কোনো পাঁকাল মাছ—বিনা নুনে যে অবাক-করা আনন্দ দেয় তার নামই স্বাদ।

ছিধর মুখ তুলে সামনের দিকে চাইল; আসলে তার ক্ষুধা পেয়েছে বলেই এ-সব কথা এমন করে মনে আসছে। হয়ত একেই সত্যিকারের ক্ষুধা বলে যখন এমন-সব কথা মনে হতে থাকে। ক্ষুধা পাওয়ার কথাও—সেই সকাল ছটায় কাজ শুরু হয়েছিল, এখন দুটো বাজে। তা হলেও অদ্ভুত এই ক্ষুধার অনুভূতি—যাকে সুস্বাদই বলতে হয়: শীতের ঝরনার জল আঁজলা করে তুলে খেলে যেমন অদ্ভুত স্বাদ লাগে। মাস কয়েক আগে সে ছিমন্তকে বলেছিল, আর একদিন সেই মাছ আর আলুপোড়া খাওয়া সম্ভব কি না। ছিমন্ত রাজি হয়েছিল। সেদিন ছিমন্তর কাজ ছিল না। ছিধর কর্ত্তীর কাছে ছুটি নিয়েছিল একবেলার। শালবাড়ির বনে ঘুরে বেড়িয়েছিল ছিমন্তর পিছনে মেটে আলুর লতা চিনতে। কিন্তু এক ঝাঁকা মেটে আলু নিয়ে ফিরে এসেছিল ছিধর। মাছ পুড়িয়ে খাওয়ার কথা বলতে লজ্জা

করছিল। সেদিনই একটা ঝরনায় হরিণ-টরিণ যেমন খেতে পারে তেমন করে জল খাওয়ার কায়দা দেখেছিল ছিমন্তর। উপুড় হয়ে ঝরনার জলে শুধু ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে তলার শ্যাওলা ময়লা না ওঠে এমন করে জল খাওয়া। সেই ঝরনার জলও ছিল ঠাণ্ডায় জমানো বেদানার রসের মতো।

এখন বেলা দুটো হল। সকাল ছটায় ক্ষেতে গিয়েছিল. তারপর থেকে এই বেলা দুটো একটানা ধান রোয়া এক হাত জলে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে কব্জি কোমরে চেপে ধরে পিঠ সোজা করা। ক্ষেতে যাওয়ার সময়ে বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু বাসের রাস্তা পার হতে হতে আকাশে মেঘ করে উঠেছিল। ক্ষেতে গিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। ছিমন্ত আর গজা, ছিধর আর কত্তী। মাত্র দু একবার কড়-কড় শব্দ করে আকাশের পিপে আগাপাশতলা ফেটে ঝর ঝর করে জল নামতেই ঘাবড়ে গিয়ে সকলেই ক্ষেত ছেড়ে আলে গিয়ে উঠেছিল। সেখানেও ঝমঝমে বৃষ্টি যা সেই পিঠুলি গাছটায় কিছুমাত্র আটকায় না। মিনিট দুয়েক পরেই যেন বোঝা গেল এ বৃষ্টি ত ভালোই, আলে দাঁড়িয়ে যেমন ভিজছ, ক্ষেতেও তেমনি ভিজবে, বেশি নয়। বাঁ-হাতে রোয়ার আঁটি ধরে, ডান-হাতে জলের নীচে কাদায় রোয়ার শিকড় বসিয়ে দিয়ে তারা লাইন ধরে পিছিয়ে আসছিল। জলের উপরে জল জমে যাচ্ছে, খালি পিঠ গড়িয়ে জল নামছে, আল ছাপিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, টাটকা জল আব পুরনো জলের তফাত খেয়াল হচ্ছে, বিদ্যুতের চাবকানি ঝলসে ঝলসে উঠছে। তার পর রোদ উঠেছিল, ছিমন্ত আর গজার মাথা আর পিঠ থেকে ধোঁয়া উঠছিল। এমন-কি, গজার চাপদাড়ি থেকেও। গজা ঘোঁত ঘোঁত করে নিঃশ্বাসও নিচ্ছিল। কত্তী না থাকলে ছিধর আর ছিমন্ত হাসত।

ছিরের পাশে কত্তী, তার পরে ছিমন্ত আর তার ওপারে গজা। চারজনেই ভূমিদাস। মানে মাটির চাকর। তাই মনে হচ্ছিল, সকলেই তারা সেই তিন একর ভূমির দাস। তার পরিচর্যাতেই নিযুক্ত। তাদের মধ্যে ছিমন্তই নিরন্নতার সব চাইতে কাছে থাকে, কাজ না জুটলে যাকে মেটে আলু পুড়িয়ে খেয়ে বাঁচতে হয়। কিন্তু সেই ক্ষেতে তাকেই সব চাইতে ওস্তাদ রোয়াদার সুতরাং প্রায় দলপতি মনে হচ্ছিল। অন্য দিকে কত্তী, যার সেই ক্ষেত, তারও সেই দাসত্ব থেকে একতিল মাথা তোলার সুযোগ ছিল না। গজা অবশ্য ঘোঁত ঘোঁত করছিল। আজকাল সে কত্তীর সামনেও ঘোঁত ঘোঁত করে। শুনলে মনে হতে পারে, ওটা তার চাপা আপত্তির চিহ্ন।

এ-অঞ্চলে নামগুলোর সঙ্গে একটা বিশেষণ যোগ করা হয়, যেমন বুনো ছিমন্ত, লাটুকে গজা।

গাঁয়ের শেষে বনের ধারে তিন ডেসিম্যাল জমির উপরে জলে পচ-ধরা খড়ের ঘর একখানা। ঘরের পাঁচ সাত হাত দূর থেকেই জঙ্গল। জঙ্গলটা খুব বড় নয়। একশ একরের হবে। তা হলেও সরকারের। খুব বড় একটা জঙ্গলের অংশ ছিল কোনো সময়ে যেন। সেজন্যই ছিমন্তর নাম বুনো ছিমন্ত। সে জমিটুকু হয়ত বন থেকে চুরি করা। সেই ঘরে ছিমন্ত আর এক বুড়ি থাকে। লোকে বলে ছিমন্তর বউ। বলে আর হাসে, অর্থাৎ বউ নয়। বয়সে ছিমন্তর চাইতে দশ বছরেরও বড় হবে। গজু আড়ালে বলেছিল হাসতে হাসতে —তবু ত মেয়েমানুষ। কুড়িয়ে আনার পরে নিজের গায়ের দাদের মতো এই বুড়িকে আর ছাড়াতে পারে নি ছিমন্ত।

তা হলেও ছিমন্ত, কোমরের সুতোয় গোঁজা দু-হাত গামছার কোপনি মাত্র পরে যে শুধু ধানক্ষেতে নয়, গাঁয়ের পথেও চলতে পারে, যার রোগা নড়বড়ে শরীরের হাড়গুলো মোটা মোটা শিরার বাঁধনে বাঁধা বলেই তখন খুলে পড়ে না, যে কাজ থাকলে চার টাকা মজুরি পায়, কাজ না-থাকলে মেটে আলুর খোঁজে দূরের বনেও চলে যায়, সেই কিন্তু কর্তার সব চাইতে ওস্তাদ রোয়াদার।

গজা, লাটুকে গজা, গ্রামের তিন গজার এক গজা। বেঁটে, শুঁটকো, চাপদাড়ি, লুঙি মালসাট করে পরে যে ধানক্ষেতে লেগেছিল, আর প্রত্যেকটি রোয়া জলের তলায় কাদায় গুঁজে দিতে একবার করে ঘোঁত করছিল, সে আট টাকা করে মজুরি নিলেও, রোয়ার কাজ জানলেও, ছিমন্তর ধারে কাছে নয়।

এখন বোঝা যাচ্ছে কর্তার সমান সমান না হোক, গজু ক্রমশ ছিমন্ত আর ছিধরের উপরওয়ালা হয়ে উঠছে যেন। তার আট টাকা দিন-মজুরিই তার প্রমাণ। আলাপটা শুনে ফেলেছিল ছিধর। গম্ভীর মুখে গজু বলেছিল সরকার থেকে মজুরি আট টাকা বলা হয়েছে। কর্তা বোধ হয় মনে-মনে হিশাব করছিল। তখন আবার গজু বলেছিল, সকলকে দিতে হবে না। ছিমন্ত চার টাকার বেশি আশা করে না। আর ছিধর মাসে ত্রিশ টাকা পেলেই খুশি। কর্তা যেন মেনেই নিলে। অবশ্য কর্তাকে আটটা করে টাকা রোজ গজুর হাতে দিতে দেখে নি ছিধর। কিন্তু কর্তার বাড়িতেই থাকে গজু। আগে থাকত পুরনো বাক্সপ্যাঁটরা রাখা ঘরে। কাজ না থাকলে হয়ত পাট নিয়ে দড়ি পাকায়, ছিধরকে দিয়ে ফুটফরমায়েশ খাটায়। বাক্স-প্যাঁটরা রাখার গুদামঘরটায় কেউ কেউ মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আলো জেলে বসে যাত্রার পালার বই বার করে। রিহার্শাল দেয়। একদিন ছিধর শুনেছিল গজা উঠে দাঁড়িয়ে হাত ছড়িয়ে বলছে—এই শোষণের অবসান, এই উৎপীড়ন থেকে মুক্তি আনবে বিপ্লব, আর তোমাদের প্রতিটি গোলা, কমরেড নৌ-সৈনিকগণ,

বিপ্লবের পদধ্বনি। দাগো কামান, ধ্বংস করো শীতের প্রাসাদ। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিধর শুনেছিল। গজা তাকে সেখানে দেখে বলেছিল, কেমন লাগল হে ছিধর ? ভালো, এই বলেছিল সে। কত্তী ডাকছে নাকি ? জিজ্ঞাসা করেছিল গজা। তার পর ছিধরের সঙ্গে সঙ্গে কত্তীর বাড়ির দিকে যেতে গজা বলেছিল— এটা ভববাবুর পার্ট। শুনো একদিন। সে যে কি।

তা হলেও দেখা গিয়েছিল ধান রোয়ার ব্যাপারে গজুও কত্তী আর ছিধরের নিজের চাইতে অনেক ওস্তাদ। ফলে পুব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে নামতে নামতে গজু আর ছিমন্ত যখন তাদের অংশের প্রায় শেষে পৌঁছেছে, ছিধর আর কত্তী তখন জমির মাঝামাঝি নামতে পারে নি। পাশাপাশি ছিল কত্তী আর ছিধর নিজে। জলে ছায়া পড়ছিল কত্তীর। খাটো করে পরা শাড়ির হাঁটু পর্যন্ত কাদা লেপা, রোয়া বসাতে কাঁধ জল ছুঁয়ে যাচ্ছিল, বুকের কাপড় ত ভিজবেই, শাড়ির খোঁটের আড়ে তার হলুদ রঙের খয়েরি-বোঁটা একটা মাই যা থেকে থেকে চোখে পড়ছিল, যা দুধে ভার যেন, যা দেখলে কত্তীর ছোট ছেলেটার কথা মনে হয়, তাও জলে ভিজে যাচ্ছিল। তিনটি ছেলেমেয়ে কত্তীর। তিন রকমের চেহারা। বড় মেয়েটি বছর বারো হবে। পরেরটি ছেলে, বছর আষ্টেকের, তার সঙ্গেই ছিধরের ভাব বেশি। সব ছোটটির এক বছর হয়েছে কি না। তার জন্যই ছিমন্তর বউকে এখন দিনরাত কত্তীর বাড়িতে থাকতে হয়। আর তাকে কোলে নিয়েই কত্তী দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, কাঁথায় জড়ানো, যখন ছিমন্ত প্রথম ছিধরকে চাকরি করে দিতে এনেছিল কত্তীর সামনে।

এখন ত বেলা দুটো বাজে, ক্ষেতের কাজ শেষ করে কত্তীর সঙ্গে ছিধর এখন বাড়ির দিকে। এটা একটা পরিবর্তন। গত বছরে ধান রোয়ার সময়ে কত্তী ক্ষেতে নামে নি। কত্তীর পরনে কাদামাখা হলুদ শাড়ি। ময়লা, পায়ের কাছে ছিঁড়ে উঠেছে এরকম একজোড়া পায়জামা পরে ছিধর ক্ষেতে নেমেছিল। এখন তা কাদা-জলে কালো। সামনে কত্তী, পিছনে ছিধর।

গজু আর ছিমন্ত খাড়া দুপুরে এ-জমির কাজ শেষ করে রোয়ার বোঝা মাথায় করে অন্য আর-একটিতে কাজ শুরু করতে গিয়েছে।

সামনে থেকে কত্তী কথা বলছে। ধানের রোয়া আরও কিছু আনতে হবে। ছিধর যেন স্নান খাওয়া শেষ হলেই যায়। দু-এক জায়গায় কথা বলতে হবে। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষায়। কিন্তু এখন ছিধর বুঝতে পারে ছিমন্তর ভাষার সঙ্গে কত্তীর ভাষার তফাত আছে। প্রথমে তফাতটা ধরা পড়ে না, পরে ধরা যায় নামবাচক শব্দগুলো পৃথক, বিশেষণগুলো অন্য জাতের। ছিধর শুনেছে রাভাদের মধ্যে

সম্পত্তি মেয়েদের পাওয়ার কথা। কত্তী যখন সম্পত্তির মালিক তার মায়ের কাছ থেকেই ত তা পাওয়ার কথা। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা এগোয় না। কেননা, গঙ্গা নিজেই মাঝে মাঝে বই-এর বাংলা নকল করার চেষ্টা করে। ছিমন্ত সব সমেত মোট একশটার বেশি শব্দ জানে কি না সন্দেহ। তার পক্ষে কোন্‌টা কোন্‌ ভাষা তা বোঝা সম্ভব নয়। আর ছিধর…

সে এই খামারে আসার দিন দশেক পরে এক বাদলা সন্ধ্যায় কত্তীর সামনে বসে কথা বলছিল। তখন হঠাৎ কত্তী তার মুখের দিকে এমন ভাবে চেয়েছিল যে তাকে সন্ধানী দৃষ্টি না বলে পারা যায় না। ক্ষেতমজুরের দিকে চেয়ে চেয়ে তেমন করে দেখা কি দরকার যদি সন্দেহ না হয়ে থাকে? কিন্তু সন্দেহ নয়, বরং উপদেশ। তখন সেটা শাবন মাসই। বাদলা আবহাওয়ায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল কত্তী। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কোলে তার কাঁথায় জড়ানো সেই ছেলে বুকের কাছে তুলে ধরা। ছিধর গোরুর জন্য খড় কুচাচ্ছিল। তখন কত্তী বলেছিল : ছিরু, এ-অঞ্চলে কিন্তু জল হবে বলে না। ঝরি বলে। আর সে শব্দটা ঝড় থেকেও নয়। ধারা-ঝরে পড়া থেকে। কত্তী মিষ্টি করে হেসেছিল যেন। আর লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়েছিল ছিধর।

অর্থাৎ কত্তী তাকে শুধরে দিয়েছিল। যেন এ-অঞ্চলের ভাষা যাতে ছিধর ঠিকমতো বলতে পারে তাই উদ্দেশ্য। ছিধর যে আদৌ এ-অঞ্চলের নয় তা কি আর গোপন ছিল?

এখন ছিধরের সে সংকোচটা কেটে গিয়েছে, অন্তত কত্তীর কাছে। সে আশঙ্কা করে, যা বলা উচিত নয় নিজের সম্বন্ধে এমন কিছু সে কত্তীর কাছে প্রকাশ করে ফেলে থাকবে। তার কিছুদিন থেকেই আশঙ্কা হচ্ছিল তার শরীর এই পরিবর্তনগুলোকে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করবে না। একটা কঠিন অসুখের মধ্য দিয়ে যা বিপ্লবের মতো মারাত্মক হতে পারে নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেবে। কত্তীর কাছে চাকরি নেয়ার সপ্তাহ তিনেক পরেই হবে। সকালের থেকেই জ্বরটা প্রকাশ পেয়েছিল। তার থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল যে-ঘর তার স্যাঁতসেঁতে কাঠের মেঝেতে দাঁতে দাঁত চেপে সন্ধ্যার দিকেও সে নিজের শরীরকে যেন বলছিল—আর একটু কষ্ট সহ্য করো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলেও সত্যি ত দম বন্ধ হয় নি, এটা ধনুষ্টংকারের মতোও নয়, মাথা ফেটে যাওয়ার মতো হলেও সত্যি ফেটে যায় না, আর তা ছাড়া প্রকৃতির এই নিয়ম : সহ্য করার সীমার বাইরে গেলে অনুভব করতেও পারবে না। ভয় কী? ওদিকে পথের ধারের বাক্সপ্যাটরার ঘরে যাতে যাত্রার সাজসরঞ্জাম আছে বলে এখন ছিধর জানে, তখন সেখানে বেশ জোরে

রিহার্শাল হচ্ছে। তার পরের কথা ছিধর শুধু অনুমানই করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কি করে তা সম্ভব হয়েছিল তা ছিধর জানে না। সে চোখ মেলে দেখেছিল অন্য একটি ঘরে, একটা শাদা চাদরের বিছানায় সে শুয়ে আছে। ভয়ে সে উঠে বসতে যাচ্ছিল। তখন সে কত্তীর গলা শুনেছিল। কাকে যেন সে ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছে।

গজাই হয়ত গিয়েছিল শহর থেকে ডাক্তারকে আনতে। তখন হয়ত ভোর-ভোর হবে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে কত্তী কি করে ছিধরকে সেই তার স্যাঁতসেঁতে কাঠের মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। জ্বর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে নি। জ্বরের ঘোরে সে কি আর আবোল-তাবোল বকে নি? আর সে-সব কথা থেকে নিশ্চয়ই কত্তী বুঝে থাকবে সে ঠিক এ-অঞ্চলের লোক নয়।

আর ঠিক সে-সময়েই একদিন ছিধর একটা মিষ্টি সুগন্ধ পেয়েছিল। চেনা-চেনা লাগছিল। নামটা মনে পড়ছিল না, কিন্তু তা একটা নামকরা দামী সাবানের। আর তখন তার মনে হয়েছিল কাঠের দেয়ালের ওপারে কেউ স্নান করছে, জল ছিটিয়ে পড়ার শব্দ আসছে। ঘরে স্নান করা, সেই দামী সাবানের মৃদু গন্ধ—সবই শহরের কথা বলে। কত্তী সম্বন্ধে এটুকু বোঝা যায় যে কখনও কখনও তেমন স্নান করে সে।

এর চাইতে বেশী ছিধর জানতে চায় না। জানার অর্থ অতীতকে ফিরিয়ে আনা। বোঝাই যাচ্ছে কত্তীর এই বত্রিশ-তেত্রিশ বছর জীবনে প্রতিদিনই অতীত বাড়ছে। অন্যের অতীত খোঁজ করার এই এক দোষ যেন তা অন্য এক দেশে যাওয়া, যেখানে তুমি নিজের অতীতকেও দেখতে পাও। তখন তোমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ছিধর আগে ভাবত অতীতের কথা মনে করা যেন অল্প জলে বাস করতে অভ্যস্ত কোনো মাছের এক অন্ধকার সমুদ্রের গভীরে নামা। দম বন্ধ হয়ে আসে, অন্ধকারে চোখে দেখা যায় না। এখন সে ভাবে, তা নয়, বরং জলের দু-এক ফুট নীচেকার অস্পষ্ট আলোর নীল নীল স্তরে যে অভ্যস্ত সে-রকম মাছের জলের উপরে উঠে আসা। সেখানে প্রচুর অক্সিজেন থাকতে পারে, অন্ধকার কাটানো আলো, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলে দম নেয়া যাবে না।

পথের ধারে কুড়া। কুড়ায় এখন অনেক জল। জলের উপরে একটা নুয়ে-পড়া ছাতিম গাছের ডাল।

ছিধর ভাবল এখন সে তার জলের এক ফুট নীচেকার নীল নীল আলোতে চলতে এমন অভ্যস্ত হয়েছে যে পাখনার কোনো বেহিশেবী ধাক্কায়, ল্যাজের কোনো ভুল চাপে আর দম-বন্ধ-করা জানা-শোনার আলোতে ভেসে উঠবে না।

তেমন ভেসে না ওঠার জন্য আর চেষ্টা করতেও হয় না। যেমন পুরনো বাক্স-প্যাটরার সেই ঘরে ঢুকে, এমন-কি, সেগুলোর একটার উপরে চেপে বসলেও তার জানতে ইচ্ছা করে না যাত্রাদলের সেই-সব সাজ-পোশাক কেমন। অনায়াসে সে সেগুলোকে পাথর-টাথর মনে করে তার ফাঁকে ফাঁকে বর্তমানের নীলাভ জল কাটিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। আর চেষ্টা করতেও হয় না।

সব চাইতে বড় প্রমাণ সেদিনের ঘটনাটা। ভববাবু তাকে কি অছিলায় ডেকে নিয়েছিল গুদামঘরে। কথায় কথায় একটা স্যুটকেশ খুলে দেখিয়েছিল কাগজপত্তর। তার মধ্যে একটা ছিল লেনিনের পার্ট করার জন্য প্রশংসাপত্র। ভববাবু বলে যাচ্ছিল আর ছিধর শুনে যাচ্ছিল, চোখের সামনে মেলা কাগজটার অক্ষরগুলো যেন তার মগজে ঢুকবে না। পাশে ছিমন্তও ছিল। তার মুখের ভাব আর ছিধরের মুখের ভাব একই রকমের বোকা-বোকা ছিল। এর জন্য ছিধরকে চেষ্টা করতে হয় নি, যেন আপনা থেকেই তার মনের মধ্যে পর্দা নেমে এসেছিল।

কিন্তু কত্তী বললে, দেখো ছিধর, কুড়ায় কি সুন্দর টলটলে জল। স্নান করে নিলে হয়।

তাড়াতাড়ি চায়ের দোকানে ফিরে ভাবলে কনস্টেবল : হয়ত এদিকের অবস্থা খুব ভালো নয়। সেবারের হাটে ভবকুমারের কথাগুলো ভাবো : এমনি করেই আমরা মেহনতী মানুষের রাজ আনব। গুঁড়িয়ে দেব সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের শিকল ; ভেঙে পড়তে থাকবে ধনতন্ত্রের ধ্বজা, কমরেড শক্ত করে ধরো হাতিয়ার, আর ঐক্যকে রক্ষা করো চোখের মণির মতো। কি বলবে, হাটের লোকের অনুরোধে ভবকুমার পার্ট শুনাচ্ছিল ? তা কি শোনায় কোনো যাত্রাপালার লোক ? নাকি, এখন পালা হচ্ছে না বলে ভবকুমার ঝালিয়ে নেয়ার সুযোগ নিচ্ছিল ? নাকি লোকটাই আধা-পাগলা হয়ে উঠেছে পার্ট করতে করতে ?

প্রোসেস সার্বার ভাবলে, কিন্তু মামলাটাই একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল। নটী বিনোদিনী সেজেছিল যে সে আর কেউ নয় হারান চক্রবর্তীর হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী মৃন্ময়ী। প্রথম চেপে রেখেছিল হারান, তার পর প্রকাশ পেয়েছিল জলে ডোবার ঘটনা বলে। দু-বছরের মেয়েকে ফেলে একরাতে বাড়ির পিছনের নদীতে, পারে স্যাণ্ডাল ফেলে নাকি ভেগে গিয়েছে বউ। কি নির্লজ্জ ! কি নির্লজ্জ ! গৌরীপুর কি খুব দূরে এ শহর থেকে ? এ শহরের ধারে কাছে না এলেই হত। নাকি ভেবেছিল যাত্রার সাজে তাকে চেনা যাবে না। কিন্তু সকলের

চোখের মণি হয়ে উঠেছে যে বিনোদিনী নটী তাকে কেউ-না-কেউ চিনে ফেলতেই পারে। হারান চক্রবর্তী গিয়েছিল নটীর উপরে রামকৃষ্ণের কৃপা দেখবে, দেখে এসেছিল নিজের ঘর-পালানো বউকে।

কিন্তু মামলাটাই আসল হাটে হাঁড়ি ভেঙেছিল। তিন বছরের আগেকার সেই মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এক বছর হয়। প্রোসেস সার্বার কাঁধে ঝোলা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আবার এই দু নম্বর মামলা। সেবার প্রোসেস সার্বার কে ছিল কে জানে। হারান নয়, তা হলে ত জমাট গল্প হত।

মামলার দিনে দিনে আদালতে আসত না। লাভ কী? সব কথাই বেরিয়েছিল, আর কি ফস্‌কা মুখ সে মেয়ের। গোবিন্দ নট্টর ছেলে-বউ করেছিল মামলা। মৃন্ময়ী বুধাটি-শালবাড়ির যে সাতাশ-আটাশ বিঘা ধানের জমি ভোগ-দখল করে, যে বাড়িতে সে থাকে, সে যে মৃন্ময়ী অপেরার মালিক হয়ে বসেছে—এ-সবই বেআইনী। কি লজ্জা! মৃন্ময়ী যে নাকি ব্রাহ্মণের সধবা সে আদালতে সার্টিফিকেট দাখিল করলে—সে গোবিন্দ নট্টর রেজিস্ট্রি বিয়ের বউ। ও পক্ষের উকীল কম যায় না। ছুরি দিয়ে যেন কাটবে মৃন্ময়ীকে। আপনারা ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। নট্টকে বিয়ে করলেন? মেয়েমানুষ বলে কিনা, ডোমের ব্রাহ্মণের চাইতে নট্ট হওয়া ভালো। উকীল বলেছিল এক বউ থাকতে গোবিন্দ অন্য একজনকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করতে পারে না, বিশেষ তাকে যার স্বামী বর্তমান। মেয়েমানুষ বলে কিনা, বিয়ে ছাড়া ছুঁতে দেব কেন? মামলায় একতরফা ডিক্রি হয় নি। গোবিন্দর শহরের সম্পত্তির উপরে মৃন্ময়ীর হক প্রমাণ হয় নি। কিন্তু মৃন্ময়ী অপেরার অস্থাবর দুভাগ না করে উপায় ছিল না, অপেরাই ত তার নামে। বুধাটি-শালবাড়ির বাড়ি আর জমি মৃন্ময়ীর নামেই খরিদ, তার দখল নাকচ করা যায় নি।

আর এবার মামলা করেছে কৃষ্ট সা-র বউ। বুধাটি হাটের খাজনা, বুধাটি-শালবাড়ির গুদামবাড়ি যাতে মৃন্ময়ী অপেরার রিহার্শাল বসে, তার সংলগ্ন অন্যান্য ঘর —এ-সবই দাবি করেছে কৃষ্টচরণের স্ত্রী।

এখন আর এ-সব গোপন নেই। এখন আর গোপনও নেই কৃষ্ট সা অনেক টাকা ঢেলেছে মৃন্ময়ী অপেরায়। হারান মুখ খোলে নি। কিন্তু সেই মেয়ে যাকে ফেলে মৃন্ময়ী পালিয়েছিল সে কি করে এখন মৃন্ময়ীর কাছে গিয়ে উঠেছে। হারানের আত্মীয়রা বলে পাপ বিদায়। গোবিন্দ নট্টর দরুন এক ছেলে আছে। আর সব ছোটটি বোধ হয় কৃষ্ট সা-র দরুন।

মামলা উঠলেই সব জানা যাবে। কিন্তু ভেবে দেখো হারান কলকাতা থেকে বিয়ে করে এনেছিল পাশ-দেয়া বউ। তার পিতৃকুলও নিশ্চয় তেমন ভালো বামুন

ছিল না। নইলে হারানের ঘরে আসে ? মেয়েটি যেন এ-সব জাতকুলের ব্যাপার ফেলে দিতেই চায়, তাতেই সুখ। ওদিকে আবার যদি তাকে রানী সাজাও কত লোক পায়ে মাথা মুড়োতে ছুটবে। সেই মৃন্ময়ী...

তাকেই নোটিশ দিতে হবে মামলার। এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পেরে সে অবাক হয়ে গেল। কি এক অদ্ভুত কাজ সে আজ করতে যাচ্ছে। সে তার হাতে নোটিশ দেবে সেই নটী বিনোদিনী মৃন্ময়ীর. তার মুখোমুখি দাঁড়াবে ! তার মনে হল সে পানটায় এত বেশি দোক্তা খেয়েছে যে এখনই কপাল কান সব ঘামতে শুরু করবে।

ভবকুমারের সকালেই মনে হয়েছে আজকের দিনটাও ভালো যাবে না। কাল সারাদিন সে আত্মসমালোচনায় কাটিয়েছিল। আজ সকালেও সে ভাবটাই আছে। মাঝখান থেকে যে-মাথাধরাটা অনেকদিন ছিল না—আজ সকাল থেকে সেটা দেখা দেবে মনে হচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত ও কাজটাও ভালো হয় নি।

আত্মসমালোচনা করতে হলে নিজের অতীতকে দেখতে হয়। মৃন্ময়ী অপেরার ভবকুমার ওরফে ভববাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ হল। অতীতটাও দীর্ঘ। তাতে অনেক পরাজয় থাকে। যা মনে করে সুখ হয় না। অনেক ভুলে-যাওয়া কথা মনে পড়ে যা চেষ্টা করে ভোলা হয়েছে। সে যাত্রায় তার প্রথম দিকের পাঁচ-ছ বছরের পর থেকে সব কথা মনে এনেছিল। এক সময়ে সে নরকাসুর পালায় কৃষ্ণ সাজতে শুরু করেছিল। কারণ কৃষ্ণ সাজতে লম্বা লোক লাগে না। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে যখন তার বেড়ে ওঠার কথা, দেখা গিয়েছিল সে আর লম্বা হচ্ছে না। বরং মোটা হচ্ছে, কর্কশ দাড়িতে গাল ভরে উঠছে, সারা গায়ে ঘন লোম। নাক মোটা, চোখ ছোট। অর্থাৎ পঁচিশ বছর বয়সে যখন তার রাজা, সেনাপতি ইত্যাদির পার্ট পাওয়ার কথা তখন সে বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যাবে সে যাত্রার জগতের বাইরে। তার পর থেকে ভাঁড়ের পার্টই তার ভাগ্যে জুটত। সে লোক হাসাতে পারত মাথার টাক দিয়ে, নিজের ভুঁড়ি দিয়ে। কিন্তু বলো ডেলাইটের ঝলমল আলোর সামনে ঝলমলে পোশাক পরা সেই-সব রাজা, সেনাপতি, রাজপুত্রের পার্ট। ভাঁড় হয়ে সে নিশ্চয় লোক হাসাত, সেজন্যই চাকরি যায় নি, গজা আর কালীর মতো নামতে হয় নি পোশাক-আশাক তদবির করার কাজে। কিন্তু ভাঁড়ের সেই হাসির পিছনে কি কান্না থাকে তা কি কেউ বোঝে? সে কখনই রাজপুত্র নয়, রাজা নয়, বীর নয়, প্রেমিক নয় ! চোখের সামনে মঞ্চের আলোয় সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে সে বঞ্চিত। কেউ কি কখনও পদক দেয়ার কথা ভাবে ভাঁড়কে ?

আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে ভববাবু দেখেছে সে গোড়ার দিকে অন্ধকারে বসে এমন-কি কেঁদেছে, হাসির পার্ট করতে স্টেজে যাওয়ার আগে। কিন্তু হঠাৎ তার জীবনের মোড় ঘুরেছিল। দুর্গেশনন্দিনী পালায় নবাব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন কামিনী, যে বিমলার পার্টে দু'একটা পদক পেয়েছে, সেই বলেছিল ভববাবুকে দাড়িটাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বুড়ো নবাবের পার্ট চালিয়ে নেয়া যাবে। গোবিন্দ নট্ট উপায় না দেখে রাজি হয়েছিল, তখন কামিনীই দলের সেরা নটী। প্রাণ ঢেলে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল ভববাবু। না হোক ওসমান, না হোক জগৎ সিংহ, তবু ত ভাঁড় নয়, তবু ত একটা দৃষ্টি-আকর্ষণ-করা চরিত্র। কামিনীকে এই সাহায্যের জন্য গোপনে একটা আংটি কিনে দিয়েছিল ভববাবু। কিন্তু রোজ ত দুর্গেশনন্দিনী হয় না। আবার সেই ভাঁড়ে ফেরা, নতুবা গ্রাম্য কোনো কৃষকের পার্টে, যারা রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফাঁকে ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা বলে গল্পটা আসলে কি তা বোঝাতে চেষ্টা করে। ঘৃণা ধরে গিয়েছিল সেই-সব রাজা, সেনাপতি, রাজপুত্র যারা অভিনয় করত তাদের উপরেই। হ্যাঁ বিদ্বেষ, বিদ্বেষই বলতে পারো। সে কি অভিনয় করতে পারে না? অথচ ভাগ্য তাকে বেঁধে মারছিল। তার পর। সেও কামিনীই। নটী বিনোদিনী তখন নতুন পালা। দেশময় হৈ চৈ। কামিনী হাসতে হাসতে বলেছিল রামকৃষ্ণর পার্টে ভববাবুকে মানাবে। ভালো লেগেছিল সেই পার্ট। অনেক ভক্তিমতী তাকে স্টেজে আসতে দেখে জ'কার দিয়ে উঠত। কিন্তু ঢোলা ঢোলা কোট আর লালপাড় কোরা ধুতি পরে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে সেই সুর করে কথা বলা বেশিদিন কোনো মানুষকে সন্তুষ্ট রাখে না। মানুষ চিরদিন নিষ্পেষিত থাকে না। একদিন না একদিন সুবিচার পাবেই। রামকৃষ্ণর পার্টে ভক্তিমতীরা যতই জ'কার দিক তা কখনই নায়কের পার্ট নয়। নায়িকা নটীর জন্যই সেই পালা। কিন্তু একদিন দেখা দিল বিপ্লবী লেনিন। আর সেদিন তার বেঁটে চেহারা, মাথার টাক, মোটা নাক যা এতদিন তাকে ঠকিয়ে এসেছে তাই হল ঐশ্বর্য, এমন-কি, এতদিন ধরে জমিয়ে রাখা বিদ্বেষ—সব কাজে লেগে গেল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো দিন তার অনুভব হত বৈকি, সেই-সব পদক পাওয়া রাজা-সেনাপতি রাজপুত্রদের বিরুদ্ধেই সে দাঁড়িয়েছে। ছায়া ছায়া সেই-সব চরিত্রকে চিরদিনের মতো সে মুছে দেবে অভিনয়-কৌশলে। এবার নায়ক। ভববাবু প্রথম অভিনয়ের দিন মা কালী আর রামকৃষ্ণকে এমন ভাবে ডেকেছিল মনে মনে, যে চোখে জল এসেছিল তার। তার পর জয় জয়কার। একদিন নটী বিনোদিনীর নাম, তার পরের পালায় লেনিনের নাম।

হায়! ভববাবু মাথা টিপলো নিজের। খুবই খারাপ লাগছে তার। কাল মন

খারাপ ছিল। আজ আরও খারাপ লাগছে। কাল মন কত খারাপ ছিল তার প্রমাণ সেই কাণ্ডটা। দশ বছর পাশাপাশি থেকেও যা হয় নি, কাল তা হল। কামিনীর ঘরে রাত কাটিয়েছে সে। যে কামিনীকে এবার দুর্গেশনন্দিনীর বিমলার পার্টও কেউ দেবে না, অথচ এই কামিনীই এক সময়ে তিলোত্তমা ছিল। না, ভববাবু নিজেকে সংশোধন করলে, কামিনীকে সে ঘৃণা করছে না। তার মনে হয়েছিল সে-ই একমাত্র বন্ধু। যদিও এখন যে প্রেম জমে নি তার বিস্বাদই যেন মুখে। যেন একটা ভাঁড়ামি করেছে তারা দুজনে রাত জেগে।

তার মন খারাপ হওয়ার কারণ কাল যা ছিল : তা তো এই যে তার আশঙ্কা হয়েছে মৃন্ময়ী অপেরা এবার ভেঙে যাবে। এটা শুধু বর্ষাকালের ছুটি নয়। হয়ত বর্ষার পরেও আর তেমন করে রিহার্শাল হবে না। সুরেনবাবুর চিঠি লেখাই সার হবে। অথচ অন্য দলে এই বয়সে বোধ হয় কেউ ডাকবে না তাকে। আর এ-সব আশঙ্কার কারণ মৃন্ময়ীর নিজেরই যেন চাড় নেই এবার। একবারও কি রিহার্শালে এসেছে? যেন মনে হচ্ছিল গজা, ছিধর আর ছিমন্তকে নিয়ে সে ধানক্ষেতেই আটকে থাকবে। গজা যে কিনা মেয়েমানুষের গালে রঙ মাখাতে মাখাতে নপুংসক, মেয়েমানুষের পোশাক গুছিয়ে রাখা যার কাজ আর হদ্দ চাষা ছিমন্ত, আর ছিধর। এরকম খারাপ মন নিয়েই কাল সে শহরে যাচ্ছিল। তখন কর্ত্রী বলেছিল তার ছেলেমেয়েদের কাপড় জামার সঙ্গে ছিধরের জন্যও পায়জামা আনতে একজোড়া। দুপুরে কেনা-কাটা শেষ করে সে এক বটতলায় জিরিয়ে নিচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার মনে হয়েছিল যেখানে সে বসেছে তার পাশেই থানা! তখন মনের মধ্যে একটা জ্বালা ছিল। তা কথায় দাঁড় করালে এই হয় : মাসে ত্রিশ টাকার ক্ষেতমজুর আর তার জন্য পায়জামা কিনতে হবে তাকে! কিন্তু এই কথাগুলোকে মনের সামনে আনলেও জ্বালাটা কোথায় ধরা পড়ে না। ভাবতে-না-ভাবতে সে থানায় গিয়েছিল যেন থানা একটা দেখার জিনিশ। কিন্তু সে তো ভয়ের জায়গা। সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসছিল। কিন্তু বাঘকে ছুঁতে গেলে বোধ হয় আঠারর বেশি ঘা হয়। দারোগা তাকে দেখে ফেলেছিল। কিহে, কী চাও? আজ্ঞে না, দেখছি। দারোগা ধমকে উঠে বলেছিল—থানা দেখার জায়গা বটে। তার পরে দারোগা ভববাবুকে নিয়ে পড়ল। কোথায় থাকে, কি করে, এ-সব জেনে নেয়ার পরে দারোগা হঠাৎ ধাঁ করে জিজ্ঞাসা করে-ছিল, তোমাদের গাঁয়ে কোনো ছোকরা-টোকরা লুকিয়ে নেই ত? ভববাবু দারো-গার টেবিলে এক হাত রেখে অন্য হাত দিয়ে তা ঘষতে ঘষতে বলেছিল, আছে একজন, লুকিয়ে কিনা বলতে পারি না। ছিধর নাম!

এখন এ ভেবেই তার মন খারাপ হচ্ছে সে কি সত্যি ভেবেছিল ছিধর তাদের

অপেরা ভাঙতে পারে? সেজন্যই কি সে থানায় গিয়েছিল? কেন? কি যুক্তি? অসুখের সময়ে কত্তী ছিধরকে দেখত বলে? থানা থেকে বেরিয়েই তার মন খারাপ হয়েছিল। তা কাটাতেই কামিনীর ঘরে ঘুমানো। তাতে আরও মন খারাপ হয়েছে। উপরন্তু মাথা টিপ্‌টিপ্‌ করছে।

ভাবো কামিনীর এখন চল্লিশ ত বটেই। না, না, কামিনীর প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কামিনীর কাতুকুতু লাগে। তা হলেও সে মাঝরাতে দু-একবার গলাব স্বরে আবেশ এনেছিল। যেন সত্যিকারের আবেশ।

কামিনীর বলা দুটো কথা তার মনে আসছে। এক নম্বর : কামিনী শুনে বলেছিল, এই দেখ, ভববাবু, ওই বাইশ-তেইশ বছরের ছিধর সত্যি মৃন্ময়ীকে কেড়ে নিতে পারে? দুই নম্বর কামিনী বলেছিল : রামকৃষ্ণ যদি বিনোদিনীকে দয়া করেন তবে আমাকে কি করবেন না, আমিও ত নটী। একসঙ্গে বলা নয়, দুটো কথা : একটা প্রথম রাতে আর অন্যটা শেষ রাতের দিকে হবে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই : ভববাবু কি কামিনীকে বলেছিল কেন তার মন খারাপ হয়ে উঠেছে? সে কি সত্যি সত্যি ছিধরকে ভয় করছে? ছিধর মৃন্ময়ী অপেরা ভেঙে মৃন্ময়ীকে সত্যি মৃন্ময়ী করবে—এরকম কিছু বলেছে নাকি শেষরাতের বিছানায় ভববাবু? তা হলে কি এই দাঁড়ায় না যে সে থানাতে ছিধরের খবর দিতেই গিয়েছিল নিজের অজ্ঞাতে।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে (ভববাবুর মন এই বেলা দুটোতে আরও খারাপ হচ্ছে, কামিনীর ঘরে যখন সে প্রথম গেল তখন তাকে বন্ধু ভেবে কামিনী রামকৃষ্ণের কথা বলেছিল, অনেক উজ্জ্বল আশা ছিল তার মুখে, বিনোদিনীর মতো সেও দয়া পাবে এরকম বিশ্বাস করছিল, আর সকালে সেই কামিনী চায়ের কাপে করে মদ দিয়েছিল ভববাবুকে, নিজেও খেয়েছিল।) : ভববাবু নিজের খারাপ মন ভালো করতে গিয়ে কামিনীর আশা নিবিয়ে দিয়ে এসেছে। আর—সকালে কামিনীকে কালো মনে হয়েছিল।

বিপ্লবী লেনিন যে অভিনয় করে তার কি উচিত হয় কারো নামে পুলিশকে বলা? ছি-ছি-ছি।

ছিধর ভাবলে, কত্তী তাকে স্নানের কায়দা শিখাতে বলেছিল, জলের তলায় কাদা থাকে এই-সব কুড়ায়, ভেসে ভেসে স্নান করতে হয়। তার পাশাপাশি ভেসে থেকেছিল কত্তী। হলুদ শাড়ি থেকে কাদা ধুয়ে নিয়েছিল। জলের তলায় বোঝা যাচ্ছিল তার গড়ন কত সুন্দর। আর তখন তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, বোকা ছেলে, ওদিকে তাকিয়ে সাঁতার দাও, ছাতিম গাছটার গোড়ায় কত

হাজার হাজার হলুদ ঘাসফুল দেখো।

জল থেকে উঠে কত্তী বলেছিল : তুমি সামনে চলো ছিরে, আমার গায়ে জামা নেই। এখন ছিধর ভাবলে, ফুল, পাহাড়, নদী সকলেই এরকম কিছু বলে। পাতা, মেঘ, কুয়াশাকে তারা ব্যবহার করে কথার বদলে।

ছিমন্ত আর গজা ধান রোয়া শেষ করতে পারলে কি না, তা দেখতে যাচ্ছে ছিধর এখন। বেলা তিনটে বাজে এখনও তারা খেতে আসে নি। ফলে সে নিজেও খায় নি। আলের পথে কাছে হবে বলে সে খুশিমনে আল ডিঙোচ্ছে। অবাক লাগে না ধানের চারাগুলোর কথা ভাবতে? খুব পুরনো ব্যাপার খুবই পুরনো, তবু কিন্তু দেখো কত্তীও বললে, যা না ছিরে, দেখে আয় আর রোয়া লাগবে কি না। এক অদ্ভুত আগ্রহ, যা ভালোবাসার মতো। এমন ক্ষুধা, আর মাটির বড় কাছে তবেই তো প্রকৃত চাষী...

মন খারাপ হতে হতে আবার এক সময়ে ফিরে দাঁড়ায় বলেই না আত্মসমালোচনার দাম? ভববাবু ভাবলে, আর সে ভুল করবে না। আজ একবার কামিনীকে বলবে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ভাই। না কি তেমন করে ক্ষমা চাইলে মেয়েরা অপমান মনে করে? তা যাই হোক আর সে ভুল করছে না।

এখন উঠে রান্নার ব্যবস্থা করে সে স্নান করে নেবে। এই ভেবে ভবকুমার উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই সে অবাক হয়ে গেল। একটা ঘোড়া আর তার পিঠে এক দারোগা। হাটখোলার থেকে বরং তাদের যাত্রার কারখানার দিকে আসছে। আশ্চর্য ত! ভববাবু যেন মাটিতে বসে পড়বে এমন মনে হল। এ কি হতে পারে? এ কি সম্ভব যে কালকের খবর পেয়ে ইতিমধ্যে দারোগা চলে এল গ্রামে ছোকরা বিপ্লবীর খোঁজে? ধুর, তা হয় না। এখনও, ভবকুমার, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছ। কামিনী, তুমি নিজেকেও ক্ষমা করো, ভাই। ও-সবই দুঃস্বপ্ন, সেই থানার ব্যাপারও। গ্রামে আসা হয়ত দারোগার ডিউটি, যা সে ইদানীং করত না। আজ মনে পড়েছে।

গুদামের সামনে সিমেন্ট বাঁধানো পাতকুয়োতে স্নান করতে গেল ভববাবু।

কোনো কোনো দারোগা নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। থানার এই বড় দারোগাও তাই। কৃষ্ট সা-র মৃত্যুর ব্যাপারে তলিয়ে দেখা তার বুদ্ধির একটা পরিচয়। সাইকেলের বদলে ঘোড়ায় চড়াও তেমন আর একটি। সাইকেল আলে, খানা-খন্দে, বনে অচল। সাইকেলের পথ আটকানো যায় পথে ডালাপালা ফেলে

রেখে ; আল, খানা-খন্দ, পথের উপরে পড়ে থাকা ডালপালা টপকে পার হয় তার ঘোড়া। কুষ্ট সা-র পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তীরের কথা নেই, হয়ত কোনো মেয়ে-মানুষ আত্মরক্ষা করতে গিয়ে হাতের কাছে ছুরি, কাঁচি যা পেয়েছিল তাই দিয়ে তেমন খোঁচা দিয়ে থাকবে, কিন্তু দেখে নেয়া উচিত। কাল যাত্রাদলের ভববাবু যে খবর দিয়েছে তা যাচাই করা ভালো। হঠাৎ সে দেখতে পেল আলের পথ ধরে একটা পায়জামা পরা ছোকরা হাঁটছে।

ভববাবু ভাবলে, দারোগাসাহেব তোমার আসা যাওয়াই বৃথা। এটা শহরের বেশ্যাপল্লী নয় যে চোর ছিঁচকে অপরাধী লুকিয়ে থাকবে। হুঁ হুঁ। ভববাবু জল তুলে মাথায় ঢালতে শুরু করল। হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা। আসলে এটা ত বর্ষাকাল। মানে কি না পৃথিবীর অম্বুবাচী হয়েছে। তা ধান রুইতে হবেই। তার পরে, আজ সন্ধ্যা থেকেই, কনসার্ট বাজিয়ে রিহার্শাল শুরু করা যাবে। রামো। কি কাণ্ডই সে করেছে কাল। বেহালাদার আছে, চাঁদু ফ্লুট বাজাবে। গজা আর কালী দু বেটাকেই আজ বসাতে হবে করতাল আর ঢোল বাজাতে ; এতদিনে না শিখে থাকলে কোনো পার্টি ছাড়ে ? আর কর্তাকে বলতে হবে—আপনার নটী বিনোদিনী কলকেতার নটী বিনোদিনীর চাইতে কমি নয়। আর এবার, দয়াময় রামকৃষ্ণ, তুমি মৃন্ময়ী, কামিনী, দুর্গা, সকলকেই দয়া করো। এবার ও পার্টটাতেও মন দেবে সে : প্রাণ ঢেলে দেবে সেই ঢোলা কোট আর লালপাড় কোরা ধুতি পরে। আর —এবার সে লেনিনের ছবি জোগাড় করে নেবে। কলকাতায় সে-ছবির বই পাওয়া যায়। দাড়িগোঁফ ঠিক তেমন করে নেবে সে কাঁচি ধরে নিজের হাতে। আর পোজ কয়েকটাও। আর ছিধর, হাসল ভববাবু। ছিধরের রূপ আছে। যতই বোকা বোকা করে তাকাক, বড় ঘরের ছেলেদের মতো চোখনাক। তা প্রিন্স রোমানভের পার্টেও বেশি কথা নেই। রসো, ছিধরকেও এবার দলে টেনে নিতে হবে ওই পার্টে। না, দারোগামশাই, এ যাত্রাপাড়ায় যাত্রা ছাড়া কিছু হয় না। এখানে নতুন কিছু নেই।

দারোগা হঠাৎ অবাক হয়ে গেল। আলে আলে পায়জামা-পরা ছোকরা যাচ্ছে। দূর থেকেও তার পরিষ্কার গায়ের রঙ যেন দেখা যায়। দারোগা এগিয়ে গিয়ে—ভালো করে দেখতে ঘোড়া চালালো।

ছোকরা বেশ আলে আলে যাচ্ছে। আর যেন তাড়াতাড়িও করছে। দারোগার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয়-ভয় করে উঠল। তাই নাকি ? এত দিন পরে সে কি তেমন কোনো গা-ঢাকা-দেওয়া ছোকরাকে দেখে ফেলেছে ? তার মুখের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল। তার আণ্ডারউয়্যার ভিজে উঠলো। ব্যারাকপুরের

নতুন ট্রেনিং-এর কথা ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠলো মনে। অর্থাৎ গুলিটা তোমাকেই প্রথমে করতে হয়। ওপক্ষ কি করবে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা চলে না।

দারোগা ঘোড়ার রাশ টানলে। ছোকরা কি ফিরছে? নাকি আলটা গোল হয়ে ঘুরছে বলেই সে কাছে আসছে মনে হয়? তার মুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেখে ফেলেছে সে দারোগাকে। ওই ত ঝোপের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মাঝ-খানে একটা ঝোপের তফাত। দারোগা মনে করলে গুঁড়ি মেরে থেকে ছোকরা হাত তুলেছে। আর দেরি না করে দারোগা গুলি করল।

দারোগা ত ভয় পেয়েছিলই। ছিধর কেন ভয় পেল? সে কি সত্যি ভয় পেয়ে ঝোপের আড়ালে গিয়েছিল, না কি পথটাই ওখানে উঁচু-নিচু বলে মনে হয়েছিল, সে আড়ালে বসে পড়ে পরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

ছিধর চমকে উঠল, ব্যথাটা এমন যেন ব্যাথা বলে ধারণা করাও সম্ভব নয়। বুকের ডান দিকে হাত দিতে রক্তে হাত ভিজে গেল। সে আস্তে আস্তে মাটির দিকে ঝুঁকতে লাগল। পা বেঁকে যাচ্ছে; কি করবে সে? যা ভাবছিল, মৃন্ময়ী নাটক করতে গেলে সে কি করবে—তাই কি আবার ভাববে। ছিধর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। মাটিতে মুখ নাক দিয়ে রক্ত পড়ল। ব্যথা পেল না।

লেদু মিঞার ঘুম ভেঙে গেল। আর তাতে সে অবাক হলো। কারণ সে কি এক সংকোচে আধখানা মাত্র চোখ মেলেছিল, কিন্তু তাতেই সে বুঝতে পেরেছে সে একটা মশারির মধ্যে। রেললাইনের ধারের সেই আমবাগান নয়। মশারি, বালিশ, খুব একটা পরিষ্কার না হলেও বালিশটা একটা চাদরের উপরে। তার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, তার পর ধড়ফড় করে যেতে লাগল। জেলখানার সেল? হস-পিট্যাল? ভোর হচ্ছে? তার ডান হাতটা লম্বা করা ছিল। নিঃশব্দে আঙুলের ডগা দিয়ে মশারি সরিয়ে দেখলে হয়। মশারি সরানোর আগেই তার আঙুলে লেগে ঠক্ করে কি একটা মেঝেতে পড়ল। তার সারা কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম ফুটল। এখন? এখন? কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। সে ঘুমের ভান করে চোখ বুজলে। বন্ধ চোখের ফাঁক দিয়ে সে দেখলে একটি স্ত্রীলোক আসছে। শাদা কম দামী গাউন পরা। ফলে থলথলে ঝোলা মাই আর বেঢপ বড় পেট। মশারি তুলছে। শক্ত করে চোখ বন্ধ করলে লেদু মিঞা। কিন্তু তা হলেও আন্দাজ করা যায়। মশারি তুলছে। বিছানায় দু হাতে ভর দিয়ে স্ত্রীলোকটি ঝুঁকে পড়ছে তার মুখ দেখতে। কি যেন দিয়ে খুব নরম করে তার কপাল গাল গলা মুছে দিলে। তার পর তাড়া-তাড়ি চলে গেল। লেদু মিঞা শুনলে কে বলছে, শুনছ, শুনছ, কই শোন, হ্যাঁ তোমার রোগী খুব ঘামছে কিন্তু। ঘুম-জড়ানো গলায় কেউ বললে, কোরামিন দাওগে। এক মিনিট দু মিনিট, তিন মিনিট। এবার লেদু মিঞা চোখ মেলে দেখে নেয়ার চেষ্টা করলে। চার-পাঁচ হাত দূরে যে দরজা তা দিয়ে স্ত্রীলোকটি কিছু একটা হাতে করে আসছে। ইতিমধ্যে সেই গাউনের উপর একটি শাড়ী জড়িয়েছে বোধ হয়। স্ত্রীলোকটি মশারি তুললে। বললে, শুনছ শুনছ, এই যে। লেদু মিঞা চোখ দুটোকে আবার শক্ত করে বন্ধ করল। পালানোর আর কি উপায়? কিন্তু স্ত্রীলোকটি বাঁ হাতে একটা ওষুধের গ্লাস ধরে ডান হাত তার গালে রেখে ধীরে ধীরে এমন ঝাঁকাচ্ছে যে চোখ না মেললেই অস্বাভাবিক হয়। স্ত্রীলোকটি বললে, কই, হাঁ কর একটু। লেদু মিঞা ধীরে ধীরে বোকা বোকা মুখ করে হাঁ করলে। মাটি কেটে বেড়ায় এমন ভূমিহীন চাষীর মুখ যেমন হতে পারে। কিন্তু কি তেতো। চেষ্টা করেও গা ঝাঁকিয়ে ওঠা বন্ধ করতে পারলে না সে। তখন সে ভাবলে বিষ

নয় তো ? স্ত্রীলোকটি বললে, কোরামিন তো। তেতোই হয়।

এর পরে কি কথা না বলে থাকা যায়, লেদু মিঞা বললে, এলা আইত, না বিহান ?

স্ত্রীলোকটি অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। তার পরে যেন হাসতে গেল, কিন্তু হাই তুলল। বললে, রাত দুটো হলো। পাঁচটায় হরলিক্স দেব। আমি, আমরা পাশের ঘরেই আছি। দরকার হলেই ডেকো। সংকোচ করো না।

স্ত্রীলোকটি চলে গেল। আবার শব্দ করে হাই তুলল।

কি নাম ? লেদু মিঞা। কি নাম, ঠিক করে বলো। লেদু মিঞা। সাকিন ? বলি, থাক কোথায় ? কইমারি। কি কর ? কিছু একটা কর তো ? জে, মাটি কাটা। লেদু মিঞা দু-এক মিনিট এই কথাগুলোকে মনে মনে আউড়ে নিল একবার। কিন্তু···

এটা কিন্তু স্বপ্ন নয় ? স্বয়ং আমবাগানটাই স্বপ্ন। কিন্তু বেশ স্পষ্ট স্বপ্ন। তা, আমবাগান হলো কি করে ? সেটা তো মাঠ ছিল। এখন কিন্তু কোরামিন খাইয়ে গেল। কোরামিন···প্রাণ···

তা হোক এটা কোথায় ? কেমন যেন ডেজ্ড লাগছে। লেদু মিঞা চমকে উঠল। মনে মনে না না বলে এই ইংরেজি শব্দটাকে মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করলে। মাটি কাটা লেদু মিঞা। কি সর্বনাশ, ইংরেজি শব্দ। সে খুব সতর্ক হলো, খুবই সতর্ক। মিটমিট করে নিয়ে চোখ দুটোকে পুরোপুরি খুললে। ডান পাশ ফিরেই শুয়েছে। ডান হাতটা লম্বা করে রাখা। নিঃশব্দে হাতটাকে তুলে চোখের সামনে আনলে। একেবারে অবাক হয়ে গেল সে। আঙুলের নখে এতটুকু ময়লা নেই। যেন কেউ ঘষে ঘষে হয়তো সাবান দিয়েও ময়লা তুলে দিয়েছে। আবার তার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠল। তা হলেও এবার আগের চাইতে কম। তার মুখ, তার মুখ ? তাও কি ধুয়ে দিয়েছে ? একটা আয়না—এখন তো রাত দুটো—কিন্তু কি বলে স্ত্রীলোকটার কাছে আয়না চাওয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি আবার হাতটাকে নামিয়ে রেখে, চোখ বন্ধ করলে—ওরা কথা বলছে।

সে শুনলে :

একটু সরে শোও না। কোথায় যে শুই।

তোমার দুই ঘরেই আঁটে না। তো এক ঘরে।

খোকার লেপে শোওয়াই যায় না। পা ছুঁড়ছে।

এসো না আমার কম্বলের তলায়।···

জানো ? কথা বললে।

জরটা ছেড়ে যাচ্ছে। এবার ঘুমাও। কাল অনেক ভাবনা-চিন্তা আছে।

কিন্তু এ-দেশী চাষীদের ভাষায়। বললে আইত, বিহান। অ্যামনেশিয়া নয় তো?

তুমি ভুল করো নি তো? (হাসির শব্দ) পরনে সবুজ ক্যাটকেটে ময়লা লুঙ্গি। ঘেমো গন্ধ। ময়লা চুলদাড়ি।

ভুল করব কেন? যত রোগা হোক, মুখে যত দাড়িই হোক। তা ছাড়া তোমার সেই কনস্টেবলই তো বললে, আবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে পান্না সেনের নাম করেছিল। তা তোমার কনস্টেবলটা অন্তত হাঁদা নয়।

এ শহরে পান্না সেন একজন···

আনলে কি করে একা? সেও অবাক। একটা পুরুষমানুষ তো।

আহা, আড়াইমণি একজনকে তুলতে হয় না?

সে তো সুখের সময়ে।

আ-হা-হা। না, না, এখন নয় লক্ষ্মীটি। এখন ঘুমিয়ে নাও। কাল অনেক ভাবনা-চিন্তা আছে। এই হেবো, বোনের গায়ে পা তুলে দিচ্ছিস কেন। যা, যা, ঠিক করে শো।

লেদু মিঞার চোখ দুটো বড় বড় হলো, তীক্ষ্ণ হলো। তা হলে? তা হলে এটা? তা হলে ভালোই হলো, এটা পান্না সেনের বাড়ি। জেল-মেল নয়। হস-পিট্যাল নয়। কেন যেন তার চোখ দুটো জলে ভরে এল। মাথার ভিতরে খুব দুবল লাগছে। লেদু মিঞা আবার ঘুমে ঢলে পড়লে। ডেজড্, ডেজড্। তা হলে তার সতর্ক হওয়া দরকার। সে বাঁ হাত দিয়ে, দুর্বল লাগা সত্বেও, রাগটাকে তুললে। কোমরের কাছেই চোখে পড়ল—একটি রঙিন শাড়ী ভাঁজ করে তার পরনে। তা হলে বোঝা যাচ্ছে ওরাই কেউ তার লুঙ্গি ছাড়িয়ে কোমরে শাড়ীটাকে জড়িয়ে দিয়েছে। তা হলে? তা হলে? পায়ের ব্যাণ্ডেজ। কবে এসেছে সে এখানে? কবে এনেছে ওরা? কি ভয়ংকর যে দুর্বল লাগছে! এখন ঘুমিয়ে নিতে হয়। কাল অনেক ভাবতে হবে। সে অনুভব করলে এখন ভেবে কিছু করা যাবে না।

অন্য যে প্রশ্নগুলো পারা যাচ্ছে সেগুলো লিখে যেতে থাকলে পরে ওই বড় কমপালসারি কোয়েশ্চনটা, যার একটাই মাত্র অলটারনেটিব, মনে আসবে। সে চোখ বন্ধ করে ছড়িয়ে থাকা ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে বিছানার চাদরে লিখতে শুরু করলে। একবার চমকে উঠতে যাচ্ছিল, কে যেন বললে, সাবধান, লেদু মিঞা কখনোই পরীক্ষার হলে ঢোকে নি, কিন্তু তখন উত্তর লেখার চাপে আঙুলগুলো নেতিয়ে গেলো

দুর্গা শব্দটা নানা রকমে উচ্চারণ হতে পারে। উঠে বসেই কপালে জোড়া হাত ঠেকিয়ে চুড়িবালার শব্দের মধ্যে হাই তুলতে তুলতে ওই শব্দটা উচ্চারণ করলে যেমন শোনায় তেমন শব্দ করে এই বাসার গিন্নি উঠে বসল। ত্রিশ বছর হলেও তার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। যদিও তারা আট বছর থেকে শুরু করে ছ-মাসের একটিতে ঠেকেছে, তাকে গিন্নি বললে বেমানান হয় না। যদিও তা মুখের উপরে বলা উচিত নয়, কারণ এখনও সে বিকেলে গা ধুয়ে মুখে একটু পাউডার দেয়, চুলে বিনুনি করে। কেউ মুখের সামনে সে রকম বলে ফেললে, তখন কিছু না ঘটলে পরে সংসারের কাজকর্মের মধ্যে একটু নির্জনতা খুঁজে নিয়ে, তাকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটাকে পরীক্ষা করতে দেখা যাবে। তার নাম তো প্রকৃতপক্ষে 'শুনছ'। মা তো আর কারো নাম হয় না। এ বাড়িতে একজনই নাম ধরে ডাকে, তার ওই 'শুনছ' বলে ডাকা শুনতেও ভালো। একটা নাম অবশ্যই তার আছে। তো সে শুনতে ভালো হলেও, পার্থের মা হলেও, আজকালকার চোখে তাকে ভালো লাগে না। হিসাব করলে তারও···কি আবার! পৃথা।

বিছানা থেকে উঠে, সেই শোবার ঘরের দরজা খুলেই যে বারান্দা সেখানে স্টোভ কেটলি ইত্যাদি, স্টোভটাকে ঝাঁকিয়ে তেল আছে কিনা দেখলে, ধরালে, জল তুলে দিলে। ভাবলে, এই যে নাই নাই, আজই আবার তেলের কথা বলে দিতে হবে। সাধে কি মানুষ বিপ্লব বিপ্লব করে। বিপ্লবের হেতু ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সে কেটলিতে জল বাড়ালে। খোকনের দুধ, 'ওঁর' আর তার নিজের চা, আর··· । এবার সে অবাক হয়ে গেল। ঘরে অতিথি না? আহা। জল ফোটার আগেই বাথরুম থেকে ফিরে আসতে হবে। সে সেদিকে যেতে যেতে ভাবলে, আশ্চর্য হতে হয় না? ফিরে এসে হাত পা মুছে সে যেন থমকে দাঁড়াল। সে আয়না চিরুনি বার করে আনলে, ঘরের মধ্যে এখনও অন্ধকার। এদিক ওদিক ধরে আঁচড়াতে তার যেন একটু সংকোচ বোধ হলো। কি মোটা হচ্ছি। সে চট করে শাড়ী পালটেও নিলে। অন্যান্য দিন এ-সব দরকার করে না। স্নানের আগে আর কবে শাড়ী পালটায়? আজ দেখ ওকে পাঁচটায় হরলিক্‌স খাওয়াতে হবে। আশ্চর্য কিন্তু, না? বিশ্বাসই হয় না। অবিশ্যি সে দিন সেই সাত-আট মাস আগে বলেছিলাম বটে, এসো-না একবার বেড়াতে। তো হরলিক্‌সটাই সব শেষে। দুধ করে বোতলটা খোকনকে দিয়ে, আজ বিশেষ করে একটু আগেই দিতে হবে, না হলে এখনই মাই-এর জন্য হাঁ-হাঁ করে উঠবে, তার পরে চা। তার পরে হরলিক্‌স। উনি বলছিলেন ডিহাইড্রেশন। আর তা হলে তরল জিনিসই বেশি খাওয়াতে হয়। আশ্চর্য না?

'শুনছ' (পৃথা) দুধ করে, বোতলে ভরে, ঘরে গিয়ে, ঠোঁটে আঙুল রেখে

ডান তর্জনী ভাঁজ করে ঠোঁটের উপরে আলতো আলতো ছোঁয়ালেই ঘুমন্ত অবস্থা-তেই পাখির ছানার মতো হাঁ করে মাই খোঁজে। আর এখন তো হাত বাড়িয়ে দু হাতে ধরে ফেলেই। বোতলটাকেও ধরে রাখতে পারবে। ছেলেকে দুধের বোতল ধরিয়ে সে চা ভিজালে। এটা না হলে আবার ওঁর ঘুম ভাঙে না। কিন্তু আজ ঘুম ভাঙল। চা ছেঁকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার আগে 'উনি' (যার নামই তো পান্না সেন) উঠে এল। স্টোভের পাশে বড় একটা মোড়ায় বসে মস্ত একটা হাই (হাইগুলো তার দোতলা হয়, একবার হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে আরও উঁচুতে আর একটা) তুলে বললে, কই দাও, আচ্ছা রোসো, উঠেই যখন পড়েছি, কুলকুচ করে নি। তা করে এসে বসে স্ত্রীর মুখ দেখে হেসে বললে, বাহ্। হতেই হবে। ওল্ড ফ্রেম তো।

যাও। পৃথা বললে, আমি ভেবে মরি। আচ্ছা মুখটুক ধোয়াতে হবে নাকি ?

ডাক্তার (তো সে ডাক্তারই, পুলিস হসপিট্যালের ডাক্তার) চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, পটাশ পারমাঙ্গানেট জলে যদি পারো কুলি করাতে। ফিডিং কাপেই দিও। তোলাপাড়া এখন থাক। ভাবতে হবে, বুঝলে।

গ্লাসে পটাশ পারমাঙ্গানেটের জল আর ফিডিং কাপ নিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকলে পৃথা। ভাবলে। সেগুলোকে পাশের টেবিলে রেখে খাটের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে মশারি তুললে। জানলা খুলবে কি না ভাবলে। ঘুমন্ত রোগীকে দেখে তার ভয় ভয় করে উঠল। এই নাকি সুপর্ণ কাঞ্জিলাল ? আশ্চর্য, না ? আহা। কিন্তু এখনও দেখ সেই রকম ধারালো নাক।

সে কয়েকবার মৃদুস্বরে ডাকলে। একটু ঝুঁকে পড়ে গালের উপরে হাত ছুঁইয়ে ধীরে ধীরে নড়ালে। এখনও কিছু জর আছে। মুস্কিল তো। তখন সে ডান হাতে তর্জনীটাকে ভাঁজ করে দুই ঠোঁটের মাঝখানে রাখলে। একটু নড়াতেই যেন আঁকু-পাঁকু করে উঠল। অবশ্যই খোকনের মতো নয়। পৃথা সলজ্জভাবে অজ্ঞাতসারে বুকের কাপড় টেনে নিয়ে বললে, কই, সুপর্ণ, বলেছিলাম না পাঁচটায় ? একটু সাহস করে সে তর্জনীটাকে চাপা ঠোঁট দুটোর মধ্যে বসিয়ে দিয়ে নাড়লে। রোগী চোখ মেললে বটে কিন্তু পৃথার ভয় হলো যদি পারমাঙ্গানেটের জলটা গিলে ফেলে ? তার চাইতে আগে খেয়ে নিক, পরে··· । বললে, হাঁ কর, একটু হরলিক্স খাও।

মুখে দেয়ার সুবিধার জন্য সে বিছানার পাশে বসলে।

অবাক লাগতে লাগল রোগীর। দু-একবার গিলে সে অনুভব করলে এমন মধুর উষ্ণ তরল, যেন প্রাণই, সে আর কখনও খেয়েছে কি ? ফলে কাপটা ফুরিয়ে গেলেও সে হাঁ করেই থাকল। কিন্তু এতক্ষণে, সে আবার অন্য এক কারণে অবাক হলো, যেন দেখছে না এমন করে সে চার দিক দেখতে চেষ্টা করলে। তার মনে পড়ল যেন

কাল থেকেই সে এই ঘরটায় আছে। আর এই স্ত্রীলোকটি যার চুলগুলো এইমাত্র পিঠের উপরে খুলে পড়ল···

পৃথা একটা তোয়ালে এনে মুখের পাশটা মুছিয়ে দিলে। বললে, আবার নটায়। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নেব ফলটল দেয়া যায় কি না। আর একটু ঘুমিয়ে নাও।

কিন্তু লেদু মিঞার পক্ষে ঘুমিয়ে নেয়া সহজ নয়। সে চোখ বুজলে, অপেক্ষা করলে কতক্ষণে এই বিস্ময়টা কমে। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ খুললে, ঘরের হলদে জাতের আলো, দেয়াল, মেঝে, এমন-কি সিলিং লক্ষ্য করলে সে। সে জোর পাচ্ছে বললে মিথ্যা বলা হবে। এখনও মাঝে-মাঝে অনুভূতি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে এটা কারো বাড়ি। হসপিট্যাল নয়, এমন-কি হাজত ঘরও নয়। পাশের ঘরে অনেকগুলো শিশুকণ্ঠের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, মনে হলো দরজার কাঠে শব্দ হলো। খুব মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দরজার পাল্লা ফাঁক হচ্ছে! সে স্থির করলে সে এমন ভাবে চোখ বন্ধ করে রাখবে যাতে মনে হবে সে দেখতে পাচ্ছে না অথচ প্রকৃতপক্ষে সে পাতার নীচে দিয়ে দেখবে। দরজাটার কাছে আট থেকে পাঁচ বছরের তিনটে অর্ধেক পোশাক পরা বোকা বোকা হাসি হাসি মুখ দেখা গেল। সে না নড়ে চোখের পাতা খুলে, যেন পাতা খোলা থাকলেও সেটা ঘুম এমন ভাবে দেখতে থাকল। কিছু যেন বলবে বলতে সাহস হচ্ছে না, এমনভাবে তারা চলে গেল। একবার সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে এটা স্বপ্ন হলে আমার কিছু করার নেই। সে আর একবার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারি দিক দেখলে, তখন সে অনুভব করলে চৌকো চৌকো হলুদ, শাদা, ময়লা মেহগনি রঙে আঁকা একটা কিউবিস্ট ছবির মধ্যে কি করে ঢুকে পড়েছে, যে কিউবগুলো বেশ নিরেট, পিছল, হস্তগ্রাহ্য মনে হয়।

সাড়ে সাতটার সময়ে (এই সময়ের জ্ঞানটা তার নয়, সেই ঘরের দেয়ালেও ঘড়ি নেই আর যে লেদু মিঞার পার্ট করে তার হাতে সামান্য দামের ঘড়িও থাকে না, কারণ লেদু মিঞা ভূমিহীন এক বোকা কৃষিজীবী যে মাটি কেটে বেড়ায়) সে দেখলে, শুনলে। (তা হলে পাঁচটায় হরলিক্স খাওয়ার পর থেকে সে তন্দ্রার ঘোরে ছিল, মাঝখানে সেই শিশু কয়েকটিকে দেখা—যা স্বপ্নও হতে পারে)। এই দেখতে পাওয়া এবং শুনতে পাওয়ার ফলে সে তাড়াতাড়ি তার সেই দারুণ বীভৎস স্বপ্নটাকে বিদায় দিলে, যে স্বপ্নের ফলে, সে নিজেই বুঝতে পারছে, আবার সে ঘেমে উঠেছে। স্বপ্নই, নতুবা এমন হয় না কল্পনা, যে কারা দল বেঁধে তাকে চেপে ধরে তার স্কাল খুলে ব্রেনের সবটাকে বার করে নিয়ে অন্য একজনের মাথায় ট্রান্সপ্ল্যান্ট করছে, যে অন্য একজনের পরনে ছাপ-ছোপ লাগা ময়লা সবুজ লুঙ্গি আর

কাঁধের কাছে ছেঁড়া একটা ততোধিক ময়লা টেরিলিনের শার্ট।

সে দেখলে। যেন দরজা টানার শব্দেই এইমাত্র ঘুম ভাঙল, একজন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়িয়েছে, বেশ মোটাসোটা, শাড়ী সত্ত্বেও যার থলথলে বুক আর চওড়া পেট আন্দাজ করা যায়। কিন্তু মুখটা হাসি হাসি। সে এসে দাঁড়ানোর পরেই মেটে প্যাণ্ট আর শাদাটে হলুদ ম্যানিলা পরা (যা সে কোনো কালেই সহ্য করতে পারে না : এই প্যাণ্টের চাইতে জামা হালকা রঙের হওয়া) এক মোটাসোটা পুরুষ এসে দাঁড়াল তার পাশে। পুরুষটির গলায় স্টেথিস্কোপ। সে হাত দুটোকে আড়াআড়ি করে বুকের উপরে রেখে কথা বলার জন্য চিবুক এগিয়ে দিলে, কিন্তু কথা না বলে ঠোঁট চোখা চোখা করলে মাত্র।

তখন স্ত্রীলোকটি বললে, ভগবানের কি অশেষ দয়া যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে পুলিসকে পান্না সেনের নাম বলেছিলে। ভাগ্যে পুলিসকে। এই শহরে পান্না সেন কত থাকতে পারে। পুলিসের ডাক্তার। কাজেই প্রথমেই সেই কনস্টেবল আমাদের বাড়িতে ফোন করেছিল। আর ভাগ্যে অনেকদিন বাড়ির চিঠিপত্র না পেয়ে মনে উদ্বেগ ছিল। তাই মনে হলো কোনো আত্মীয় নয় তো। নিজেই রিক্সা করে স্টেশনে গেলাম। তাই কি খুঁজে পাই অত বড় স্টেশনে? শেষে সেই কনস্টেবলই নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি ময়লা চাদরে সারা গা ঢেকে এক মুসলমান চাষী শুয়ে আছে। কি চেহারা, ম্যাগো। ফিরেই আসছিলাম। কিন্তু কনস্টেবল মুখে টর্চ ফেলতেই চিনে ফেললাম। যতই রঙ পুড়ুক, যতই রোগা হও, মুখের কাটিং তো বদলায় না। আনাই কি সোজা! তুলতেই কি পারি জ্বরে অজ্ঞান রোগীকে। ওদিকে পায়েও ব্যাণ্ডেজ হাঁটু জুড়ে। তো সেই কনস্টেবলই দুজন কুলি ডেকে এনে রিক্সায় তুলতে সাহায্য করলে।

কিন্তু তার কথা আর এগোতে পারল না। পাশের ঘর থেকে গোলমাল শোনা গেল।

মা, ওমা, একবার এসো না। দাদা সব বড় রুটিগুলো নিচ্ছে।

আ হাহা। (মুখে রুটি থাকায় গলার স্বর অস্পষ্ট) আর নিজে যে চামচ চামচ জ্যাম নিচ্ছ।

মা, ওমা, এসো। (এটা তৃতীয় আর সরু কণ্ঠস্বর)

স্ত্রীলোকটি (সেই পৃথাই—আর রোগীর এখন সন্দেহ হচ্ছে পৃথা বলেই) একটু গম্ভীর স্বরে বললে, কি অসভ্য ছেলেমেয়ে সব। কিন্তু তার চোখে স্নেহের ভাবও দেখা দিল। কিন্তু রোগীর সামনে থাকা তার হল না। একেবারে সদ্যোজাত একটি বড়দের গোলমালে উৎসাহিত হয়ে কেঁদে উঠতেই সে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে

পাশের ঘরে চলে গেল। আর তখন সেই ডাক্তার এগিয়ে এল তার স্টেথিস্কোপ হাতে।

সে তো বুঝতেই পারছে এই তা হলে পুলিস হাসপাতালের ডাক্তার পান্না সেন।

বুক পরীক্ষা করলে সে। বিশেষ করে হৃদ্‌যন্ত্রটাকে। নাড়ী দেখলে ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে। তাতেও হলো না। অন্য একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রেসার মাপার যন্ত্র নিয়ে ফিরে এলে। তিন চার মিনিট ধরে প্রেসার মাপলে। ততক্ষণে সেই মোটা স্ত্রীলোকটিও আবার এল। ডাক্তার তাকে দেখেই যেন উঠে দাঁড়াল। বললে, ঠিক আছে। রাত দুটোয় তো দিয়েছিলে কোরামিন, আবার আটটায় দিও। দেখি, যদি হসপিট্যালে ডুরাবলিন পাই।

কি খাবে?

জরটাকে দেখ। বাজারে টাটকা রুই পাই আনব। মাছ সেদ্ধ দাও। নটায় একশো সিসি গ্লুকোজ দেব ভাবছি। জর কনট্রোল করতে পারলে রুটিও দু-এক স্লাইস। কেমন, এখন তো আমরা একটু ভালো বোধ করছি। (এই কথাটা রোগীর দিকে চেয়ে)

তারা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য না। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, লেদু মিঞা ভাবলে, এরাই পৃথা আর পান্না সেন। আর এটা তাদেরই বাড়ি। আর তা হলে সে সুপর্ণ কাঞ্জিলাল হয়ে যায়। সে বেশ সতর্ক হয়ে চারি দিকে তাকাল। সে এমন গভীর করে ভাবতে গেল, মনে করতে চেষ্টা করলে যে মাথার ভিতরে কপালের হাড়ের নীচে ব্যথা করে উঠল। সে কি বলেছে তার নাম সুপর্ণ, কিংবা এমনও কি বলেছে সে লেদু মিঞা। হয়তো বলে নি। একটু আশ্বস্ত বোধ করলে সে, কারণ এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, অন্তত পৃথা, যতই সে মোটা হোক, তাকে নিশ্চিত সুপর্ণ বলে চিনেছে, না হলে যে ভাবে নিয়ে এসেছে সে ভাবে আনত না। না, সে আর লেদু মিঞা থাকছে না।

আশ্চর্য কেন সে, কখন সে এই শহরের স্টেশনে নামল আর কাকেই বা বলেছে পান্না সেনের নাম। একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল সে। এই রুগ্ন অবস্থায় যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে ভাবতে চেষ্টা করলে সে। তীক্ষ্ণই তো কথাটা। তার নাকের কোড়া দুটো ফুলল। তাতে তার নাককে ধারালোই দেখাল। অবশ্য, আয়না নেই। তার কথা ভাবাই যায় না। আর তার মুখে কত ময়লা কে বলবে, ছ সাত দিন স্নান নেই। উপরন্তু সে তো এক আঁজলা মাটি তুলে চুলে, মুখে, গলায় বুলিয়ে নিয়েছিল। হ্যাঁ, তীক্ষ্ণ করে ভাবতে হবে। বোধ হয়, হ্যাঁ, তাই তো, সে আর বসে

থাকতে পারছিল না। যেমন ভিড় বাড়ছিল, ফলে চাপাচাপি, তেমন জরও বোধ হয়। দম নেয়া যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল গলা চেপে ধরেছে কেউ। তখন সে বলেছিল বটে কাউকে না কাউকে আপনারা যদি দয়া করে নামিয়ে দেন কোথাও।

কোথায় নামা হবে ?

তা ঠিক করতেই তো সময় চলে যাচ্ছিল। তার পরে তার কানে গিয়েছিল—এই তো বেশ স্বচ্ছ হচ্ছে তার মাথা—কুচাই। আর সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল সে, আমার খুব জর এসেছে। আর পা-টাও ভাঙা। এখানে যদি স্টেশনের কোনো শেডে পৌঁছে দেন। আর তার পর বোধ হয় তাকে তারা প্ল্যাটফর্মের কোনো পাকা বারান্দায় পৌঁছে দিয়েছিল। সে নিজের চিন্তার এই স্বচ্ছতায় কিংবা তীক্ষ্ণতায় কিংবা দুয়েতেই সে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে উঠল, রুগ্ন অবস্থায় যত দূর হওয়া যায়। আর সে কোনো রকমে গা ঢেকে শুয়ে পড়েছিল। বোধ হয় শুয়ে পড়ার আগে একবার তার চোখে পড়েছিল ওয়েটিং রুমের সাইনবোর্ড। তা হলে সে ওয়েটিং রুমের বারান্দাতেই শুয়ে পড়েছিল মৃত্যুর জন্য। অন্তত সে মৃত্যুতে গাড়ির দুলুনি, ভিড়ের দম-বন্ধ করা ভাব থাকবে না, শেষবারের মতো হাত পা ছড়িয়ে দেয়া যাবে। হয়তো সে জল চাইছিল। হয়তো তার বদলে সিমেন্টের ঠাণ্ডা মেঝে, তার কনকনে ভাবটা নিয়ে, হয়তো ঠাণ্ডা বাতাস, যা সে জলের বদলে গিলছিল, তা সব তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। আর এখন তো বোঝাই যাচ্ছে কোন কনস্টেবল, জি আর পির হতে পারে, স্টেশনে ডিউটি পড়েছে এমন ওয়াচারও হতে পারে, তাকে জিজ্ঞাসা করে থাকায় সে পান্না সেনের নাম করে থাকবে।

এটা কিন্তু আশ্চর্য, সে তা করলে কেন। সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের মনটাকে দেখতে চেষ্টা করলে। তা হলে তো বলতে হয় মনের মধ্যে এমন কেউ আছে যে কুচাই শব্দ শুনেই স্থির করেছিল, এখানেই নামা ভালো। তা হলে তো বলতে হয়, সে পান্না সেন আর পৃথা আছে বলেই কুচাইকে পছন্দ করেছিল। তা হলে তো বলতে হয়, নিজের অজ্ঞাতসারে সে তাদের সাহায্যে বেঁচে উঠতে চাইছিল। যদিও, সে আত্ম-সমালোচনা করলে, সে আশা করে নি স্টেশনে নামলেই পান্না সেনদের পাওয়া যাবে। সে আবার চারি দিকে চাইল, আর তার সব-কিছু অলৌকিক বোধ হতে লাগল।

কিন্তু তা নয়। সে ভাবনা থামিয়ে একটু দম নিলে। তার পর সে মনে করতে পারলে।

একেবারে ছন্নছাড়া ব্যাপার নয়। এটা যদি ডিসেম্বর হয়, তাই হবে কারণ এখানে সে মাস দুয়েক হল পড়ে আছে এমন হতে পারে না, তা হলে সেটা ছিল

জুলাই। বেশ গরম। তখন সে এদিকে, কুচাই-এ নয়, তার আগের জংশন দিয়ে আরও দূরে যাচ্ছিল।

মাঝরাত। থেমে-থাকা গাড়ির কাঁচের শার্সি দিয়ে জংশন স্টেশনটার চঞ্চলতা লক্ষ্য করছিল। কত রকমের চেহারার, পোশাকের, বয়সের, স্বাস্থ্যের বিভিন্নতা নিয়ে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, শিশু যাত্রী। এটাও কিন্তু কৌতুকের যেটা এখন রাত্রি অর্থাৎ সেই কালো রঙ-করা সময়টা, যখন তুমি চোখে কিছু দেখবে না বলেই কালো, যখন ঘুমের স্তব্ধতা ঘোষিত, তখন এই মানুষগুলো সেই কালোটাকে এখানে ওখানে ছোরা বিঁধিয়ে হলুদ, লাল, মেটে নানা রকম রক্ত বার করে তার মধ্যে ঘুরছে। আর সেই প্রকাণ্ড কালো জন্তুটার শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা যেন থর থর করে কাঁপছে। সুপর্ণ দু-হাতে চোখ ডলে ঘুম তাড়িয়ে সেই মুমূর্ষু ষাঁড়ের গরম-ভেজা নিঃশ্বাস থেকে বাঁচার জন্য জানলা খুলে দিয়ে মাথাটাকে বাইরে রাখলে। এই সময়ে প্রশেসনটা তার চোখে পড়ল। প্যাণ্টের মধ্যে হাত-কাটা হাফশার্ট গোঁজা, সেই জামা প্যাণ্টে ইস্ত্রি থেকে থাকলে তা মাস তিনেক আগে হয়ে থাকবে, চিবুকে গালে মাংস, কিন্তু রাত জাগায় চোখের কোণে কালি, গালেও দাড়ি খোঁচা খোঁচা; তার পিছনে একটি স্ত্রীলোক, কত আর বয়স হবে ত্রিশ বত্রিশ, হয়তো মোটামুটি সুন্দরী ছিল, এখন লেপটানো ময়লা-ধরা শাড়ী, থলথলে বুক, এক কোলে শিশু অন্য হাতে একটা বড় ভ্যানিটি ব্যাগ। পেটটি এত বড় যে তা কাপড়ে ঢাকা পড়ে না, আর নিতম্বদেশ···তাদের পিছনে সাড়ে তিন ফুট থেকে আড়াই ফুট তিনটি বালক-বালিকার একটা শোভাযাত্রা। পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অর্থ ব্যয় করেছে, যেমন সকলের পায়েই এই গরমে জুতো মোজা, যেমন প্রথম তিন ফুটে ছেলেটির গায়ে ওটা হয়তো মেরুন সার্কস্কিন, তার পরের মেয়েটির মাথায় সুন্দর রিবন যদিও তা ঠিক জায়গা থেকে সরে গিয়েছে, কিন্তু দীর্ঘ ট্রেন-যাত্রার ফলেই সে-সব পোশাক ইস্ত্রিবিহীন, কোঁচকানো, ময়লা। ছেলেটির হাতে একটি ঢাকনা দেয়া বেতের চাঙারি যা সে টানতে গিয়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে। তার পরের মেয়েটির হাতেও এক দিকে রেক্সিন উঠে গিয়েছে এমন সুটকেস; আর সকলের মুখে-চোখে, পোশাকে, কাঁধে, রাত জাগার, গরমের, ট্রেন থেকে নামার ধাক্কাধাক্কি, নতুন গাড়িতে উঠতে না পারার উদ্বেগ, আশঙ্কা এমন চাপ দিচ্ছে যে, তারা সোজা হয়ে চলতেও পারছে না। স্টেশনেও তো ভিড়। বিশেষ করে ঝুড়ি, কোদাল, টিনের সুটকেশ, কাপড়ের পুঁটলি অন্তত পঞ্চাশ জনের একটা মলিন ঘর্মাক্ত স্রোত এসে পড়ল। স্ত্রীলোকটি ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, কয়েক পা পিছনে গিয়ে আড়াই ফুটের সেই ছোট ছেলেটি যে তাদের প্রসেশনের শেষে

তার হাত চেপে ধরলে। কিন্তু ঝুড়ি কোদাল লুঙ্গি কাপড়ের পুঁটলির সে গড্ডালিকা স্রোত এত প্রবল এত গতিশীল এত দৃষ্টিহীন যে স্ত্রীলোক এবং তার ছোট সরু ক্ষীণ প্রসেশনটি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তা অবশ্য হলো না। কি করে তারা ছিটকে সেই স্রোতের বাইরে পড়ে গেল। প্রসেশনটি একটু ছড়িয়ে গিয়ে প্রায় ছিঁড়ে যাবে এমন সরু হয়ে আত্মরক্ষার জন্ম বাঁক নিয়ে থেমে থাকা গাড়িটা ঘেঁষে চলতে লাগল। আশ্চর্য! তুমি কি ভেবে ভেবে স্থির করতে পার এই প্রবল স্রোত আর এই ক্ষীণ প্রসেশনের মধ্যে কোনটা মূল্যবান? কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যটা বদলে গেল। স্ত্রীলোকটি এক দারুণ উদ্বেগে এই যে 'শুনছ, শুনছ' বললে কয়েকবার, বড় ছেলেটিকে বললে, তোর বাবাকে ডাক তো; ছেলেটি আর্তকণ্ঠে বাবা বাবা করে চিৎকার করলে, পুরুষটি আশঙ্কায় অ্যা কোলি, অ্যা কোলি বলে চেঁচাল। কি যেন হয়েছে, কি যেন ঘটবে। হ্যাঁ, আশঙ্কায় জানলা দিয়ে আরও একটু গলা বার করে দিয়ে সেও এদিক-ওদিক দেখছিল। তখন দেখলে সে তার জানলার সোজাসুজি সবুজ রঙ কালো হয়ে গিয়েছে এমন একটা কাঠের বেঞ্চ, যা সব স্টেশনেই থাকে অল্পবিস্তর, তা পেয়ে সেই পারিবারিক প্রসেশনটি সেটাকে দখল করলে। কুলিরা হারায় নি। মোটঘাট, বাক্স, স্যুটকেস, হোল্ডঅল স্তূপাকার করে সামনে জমা হলো। কুলিরা কি আপত্তি করছিল। পুরুষটি যাও, যাও, বকশিস মিলেগা বলে তাদের বিদায় দিলে। আর কি আশ্চর্য তাদের রাত্রি জাগার কালিতে মাখা মাখা, ক্লান্তির ঘামে-ভেজা মুখে আলো ঝলমল করে উঠল। কিন্তু ওর মধ্যেই সেই শিশু-গুলো খেতে চাইছে, পুরুষটি সিগারেট ধরালে। কোলেরটি ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কান্না জুড়লে, আড়াই ফুটেরটি আমি বসতে পারছি না বলে সোরগোল তুললে। এক কথায় যাকে মধ্যবিত্ত বলে। অর্থাৎ মস্তিষ্কহীন পেতি বুর্জুয়া।

কিন্তু অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। স্ত্রীলোকটি কয়েকবার চোরা চোরা চোখে জানলাটাকে লক্ষ্য করলে। একবার দেখে, একবার চোখ সরায়! উঠে দাঁড়াল। পুরুষটিকে বললে, ধরো তো একটু, বলে কোলেরটিকে পুরুষটির কোলে দিলে। নিজের শাড়ীটাকে টেনেটুনে ঠিক করলে। থেমে-থাকা গাড়ির জানলাটার দিকে এগিয়ে এল। কয়েক পা এগিয়ে বললে, শুনছ, দেখ, ওগো, দেখে যাও। পুরুষটি উঠল। কোলের ছেলেটিকে বড় ছেলেটির কোলে দিয়ে স্ত্রীলোকটির কাছে এল। তখন দুজনেই একসঙ্গে এগোল। আর তখন লক্ষ্য করা গেল মোটা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুখটায় এখনও চাপা-পড়া মিষ্টি ভাব আছে। ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হারটা মোটা এবং সোনার। কানের ছোট পাথর দুটিও উজ্জ্বল। স্ত্রীলোকটি বললে, তখন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। সেই নরুণ দিয়ে কেটে বানানো নাক, তেমন চোখ,

এ কখনও স্থপর্ণ না হয়ে যায় ?

তখন পৃথা আর পান্না সেন গাড়ির বাইরে প্ল্যাটফর্মে, আর স্থপর্ণ গাড়ির ভিতরে জানলা দিয়ে মুখ বার করে। তখন জানা গিয়েছিল বদলির ফলে পান্না সেন, সার্জন তো, কুচাই-এর পুলিশ হসপিট্যালে বদলি হয়েছে। পৃথা স্থপর্ণকে বলিয়ে নিয়েছিল যে যাওয়া আসার পথে কয়েক দিনের জন্য সে পান্না সেনের গেস্ট হবে।

আশ্চর্য নয় ?

সে তো নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তা হলেও আট দশ বছর বাদে হলেও, সেদিন যেমন, অসুস্থ রুগ্ন কাদা লাগানো দাড়ি-ঢাকা মুখ দেখেও এবারও যদি পৃথা চিনতে পেরে থাকে, তা হলে এটা বোঝা যাচ্ছে সব কিছু হারায় নি। তার মুখটা উজ্জ্বল হলো। নরুণ দিয়ে খুদে বার করা নাক। হ্যাঁ, এ কথা সে আরও শুনেছে। পিতলের মূর্তিতে পিতল ছিলে ছিলে যে তীক্ষ্ণ ধারালো ভাবটা আনা হয়। আসলে সেটা নয়, মনই আসল। এমন-কি এই যে তার নাম স্থপর্ণ। আগে তো নাম ছিল প্রাণেশ। হ্যাঁ, সে নিজেই সে নামটাকেই উল্টেপাল্টে স্থপর্ণ করেছিল। মনে হয় না ধারালো? স্থপর্ণ! এই স্থপর্ণ নামই কিন্তু কফি হাউসে চলেছিল। সে পর পর কয়েকটা কফি হাউসের ছবি দেখতে পেলে যেন। কিন্তু দুঃখ হয় না ভাবলে? এক সময়ে কিন্তু কফি হাউসের সেই-সব আড্ডায় এই পৃথা আর পান্না সেন তার সঙ্গী ছিল। ধরা পড়ে যায়। মানে পেতি বুর্জুয়া ভাবটা। নতুবা বি. এস-সি পড়তে পড়তে হঠাৎ পান্না কেন ডাক্তারি পড়তে যাবে! নিশ্চিত নিশ্চিত একটা প্রফেশন খুঁজে নেয়াই কি উদ্দেশ্য নয়? অর্থাৎ পূর্বপুরুষরা যেমন একটা বয়স হলেই টাকা রোজগার, স্ত্রী, পুত্র কন্যার কথা ভাবে। সমাজ যে কোন চুলোয় যাচ্ছে, তা বাস করার মতো আছে কি না তা বুঝতেও পারে না। তখন যে প্রেমের সময় নেই, বদলানোর সময়, ভাঙার সময় তাও বোঝে না। সে নিজেকে বললে, দেখ, হাতের কাছে কেমন উদাহরণ। না, না, এই ধারালো ভাবটাকে তাকে রাখতেই হবে। দেখ, সেই প্রেমের পরিণতি, সেই পৃথার আর পান্নার।

সাড়ে আটের কিছু পরে (সে নিজে অবশ্যই বুঝতে পারছে না কতক্ষণ লাগছে এই কথাগুলো ভেবে উঠতে) সে যখন ভাবছে সে পৃথার কাছে আয়না চাইবে কি না নিজের মুখটা দেখে নিতে, সে শুনতে পেলে : আর এবার যেন অন্য দিকে, দরজাটার ওপারে নয়, বরং বাঁ দিকের, (ও, এদিকে একটা জানলা আছে) জানলাটার ওপারে। সে সতর্ক আর উৎকর্ণ হলো। তা হলে ওদিকে একটা ঘর আছে। হয়তো ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে রোগী দেখার ঘর। সে কান পেতে

রইল। বাঃ, তার উপরে একটা মহান দায়িত্ব আছে না ? চারি দিকে দৃষ্টি রেখে সেরে উঠেই পালাতে হবে। কে আছে আর সে ছাড়া, যখন দলের মধ্যেই দ্বিধা, ফাটল, এমন-কি শেষ পর্যন্ত ব্রজেশ্বর…

আমি কিন্তু রান্নাঘরের গোলমালে আটটায় কোরামিন দিতে ভুলে গিয়েছি। (পৃথার গলা তা তো বোঝাই যাচ্ছে)

তা হলে এখন দিয়ে দাও। (পান্না ডাক্তারের গলা)

কিন্তু ন-টায় তো হরলিক্স খাওয়াব।

তার পাঁচ মিনিট পরে দিলেই হবে। আমি ভাবছি কি অতক্ষণ ধরে গ্লুকোজ পুশ না করে যদি গ্লুকোস্যালাইনের ড্রিপ দেয়া যায় ? খাটের ছাত্রি থেকে ঝুলিয়ে দিলে হবে। তুমি একটু দেখতে পারবে না মাঝে মাঝে ?

তা পারব, যদি কঠিন না হয়।

কঠিন নয়। দেখতে হবে ফ্লোটা চলছে কি না। মানে, হঠাৎ যদি অপারেশনের কেস এসে যায় অতক্ষণ ধরে গ্লুকোজ পুশ করার সময় পাব না। দশটা সাড়ে দশটায় এক ফাঁকে আসব। তখন ইন্‌জেক্‌শন দেব, ড্রিপও ঝুলিয়ে দেব।

তা হলে তাই ভালো।

ভালো তো বলছ। টিউব সমেত ড্রিপের বোতল হসপিট্যালের বাইরে আনায় ঝুঁকি নেই ? চটের থলেটা বরং দাও।

আধ মিনিট নীরবতার পরে গলা আরও নামিয়ে (পৃথারই গলা) বললে, শোন। তুমি যাওয়ার আগে বেড়প্যানের ব্যবস্থা করে গেলে হতো না ? একটু নাহয় দেরি হবে। উঠতে তো পারবে না।

ওঁর কোনো কোয়েশ্চেনই নেই।

তা হলে ?

দেখ, তুমি তো জানো।. .দেখ. ওটা আমার উইকনেস একটা—মানে একজন পুরুষের ওই-সব ব্যক্তিগত ব্যাপার ; আমার যেন মনে হয় তার আত্মাকে—মানে মোষ্ট আ্যানাউমোস্থাটিক। তুমি তো মা হয়ে…

সে কি কানে আঙুল দেবে ? কি গ্রস্, কি স্থূল। যা ভেবেছিল তাই প্রমাণ হচ্ছে, স্থূল বুদ্ধির পেটি বুর্জুয়া ছাড়া এরকম হয় ? এবং তাতেই প্রমাণ হয় মানুষে মানুষে কত প্রভেদ। একই সঙ্গে কফি হাউসের বড় বড় গল্প… সে নিজেকে সম্বোধন করে বললে, সুপর্ণ, এটা ভালোই হয়েছিল যে আট দশ বছর আগে পান্না সেন আর তার মাস খানেকের মধ্যেই পৃথা কফি হাউস ছেড়েছিল।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তা হলে কি তার ডিহাই-

ড্রেশন কমে গিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মন নেয়ার চেষ্টা করলে। ভাবলে : দেখ, সুপর্ণ, এটা কিন্তু একটা সুযোগ, সুযোগই তো, নইলে পথেঘাটে চলতে লোকজনের মধ্যে কি নিজেকে সম্বোধন করা যায় ? একটা সুযোগ যখন তোমার শরীর সম্পূর্ণ অক্ষম আর তোমার বোধ-বুদ্ধি সম্পূর্ণ জাগ্রত, তীক্ষ্ণ, অতীত আর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। ব্রজেশ্বরও যেখানে ভুল করেছে সেখানে তুমি, প্রায় এক-মাত্র তুমি, সমস্ত মুভমেণ্টটাকে গতি দিতে বেঁচে আছ।

এমন-কি সে হাসল। এটা একটা কৌশল মনে কর যে বর্তমানে এই স্থূলবুদ্ধির লোকগুলোর সাহায্য নিতে হচ্ছে।

কিন্তু···সে অন্য দিকে মন রাখতে পারছে না।

হঠাৎ লজ্জায় সে আর্তনাদ করে উঠল। যার ফলে পৃথা ছুটে এল।

আমাকে একটু বাথরুমে নিয়ে যাবে, পৃথা ? কি লজ্জা যে তোমার সাহায্য চাইছি। অথচ আমি পুরুষ।

না, না সে আর কি ? কিন্তু কি করে তা হবে ? ডাক্তার তোমাকে নড়াতে নিষেধ করেছে। কাল রিকশা করে আনাই রিস্কি হয়েছিল। প্যান ? বটল ? কাঁদছ কেন ?

পৃথা বটল আনলে। নার্সদের মতোই পায়ের দিকের কম্বল তুলে বটল ঠিক করে ধরলে।

দু মিনিট পরে কম্বল নামিয়ে বটল নিয়ে সে চলে গেল। তখনই ফিরে এল। তোয়ালে দিয়ে সুপর্ণর চোখ, ঘেমে ওঠা কপাল মুছিয়ে দিলে। হেসে বললে, এবার হরলিক্স খাবে কিন্তু। নটা প্রায় বাজে। আনছি।

একটা উদ্বেগের চড়াই পার হয়ে নেতিয়ে পড়েছিল সুপর্ণ। কিন্তু দু এক মিনিটেই সে হাসল। নিজেকে বললে, মানে তোমার মধ্যে সেন্টিমেণ্ট আছে তা হলে। একটু দম নিয়ে সে নিজেকে শোনালে, বেশ তো সাহায্য নিচ্ছ। তা হলেও এদের শ্রেণী-চরিত্রকে লক্ষ্য করবে না ? খুব সাবধানে আর সতর্কভাবে সাহায্য নিতে থাক। উপায় হলেই যেমন এসেছ তেমন চলে যাবে। মনে কর, সুপর্ণ, তোমার আট বছরের সঙ্গী, অনেক যুদ্ধের দোসর ব্রজেশ্বরকে। তখন তো তোমার হাত কাঁপে নি। তীক্ষ্ণ হও, বাহ্‌, তোমাকে তীক্ষ্ণ হতে হবে না ? এখনই হরলিক্স করে আনবে পৃথা, বাহ্‌, নিশ্চয়ই খাবে। তোমার পালানোর শক্তি দরকার।

পৃথা হরলিক্স করে আনলে। পাশে বসে ফিডিং কাপে হরলিক্স খাওয়ালে। আবার তোয়ালেতে মুখ মুছে দিলে। হাসল। তার চোখ যেন ছল ছল করল। বললে, একটু লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে থাক, সুপর্ণ। ভাতটা নামিয়ে এসে কোরামিন দেব।

অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে তোমার চোখ। তুমি দেখ বিকেল নাগাদ ভালো লাগবে। গল্প করতে পারবে। সে ভাত নামাতে চলে গেল।

এটা কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয়, সুপর্ণ ভাবলে, যে সে কনস্টেবলকে বলেছিল পান্না সেনের কথা। নিশ্চয়ই আর কিছু বলে নি। যখন ওই পান্না সেন শব্দ দুটোর সূত্রেই সে এখানে তখন নিশ্চয়ই বলেছিল। তখন আর কিছু বলার মতো অবস্থা ছিল না এমন মনে পড়ছে। তখন তো এমন একটা জায়গা চাচ্ছিল যেখানে সে শুতে পারে। কিন্তু কেন কুচাই শুনেই সে মনস্থির করলে এখানেই নামতে হবে, আর কেনই বা পান্না সেনের নাম করলে? তা হলে কি আট দশ বছর আগেকার সেই প্রীতির স্মৃতি? বুদ্ধি যেখানে পরিত্যাগ করেছে তখনও সেই স্মৃতি থাকে? বুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিল বৈকি পান্না সেনকে : সেই গাড়ির জানলায় দেখা হওয়ার কথাই ভাব। তার গেস্ট হওয়ার কথায় সে হাঁ বলেছিল বটে, কিন্তু গাড়ি ছাড়তেই, তারটাই আগে, সে হো হো করে এমন হেসেছিল যে পাছে সহযাত্রীরা কিছু ভাবে সেজন্য খবরের কাগজে মুখ আড়াল করেছিল। অথচ···

সে শুনতে পেলে পাশের ঘরে দরজার ওপারে কথা হচ্ছে :

মা, দাদাটা কি বোকা, বলছে ও ঘরে যিনি তিনি আমাদের মামা হন না। (একটা ছোট মেয়ের গলা)

কে বললে হয় না। (বোঝাই যাচ্ছে পৃথার গলা)

কেন, বাবা যে বললে কাকা হয়, রাঙা কাকা। (একটা ছোট ছেলের গলা।)

তাই? (এটাও পৃথার গলা। সে ভাবছে যেন) তা হলে তাই বলবে। আসলে আমাদের দুজনের সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে। তোমার বাবার সঙ্গে সম্বন্ধটা একটু কাছের। একটা কথা বলে রাখি। ঝি-টি কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে পক্স, বসন্ত। খুব ছোঁয়াচে রোগ। তোমরা ও ঘরে যেয়ো না।

তা হলে? সুপর্ণ স্থির করলে ভালো করে বিশ্লেষণ করা দরকার এ বিষয়টাকে। তা হলে? হঠাৎ যেন নতুন দিকটাকে দেখতে পেলে সে। হতে পারে গ্রস্, তা হলেও হসপিট্যালের সার্জনের স্ত্রী, সে যদি নোংরা চেহারার নোংরা লুঙ্গি-পরা একজনকে দেখা মাত্র বিচলিত হয়ে কুলির সাহায্যে প্ল্যাটফর্ম থেকে কুড়িয়ে রিকশায় জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে তবে তা আলোচনার বিষয় হয় না? সেই কনস্টেবল যে পৃথাকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে কি আর গল্প করছে না? আর এদিকেও এরা দেখ মিথ্যা বলতে শেখাচ্ছে। তা হলে এরা কি আন্দাজ করেছে? সব না হলে, অনেকটা? সে নিজের বোকামিতে অবাক হলো এবার? তা হলে কি তার উরুর ঘা-টাও চোখে পড়েছে? শান্ত হয়ে হতাশ হয়ে সুপর্ণ নিজেকে বললে। তা

হবে। লুঙ্গি বদলেছে। হাত দুটোতে সাবান দিয়েছে। হয়তো গরম জলে মুখও মুছিয়ে দিয়ে থাকবে। আর এখন এইমাত্র দিনের আলোতে ? তার পরেও কি সেই আনাড়ি ব্যাণ্ডেজ চোখে না পড়ে পারে ? ডাক্তার তো। ব্যাণ্ডেজ বদলেছে না কি ?

কিন্তু পৃথা এল। বললে, কষ্ট দেব আবার। কোরামিন এটা। খুব তেতো। কিন্তু দরকারি। ওষুধ খাইয়ে বললে, আবার একটু চুপ করে থাক। ডাক্তার এসে যাবে এখনই। আমি তোমার মাছ সেদ্ধটা বসিয়ে আসি।

কিন্তু, পৃথা চলে গেলে সুপর্ণ ভাবলে, সে কি একটা ফাঁদে পড়েছে ? কথাটা মনে হতেই চঞ্চল হলো মন। আর তার ফলে পালানোর ইচ্ছা জাগতেই সে পা গুটিয়ে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল। তা হলে পায়ে কিছু করেছে নাকি ? সে হতাশ হয়ে বুকের উপরে হাত রাখলে।······

সে দেখলে তার ডান হাতটা ছড়ানো আর হসপিট্যালে যেমন দেখা যায় তেমন একটা বোতল শূন্য থেকে ঝুলছে। আর তার থেকে একটা সরু লাল নল তার বিছানা পর্যন্ত। আর একটু ভালো করে চোখ চেয়ে দেখতে হবে। শূন্যে নয় উল্টে রাখা বোতলটা খাটের ছত্রিতে বাঁধা। ওহো, গ্লুকোস্যালাইন। ড্রিপ, ড্রিপ···

আসলে কোথাও একটা ভুল থেকে গিয়েছে। এ রকম হয়, খুব ভালো কাজেও ভুল থেকে যায়। আর তখন একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মসমালোচনা। ভুল স্বীকার করা আর আত্মসমালোচনা একই সঙ্গে চলতে হবে।

কাচ না পর্সেলেন ? মোট কথা চার দিকেই তো হলদেটে শাদা কিউব। এই সরলতম জ্যামিতিব গড়নটাই তার প্রিয়। এটার সব চাইতে এই এক বড় গুণ যে নিরেট শক্ত হলেও অনায়াসে অনুভব করতে পারে তাদের, যাকে দেয়াল সিলিং মেঝে ইত্যাদি মনে হয়, তাদের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছতা, বোধগম্যতা যাওয়া আসা করে।

ভুল হতেই পারে, ভুল মানুষ মাত্র করে।···অথচ ব্রজেশ্বর কি না বলছে : ভুল, কিসের ভুল ? এত মৃত্যু সে-সব কি ভুল ? আমি কি ক্রিশ্চান ? তাদের সংস্কৃতি আমার ? যে ভুল স্বীকার করে কনফেস করলে অনুতপ্ত হলে নতুন হয়ে উঠবে। ভুল স্বীকার তো করছেই না। বরং যেন ভুল স্বীকার না করাকেই পৌরুষ মনে করছে।

তাই বলে আমরা শিভ্যালরির নাইটও নই যে আমাদের তেমন করে সাজতে হবে, দলকে দল শহিদ হতে হবে। এই কি তোমার শেষ কথা ?

হ্যাঁ। আমি আজ সকালে শেভ করেছি, সাবান দিয়ে স্নান করেছি। যেমন

পোশাকে অভ্যস্ত তা পরেছি। মুখে দাড়ি রেখে লুঙ্গি পরে অন্য কেউ হওয়ার চেষ্টা করছি না।

এখন হয় কি, অনেক সময়ে মানুষ না দেখেও না শুনেও কিছু অনুভব করে। বোঝা যাচ্ছে সেই আমবাগানটার, যাকে বনই বলা যায় এত ঝোপ-ঝাড়, দূরে দূরে ছায়ায় ছায়ায় গাছের আড়ালে আড়ালে মানুষ। সুপর্ণ অনুভব করতে পারছে তারা কান পেতে সেই দুই দলপতির তর্ক শুনছে। এ তো বোঝাই যাচ্ছে ব্রজেশ্বর গলা তুলে কথা বলছে তাদের শুনিয়ে। অর্থাৎ সে আন্দোলনটাকে, ফলে দলকেও, নিজের পথে নিয়ে যেতে চায়।

সুতরাং···

কিন্তু ব্রজেশ্বরও তৈরি হয়ে এসেছিল। সুপর্ণ লম্বা টানা কাতরোক্তি করলে। যন্ত্রণায় মুখ ফিরিয়ে কম্বলের উপর দিয়ে তার পায়ের দিকে চাইল।

তাতেই প্রমাণ হয়, দেখো, ব্রজেশ্বর ভুল না-করার ভুল থিয়োরি দিয়ে দলকে মহাত্মা গান্ধি, রাবণ, কর্ণ এ সব করার চেষ্টায় ছিল। নতুবা পর পর তিনটি গুলি খেয়েও পড়ে যেতে যেতেও সে পাবে তেমন করে ফেরত দিতে। ভাগ্যে সে তখন প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, তাই তার সেই গুলিটা উরু ভেদ করলে। আর তখনই, দেখো, এ পাশে, ও পাশে, দূরে, কাছে বাঁশিগুলো বাজতে শুরু করলে।

সুপর্ণ হাসতে গেল। কিন্তু তখনই সে নিজের ভুল সংশোধন করলে। ইমমেটেরিয়াল। ওটা ব্রজেশ্বরের ফাঁদ নাও হতে পারে। আসল পয়েন্ট হচ্ছে, কি করে যখন বুদ্ধি ঘুমিয়ে পড়ছে তখন তার তলা থেকে, অনেক তলা থেকে, অন্য এক বুদ্ধি মনের ভার নেয়। এক সেকেণ্ডের ব্যাপার, না হয় দুই সেকেণ্ড। সে নিজে তো একটু দাঁড়িয়ে ছিলই—এটা নিশ্চিত করতে যে ব্রজেশ্বর কোনো নাম বলার বাইরে চলে গিয়েছে—আর তখন যখন ব্রজেশ্বরের ছড়ানো হাতের আঙুলগুলো কুঁকড়ে আসছে। নাক আর কষ দিয়ে মোটা ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে—সে বললে, কোরামিন। একি হাস্যকর? ব্রজেশ্বর অবশ্যই, ডাক্তারির থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল এক সময়ে, আর তা হয়তো এই পান্নার সঙ্গেই। ওটা হয়তো একটা এমন ব্যাপার যে যে-ডাক্তারিকে সে অস্বীকার করেছে তাই তার বুদ্ধির তলায় তলায় ছিল, আর সেই হতাশার সময়ে ওই শেষ প্রেসক্রিপশন। আশ্চর্য! সে কি বুঝতে পারছিল তার হার্ট থেমে আসছে?

সেটা মেটেরিয়াল নয়। অর্থাৎ, তা হলে তার নিজের মনের তলায় কিছু ছিল যা, যখন সেই প্রবল জ্বরে, আর এখন তো বোঝা যাচ্ছে অ্যাকিউট ডিহাইড্রেশনও, সে জ্ঞান হারাচ্ছিল তখন কুচাই এর নাম, পান্না সেনের নাম মনে করিয়ে দিয়েছিল।

সে অত তাড়াতাড়ি ভেবে কি করবে? পায়ের দিকে একটা মৃদু লালচে বালব যেন জ্বলছে। এটা তো এতক্ষণ দেখে নি সে। অফুরন্ত সময় এখন ভাবার। ঘড়ি নেই যে বলবে এই একরঙা কিউবগুলোর মধ্যে সময় এগোচ্ছে, হয়তো থর থর করে, হয়তো মুখ আটকানো পাত্রে রাখা তরলের মতো নড়াচড়া করে, কিন্তু কোনো দিকে যায় না। মাথায় একটা অসুবিধা বটে, কিন্তু আপাতত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, কারণ পান্না আর পৃথা তাদের চওড়া চওড়া শরীর দিয়ে বেশ আড়াল করেছে। এই দেখো, কোন দিকে? দেখা যায় না, আবার বলছে ওরা :

পৃথা বললে, অপারেশন। অপারেশন? কিন্তু তা কি করে?

পান্না বললে, খুব দেরি করে ফেলেছে, অন্তত সাতদিন তো বটেই। তুমি কি মনে কর ব্যাণ্ডেজ বদলাতে গিয়েই বুঝি নি? এটা তো এক সংগ্রাম। শরীরে রক্ত নেই যে অপারেশন সহ্য হয়, অপারেশন ছাড়াও—

ইন্‌জেক্‌শানে?

মনে হয় না। গ্যাস গ্যাংগ্রিনের মতো দেখাচ্ছিল।

এখন তা হলে?

অ্যান্টিবায়োটিকে যতটা কন্‌ট্রোল করা যায়—সেই সুযোগে যদি কয়েক বোতল গ্লুকোজ দিয়ে দেয়া যায়।

অপারেশন তা হলে বাড়িতেই···

দেখি, দেখি। কিন্তু অসম্ভব বোধ হচ্ছে। জল গরম হলো? ব্যাণ্ডেজটা তো বদলে দিই।

অপারেশনটা বাড়িতে করলে হয় না?

অ্যানাস্‌থেটিস্ট কে হবে? আর তা ছাড়া পাঁচ-সাত বোতল রক্ত লাগতে পারে। তার আগে এক্সরে করাও চাই।

তখনই হসপিট্যালে দিলে ভালো হতো।

সন্দেহ তো হচ্ছেই—যদি হাড় ফেটে থাকে সে এক মেজর অপারেশন, অ্যাম্পুটেশন।

কি বললে?

দেখা যাক, দেখা যাক।

দেখ, পৃথা বললে, আমি কিন্তু এ-সব বুঝি নি; কিন্তু কি এক মহৎ-প্রাণ, একজন কালচার্ড মানুষ। ··আমি কিন্তু কিছু ভেবে···

রিল্যাক্স। রিল্যাক্স। একেই র‍্যাশনালাইজেশন বলে। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে তার পরে যুক্তি দিয়ে কাজটাকে সমর্থন করি আমরা সকলেই। দেখ, জলটা

ফুটেছে বোধ হয়।

আমাকে থাকতে হবে?

বাহ্, একটু হেলপ করবে না? ড্রিপটা বন্ধ করে দেবে। এটা ওটা এগিয়ে দেবে...

কোরামিন দিয়ে নেবে না?

ইন্‌জেকশানের সময়ে অন্য দিয়ে নিয়েছি সে রকম ওষুধ।

পৃথা, দেখো, মুখের ঘামটা মুছিয়ে দিয়ে আবার হরলিক্‌স খাওয়ালে। ঘরটাকে আবার অন্ধকার বোধ হচ্ছে। তা হলে এখন কি রাত্রি?

ওটা মেটেরিয়াল নয়। আসলে সেটা মাথার মধ্যে একটা জ্বালা। হয়তো জ্বর, খুব জ্বর, একশো পাঁচ, ছয়, সাত। আর সেই জ্বালাটাই বেশ স্বচ্ছ করে সব কিছু দেখায় যেন। অথচ ঘোরটাও থাকে। ফলে স্বপ্নের মতো ব্যাপার, জেগে জেগেও অনুভব কর। সুপর্ণ নিজের মনটাকে ছড়িয়ে যেতে দিলে। এখানে কেন এল সে, তার হেতুটা বার করাই আসল বিষয়। হ্যাঁ, তার পরে কালভার্টের কাছে ট্রেন থামলে সে দেখতে পেয়েছিল অনেক মাটিকাটার মানুষ ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে উঠছে গাড়িটায়। সেও এর ওর সাহায্য নিয়ে গাড়িটায় উঠে পড়েছিল। তার আগে সে হয়তো জলে পা ধুয়েছে, লুঙ্গি ধুয়েছে, ভিজে গায়ে মাটিতে গড়িয়েছে, হয়তো সঙ্গে যে কয়েকটা বড়ি ছিল তা খেয়ে নিয়েছে। রুমাল আর পকেটে যে ব্যাণ্ডেজ থাকত তা দিয়ে বেঁধেছে। মোট কথা তখন সে মাটিকাটা মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পেরেছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসার সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কন্‌ট্রাক্টরদের কুলির দলে—সেই ছিন্নমূল হৃতসর্বস্ব মানুষদের ভাবভঙ্গি, ভাষা তো ভাষা তো খানিকটা আগেই জানা ছিল, সে হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করছিল। আর কি আশ্চর্য, যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে, তাদের সেই নোংরা মানুষের নোংরা কামরায় কিছু কিছু যাত্রী ওঠানামা করছিল বটে, কিন্তু যারা উঠছিল আরও নোংরা হৃত-সর্বস্ব বোকা বোকা ভেড়া ভেড়া ভীরু ভীরু চেহারার মানুষ। তাদের মতোই শালপাতায় ভিজে মটর, ভাজা ছোলা, আর সারাদিনে দু-এক ভাঁড় চা খেয়ে যন্ত্রণা, দুর্দশা, ক্ষুধা সহ্য করতে করতে সুখী হয়ে উঠছিল সে। যেন নিজের দেশে ফিরেছে মনে করছিল। যেন ভাই, বন্ধু, আত্মীয় পেয়েছে এতদিনে মনে করে যন্ত্রণা ইত্যাদি ভুলে যাচ্ছিল। তার পরে হয়তো দ্বিতীয় দিনে, ধৈর্য ধরতেই তো হবে কারণ সেই গাড়ি তো এক্সপ্রেস, কিংবা মেইল নয়, তাদের মতো মানুষের জন্যই যারা ময়লা, নীরব, নিরুপায়, জ্বর এসেছিল। ভিড়ের ধাক্কায় বেঞ্চের কোণে গিয়ে পড়েছিল সে।

সে অসুস্থ বলে কোনো সুবিধা কি পেতে পারে।···আর তখন তার মনে হলো, মনে হওয়া কেন, চোখেই দেখতে পাচ্ছে, তার মস্তিষ্কটাকে কেটে বার করে নিয়ে সামনের ওই চোয়াল-আলগা, হাঁ-করা, বোঁচা নাকের ওই ভোঁতা ছোকরার মধ্যে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। চকচকে অদ্ভুত চেহারার সব ধারালো অস্ত্র। সুপর্ণ বললে, আমি সুপর্ণ, আমি সুপর্ণ, ডাক্তার ডোণ্ট বি সিলি। তুমি কি জানো না ওর শরীর আমার ব্রেনকে রিজেক্ট করবে, আমার ব্রেনও ও শরীরকে রিজেক্ট করবে? ব্রেন বোঝ ডাক্তার? যেখানে বুদ্ধি, সংস্কৃতি, লেখাপড়া, অনুভব, আবেগ! সুপর্ণর ব্রেন কখনও বা লেদু মিঞার সঙ্গে এক হয়? আই সে, স্টপ্ ইট।

সুপর্ণ অনুভব করলে ডাক্তার তার হাত-পা বেঁধে ফেলেছে আগেই। নড়তে পারছে না সে। ডাক্তারের ছুরিটা কপালের কাছে এসেছে। সেখান থেকে চামড়া তুলতে আরম্ভ করবে। বাঁ-হাতটার বাঁধন তবু একটু আলগা, আর্তনাদ করে বাঁ হাত তুলে সে কপালে রাখলে।

শব্দ শুনে পৃথা দৌড়ে খাটের পাশে এল। সে দেখলে সুপর্ণর বাঁ-হাত কপালে। ঠোঁট কাঁপছে। ঘুমাচ্ছেই তো। স্বপ্ন দেখছে বোধ হয়। হ্যাঁ, স্বপ্ন মানুষের কখনও শেষ হয় না। সে সুপর্ণর বাঁ-হাত ধরে কপাল থেকে পাশের বালিশে নামালে। টেম্পারেচর একটু বেড়েছে। মাথাটাকে একটু ডান দিকে কাত করে দিলে।

পৃথা ফিরে গিয়ে পান্নাকে বললে, স্বপ্ন দেখছিল বোধ হয়। টেম্পারেচর একটু বেড়েছে। ক্রোচিন দেব আবার? ও কি খেলে না?

খেলাম তো। ওটুকু ঢেকে রেখে দাও। ওই মাছের টুকরোটা কাল তোমার ঝি পেলে সুখী হবে। যেন এঁটো না বোঝে।

পৃথা বাটিটাকে একটা প্লেট দিয়ে ঢাকা দিলে। বললে, রোসো, তা হলে ক্রোচিনটা দিয়ে আসি। তুমি কিন্তু শোওয়ার আগে আর একবার দেখবে।

শুয়োর। শুয়োর।

সুপর্ণর ঘুম ভাঙিয়ে ক্রোচিন খাওয়ালে পৃথা। তখনও কিন্তু, সে দেখলে, সুপর্ণর চোখের কোল ভিজে ভিজে। কি হবে ঘুমের আবেশ কাটিয়ে? কি কষ্ট। সুপর্ণ একবার চোখ মেললে। ঘরের চারি দিকে চেয়ে দেখে যেন নিশ্চিন্ত হলো। চোখ বন্ধ করলে।

পৃথা ফিরে গেল। পান্না মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলের কাছে বসে সিগারেট ধরিয়েছে।

পৃথা বললে, সারাদিন এত ধকল, দেখ তো এত রাত করে ফিরলে, খেতেও পারলে না। কাজ ছিল বুঝি হসপিট্যালে?

পুরুষ কি শুধু হসপিট্যালেই…

তা বাপু যে রকম সব নার্স রাখছ। আগে পুলিস হসপিট্যালে ওসব ঝামেলা ছিল না। কিন্তু সিরিয়াসলি।

পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিটিং ডেকেছিল। ক্রোচিন দিলে? ঘুমাচ্ছে তো?

হ্যাঁ। তা মিটিং কেন এত রাতে? কিছু হয়েছে?

হতে পারে এই আশঙ্কায়। সব সরকারি ও সব বেসরকারি ডাক্তারদের ডেকেছিল। নাম পাবলিক রিলেশনস্। আসলে থ্রেট।

থ্রেট? ডাক্তারকে?

হ্যাঁ। ছোরা, গুলি, বর্শা, বোমা এ-সবে আহত কোনো রোগী এলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে জানাতে হবে।

কেন? ডাক্তার স্বাধীনভাবে তার রোগীকে চিকিৎসা করতে পারবে না? এ রকম কোনো আইন আছে দেশে?

তা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আইনে ফেলা যায়। সবই অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের কেস, সবই কগনিজেবল্।

বাহ্, যদি ডাক্তার বলে আমি ভেবেছিলাম ওটা গুলি, বর্শা, বোমার ব্যাপারই নয়।

কোনো ডাক্তার যদি ছোরার খোঁচাকে বঁটিতে কাটা মনে করে, গুলির ঘা-কে খোঁচা মনে করে, বোমার আঘাতকে সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট বলে অবশ্যই তার রেজিস্ট্রেশন নাকচ হওয়া উচিত।

পৃথা অনেকক্ষণ ভাবলে। এমন-কি তাকে গালে হাত দিতে হলো ভাবতে গিয়ে।

আচ্ছা, অপারেশনটা না হলেই কি চলবে না? না করে কি প্রাণে বাঁচে না।

মনে হচ্ছে না।

হসপিট্যালে ছাড়া অপারেশন হয় না?

অসম্ভব।

আচ্ছা, হসপিট্যালে গেলে—

দেখ, সেখানে গেলেও সারতে দু-মাস। ততদিনে খবরাখবর নিয়ে পুলিস কিছু একটা ক্লু পাবেই। মনে রেখ সুপর্ণ কলকাতার ছাত্র মহলে এক সময় বেশ পরিচিত ছিল। আর তা ছাড়া তোমাকেও তো তার নামটা বলে দিতে হবে। নাম না জানলে কি করে তাকে চিনেছিলে? কেন আমরা তাকে এ তিনদিন রাখলাম বাড়িতে?

যদি তাই হয়ে থাকে ? তা হলে হসপিট্যালে সেরে উঠলেও···

লাইফার হতে পারে। কিংবা যে লাইফ দেবে তাই আবার ছিনিয়ে নেবে।

পৃথা ফুঁপিয়ে উঠে মুখে কাপড় চেপে নিজেকে থামালে। আর এখানে যদি মৃত্যু হয় ? চান্স নিতে নিতে ?

দেখ, ডাক্তার হিসাবে আমি ডেথ-সার্টিফিকেট দিতে পারি। কিন্তু সেই কনস্টেবল যে তোমাকে খবর দিয়েছিল ? আর সৎকারেও তো একা নিয়ে যেতে পারা যায় না। তা গেলেও তো বরং আরও সন্দেহের বিষয় হবে।·· রাত একটা হলো। স্টেথিস্কোপটা আন।

'তা হলে ছোটোগল্প কাকে বলবেন' : শেষ পর্যন্ত একান্ত অধীর হবেন আপনি। একটা হাসি ফুটে উঠবে তাঁর ঠোঁটের কোণে, কারণ অমিয়ভূষণ এ প্রশ্ন চেয়েছিলেন ; একটু নড়েচড়ে আরো আয়েশ ক'রে বসবেন তিনি, এ হলো আরো অনেকক্ষণ তর্ক চালানোর ভূমিকা। 'কেন, ছোটোও হবে, গল্পও হবে।' তাঁর শানানো মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন না, তবু আপনি অনুভব করবেন তাঁর কথার ধার, বুঝবেন এ একটা রসিকতা হলো। পরের শ্লেষের জন্য আপনি মনে মনে প্রস্তুত, এ সময় হঠাৎ দেখবেন স্বপ্নময় হয়ে এসেছে তাঁর দৃষ্টি, প্রায় স্বগত ভঙ্গিমায় বলবেন অমিয়ভূষণ : 'ছোটগল্প এমন এক বৃত্ত যার কেন্দ্র আছে সর্বত্র, পরিধি নেই কোথাও।'—এ পর্যন্ত হলে হতে পারতো অমিয়ভূষণের কোনো গল্পের সূচনা অংশের একটা অনুকরণ, কেননা অমিয়ভূষণের বেশির ভাগ গল্প এভাবে শুরু হয়। ছোটোগল্প যিনি লেখেন তিনি অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার যা লেখেন তা ছোটোগল্প—এ কথা তিনি তাঁর পাঠককে আগাগোড়া মনে করিয়ে দিতে চান।

কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের পর, দেশ ভাগের পরেও আধুনিক বাংলা ছোটোগল্প পরিমাণে কম লেখা হয় নি। আধুনিক একটা কথার কথা, না হলে প্রসঙ্গে আধুনিক পদ্ধতিতে আধুনিক অথচ ছোটোগল্প হয়ে উঠলো না এমন নমুনা আজকাল এত অঢেল কেন। রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি যাবতীয় নৈতিক সমস্যা একটা ছাঁচে ঢালবার সুলভ ছক হয়ে পড়েছে এই ছোটোগল্প। বিনোদন না হলে গল্প হবে না, প্রচার না হলে গল্প হবে না : মুখোমুখি ঢাকের বাজনায় কানে তালা ধরার উপক্রম। খবরকাগজে চাকরি না পেলে গল্প হবে না, সময়ের দলিল না বানালে গল্প হবে না : যা ইচ্ছে তাই ফতোয়া জারি করছেন যে কেউ। এবং কে কী লিখছেন তা নিজে জানেন না। এ অবস্থায় এখনকার বাঙালি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অনিবার্য দরকার আছে : ইনি ছোটোগল্প লেখেন, ইনি অমিয়ভূষণ মজুমদার।

অমিয়ভূষণের গল্প তাই গল্প দিয়ে শুরু হয়। মধ্যে গল্প থাকে। শেষটাতেও গল্পের প্রসঙ্গ থেকে যায়। অ্যারিস্টটলের কথায় বলা যায়, আদ্যন্ত গল্পের প্লট হয়

গল্পসমন্বিত। 'তাঁতী বউ' গল্পের শুরু হয় এভাবে :

"সব দেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার-যুগ, আর একটি আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগ। বাংলাদেশে অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ। সেই যুগের গল্প একটা বলছি :"

কিংবা 'দুলারহিন্দের উপকথা' শেষ হয় এভাবে :

"সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোন কোন দিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে। তারপর শুধু গল্পটাই থাকবে।"

অমিয়ভূষণ জানেন লোকে যাকে আখ্যান বলে তার মধ্যে ভালো গল্পের উপাদান থেকে যায়। জীবন আর কাহিনী একে অন্যের বিনিময়ের যোগ্য হয়ে ওঠে। তবু উপকথা লোকায়ত ব'লে নয়, উপকথায় কথকের নির্মিতির ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে ব'লে তিনি 'দুলারহিন্দের উপকথা' লেখেন, প্রকরণের এ আত্তীকরণে তিনি নির্মল আনন্দ পান। ফিরে ফিরে বৈঠকি একটা মেজাজ তৈরি করেন তিনি, অম্বুরি তামাকের ঘ্রাণের মতো তাঁর গল্পের মৌতাত প্রাণের গভীরে নেমে আসতে থাকে। 'অ্যাভলনের সরাই' গল্পটি এ রকম আগাপাশতলা গল্প দিয়ে মোড়া। ছোটোগল্পটির শুরুতেই :

'ব্রজেন ওদিক থেকে ফিরে এসে এই গল্পটা বলেছে।'

এবং তারপর :

'এ রকম একটা নতুন উদ্বাস্তু দল কিংবা দলের ধ্বংসাবশেষ নিয়েই এই গল্প।'

আর তারপরেও :

'উদাহরণ হিসাবে দু'তিনটি দিনলিপি উদ্ধার করা যেতে পারে।' এভাবে গল্পের ভেতরকার গল্পের আধারে ছোটোগল্পের থিমটিকে অমিয়ভূষণ ক্রমশ মূর্ত ক'রে তুলতে থাকেন।

'মামকাঃ' গল্পের স্বরূপ এ ধরনে রেখায়িত হয়ে ওঠে :

'হতে পারে গ্রস্, তাহলেও হসপিট্যালের সার্জনের স্ত্রী, সে যদি নোংরা চেহারার নোংরা লুঙ্গি-পরা একজনকে দেখা মাত্র বিচলিত হয়ে কুলির সাহায্যে প্ল্যাটফর্ম থেকে কুড়িয়ে রিকশায় জড়িয়ে ধ'রে বাড়ি নিয়ে আসে তবে তা আলোচনার বিষয় হয় না? সেই কনস্টেবল যে পৃথাকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে কি আর গল্প করছে না? আর এদিকেও এরা দেখ মিথ্যা বলতে শেখাচ্ছে। তা হলে এরা কি আন্দাজ করেছে? সব না হলে, অনেকটা? সে নিজের বোকামিতে অবাক হলো

এবার ।'

পড়ে মনে হয় লেখক যেন খুব একটা জোর দিয়ে ঝোঁক দিয়ে বলছেন : আমার ছোটোগল্প সৃষ্টি নয়, নির্মাণ। ফলে রচনাটিতে শ্লেষের স্বরাঘাত এসে লাগছে, ক্রমে উষ্ণ, তিক্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে তাঁর উচ্চারণ। যেমন 'এপ্‌স্‌ অ্যাণ্ড পিকক্‌' গল্পে :

'ঠিক যেন রবিঠাকুরের সাজানো গল্প ।'

অথবা

'জানালা থেকে সরে এল শমিতা। মনে মনে বলল, এটা একটা রগরগে কথা, একটা রংদার গল্প। তুমি কি ভাববে সৌম্য তুমি সেই ভগ্নমনোরথ কিশোর।'

কিংবা

"আচ্ছা, শমি, একটা গল্প বলি এস।' সৌম্য হাসল যেন। 'দেখ আমি ঔপন্যাসিক হতে পারি কিনা।"

প্রায় ডুবে-যাওয়া মানুষ যে আশাশীল হাত বাড়িয়ে কুটো ধরে, সেই আঁকড়ে ধরতে চাওয়া মুঠোয় এ গল্পের চরিত্ররা যে কোনো সারস্বত উল্লেখের উপর নির্ভর করে—অসহায়, নিরুপায় ভাবে। হোক তা মালার্মের কবিতা, জয়েসের গল্প, ট্রেভেল্যানের ইতিহাস, নিদেনপক্ষে মুখ রক্ষার খবরকাগজ।

আমরা বুঝতে পারি ভিতরে বাইরে এক নির্মাণজাত সংশয় অমিয়ভূষণকে ক্রমশ পেয়ে বসছে। পেয়ে বসছে তাঁর চরিত্রদের :

"শমিতা মনে মনে বলল : 'আ সৌম্য, তুমি হয় তো কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজছো। কিন্তু নাটক নভেলে ঘটনার কারণ খুঁজতে হয়, কোনো ঘটনাকেই হঠাৎ আনলে পাঠক সেটা মেনে নেয় না, আর সব চাইতে ভালো হয় যদি ঘটনাটার বীজ চরিত্রে নিহিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নাও হতে পারে। বরং মেনে নাও ঘটনার পিছনে কারণ নাও থাকতে পারে।'

শমিতা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, 'তোমাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না ?"

মধ্যশ্রেণীসুলভ এই ক্লান্তির চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে শিল্পীর সঙ্গত সন্দেহ, বাস্তব উপাদানের সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়াইয়ের আগে বাছাইয়ের পরে ভারি স্বাভাবিক তাঁর এই দ্বিধাদীর্ণ উচ্চারণ। আসা যাওয়া দুদিকে দ্বার খোলা আছে, পথ খোলা আছে জীবনকে শিল্পকে প্রত্যাখ্যানের নির্বাচনের। 'অ্যাভলনের সরাই' গল্পে :

'এরকম একটা নতুন উদ্বাস্তু দল কিংবা দলের ধ্বংসাবশেষ নিয়েই এই গল্প। কথাটা ওভাবে বলা বোধ হয় ঠিক নয়।'

'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে :

'কিংবা এটাই হয় তো দুটো গল্পের তফাৎ হয়ে থাকবে। অথবা এ বিষয়ে কে বলতে পারে —'

না, কেউ কিছু বলতে পারেন না। তাঁর গল্পের তাঁতি যেমন সহজভাবে তাঁত বোনে, চাষী যেমনভাবে হলুদে ধান কাটতে কাটতে নৈর্ব্যক্তিক গান গায়, ভাইবোন যেমন সরল লুকোচুরি খেলে সেরকম প্রকরণে অমিয়ভূষণ আর ইচ্ছা করলেও ফিরতে পারেন না। অথচ তাঁর ছোটোগল্প বিন্যাস এবং বিন্যাস এবং বিন্যাস দাবি করে। অভিজ্ঞতার যদি বিন্যাস না থাকে তবে তা শিল্পে প্রতিন্যস্ত হতে পারবে কিভাবে। অমিয়ভূষণ তাঁর নিজস্ব ধরনে এই কূটাভাসের নিরসন ঘটান, তিনি আলো অন্ধকারের সন্ধ্যাভাষা বলেন, তিনি অনতিস্পষ্টতার দিকে এগিয়ে যান। একটা ছবি মনে আসে : চেতনার শুরু থেকে শেষ অবধি অন্ধকার আর কুয়াশার নদী ভরে সব স্রোতের দীয়া ভেসে চলেছে ; ঢেউয়ে হাওয়ায় ভাসছে দুলছে অনেক অনেক এলোমেলো আলো—তারা কোনো পথের সারিবাঁধা দীপাধার নয় যেখানে কুকুরেরা নোংরা ছড়াবে।

২

ভাষা যে প্রকাশের উপায় এবং আধার একথা নতুনভাবে মনে পড়ে যখন অমিয়ভূষণ পড়া যায়। আছেন অনেকে যাঁরা ছোটোগল্পর মধ্যে গল্প পেলেই পরিতৃপ্ত এবং অমিয়ভূষণের রচনা তাঁদের দুরূহের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করে। বুঝিয়ে দেয়, গল্প জানলেই তাঁর গদ্যকে চেনা ফুরিয়ে গেল না। সাধারণভাবে বাংলা গদ্য এবং বিশেষভাবে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের গদ্যের পটে অমিয়ভূষণের লেখা কিভাবে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল কোণ রচনা করলো তা আলাদা আলোচনার বিষয়।

ছোটোগল্প শব্দ দিয়ে লেখা হয়, প্রসঙ্গ দিয়ে নয় : অমিয়ভূষণ আমাদের মনে করিয়ে দেন। যাঁরা শব্দের পর অনর্গল শব্দ ব্যবহার করেন, অবিরল বাক্যের পর বাক্য গেঁথে যান—তিনি তাঁদের থেকে দূরের মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনে যে সব কথায় আমাদের লেনদেন চলছে, সংবাদপত্র কমলেকামিনীর মতো নিত্য যে ভাষা খেয়ে উগরে দিচ্ছে, সে ভাষায় তাঁর তৃষ্ণা নেই। বাংলা লেখায় সাংবাদিকতার ক্ষতিকর অভিঘাত এসে লাগছে এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে ভাবিত। ছোটোগল্প এমন কিছু নয় যা সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করলে লেখা যায়। সাহসী সোচ্চার শিরোনামের মতো ছোটোগল্পর বিষয় হাতুড়ি মেরে পাঠকের মাথায় ঢুকিয়ে

দেওয়াকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। তাঁর এ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, তাঁর এই বিরূপতা সঙ্গত। সারা জীবন ছোটো পত্রিকায় লিখে গেলেন ভদ্রলোক, প্রাতিষ্ঠানিক কাগজপত্রের প্রতি তাঁর বিরূপতার গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণ আমরা বুঝি · এমন চোখঠার দিয়ে তাঁর ভাষাপ্রসঙ্গকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সংবাদপত্র একদা বাংলা গদ্যে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল, আজ তা অভিশাপে রূপ পাচ্ছে। সুন্দরভাবে নিজেকে প্রকাশের উন্মুখতা ব'লে আর কিছু নেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যে অমিয়ভূষণের গল্প যেন দৈবঘটনার মতো।

অমিয়ভূষণের ছোটোগল্প আলোচনার অনেকটাই তাঁর নির্মিতির আলোচনা, তার বিচার এবং বিশ্লেষণ। ছোটোগল্প তাঁর কাছে সেই কবিতা যা গদ্যে লেখা হয়। এবং একই সঙ্গে ছোটোগল্প তাঁর কাছে প্রবন্ধ যা বেশ কঠিন ক'রে বাঁধার জিনিশ। আরো অনেকের মতো শ্লথ শিথিল কথার অপরিপাটি অনান্দনিক জাল উদ্দেশ্যহীনভাবে বুনে চলা কখনো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়, সুযোগ এবং চেতনা নিয়ে বাংলা গদ্যকে তিনি তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তোলার কাজে লেগেছেন। তাঁর সমূহ গল্প একটি কল্পনাকুশল মননশীল ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ, তাঁর সমস্ত গল্পে এক সচেতন সংবেদনশীল সত্তার পরিচয় বিকীর্ণ। সামাজিক বস্তু হিশেবে ভাষার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর নাগরিক চেতনা তো আছেই, অধিকন্তু ছোটোগল্প একটি শিল্পপরিণতি তাই সংস্কৃতিকর্মীরূপে তাঁর স্বআরোপিত ভূমিকা আরো বেশি লক্ষ করার বিষয়। এই বোধ তাঁর সর্বতোভদ্র জীবনের চেতনার এক অংশ। এক পাণ্ডুর মেরুদণ্ডহীন সমাজে কশেরুকাটান গদ্যের অতিঋজু সঞ্চরণের আলাদা প্রত্যয় ও আনন্দ আছে —তাঁর লেখা একথা মনে করিয়ে দিতে চায়।

সৃষ্টিশীল গদ্যের মধ্য দিয়ে যুক্তির যথাযথতা ও মননের বস্তুময়তা প্রকাশে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর গল্পে নাগরিক সংলাপচালনার সূত্রে তাঁর চিন্তাশ্রয়ী মানস স্বচ্ছ হয়, আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর ছোটোগল্পের গদ্য যুক্তির শৃঙ্খলায় বদ্ধ, কার্য আর কারণের সূত্রে গ্রথিত, পদন্যাসের পদ্ধতিতে মাননীয় এবং বাক্যগঠনরীতিতে বিশিষ্ট। ব্যাকরণের অনড় বন্ধনকে অস্বীকার করেও যে এত সহজ এমন প্রাঞ্জল এরকম দেশজ গদ্য লেখা যায়, স্নিগ্ধ তির্যক ঠাশবুনোট গদ্যের রূপ যে এমন শ্রীমণ্ডিত হতে পারে তা অমিয়ভূষণ না পড়লে মনে হবার নয়। সাংবাদিকতা যেখানে সাহিত্যের আবহ দূষিত করেছে সেখানে ভাষার এই শুদ্ধতাবোধ এক আশ্চর্য চর্যা। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কথা মনে রেখেও বলা যায় গদ্যের এই সুকুমার দৃঢ়তা বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

বাংলায় গল্পগুচ্ছ বোধহয় তাঁর একমাত্র আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের

কথাসাহিত্য সম্পর্কে তিনি তত সশ্রদ্ধ নন হয়তো, তবু রবীন্দ্রনাথ যেখানে গল্প শেষ করে গেছেন সেখান থেকে একমাত্র শুরু করতে পেরেছেন তিনি। এই উত্তরাধিকার আত্মস্থ হয়েছে, কারণ শেষ পর্যায়ের রাবীন্দ্রিক গদ্যের ভাবালু বিহ্বলতা তাঁর মধ্যে নেই। শেষের কবিতা তিনি কখনো ভালো উপন্যাস বলবেন না, নিবারণ চক্রবর্তী তাঁর কাছে কোনো দিন আদর্শ বিবেচিত হবে না। শেষের কবিতার অতিশয়োক্তি তাঁর বিবমিষা উদ্রেক করবে, কারণ পরিমিতির বোধ শিল্পীর সমাজচেতনার ভিন্ন নাম। অমিয়ভূষণ শব্দচয়নে পদন্যাসে বাক্যগঠনে যতিব্যবহারে অনুচ্ছেদবিভঙ্গে তীক্ষ্ণ মনোযোগী এবং বয়নের এই পারিপাট্য তাঁর সমগ্র রচনায় ব্যঞ্জনার ধ্বনি এনে দেয়। তাঁর লেখায় ক্বচিৎ-কখনো কাদামাটির গন্ধমাখা আনকোরা দেশি শব্দ এসে পড়ে, তাতে গদ্যের শীলিত প্রসন্নতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁর ভাষার অন্তরঙ্গে শুচিতাবোধ আছে, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই। নেই বলেই তিনি 'মামকাঃ' গল্পে অবলীলায় লিখতে পারেন :

"পৃথা দুধ করে, বোতলে ভরে, ঘরে গিয়ে, ঠোঁটে আঙুল রেখে ডান তর্জনী ভাঁজ করে ঠোঁটের উপরে আলতো আলতো ছোঁয়ালেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই পাখির ছানার মতো হাঁ করে মাই খোঁজে।"

অর্ধশিক্ষিত মধ্যশ্রেণী সম্পর্কে অমেয় অবজ্ঞা এবং অশিক্ষিত মাটির মানুষদের প্রতি আশ্চর্য মমতার বোধ থেকে এই ভাষা উৎসারিত হয়। এ ভাষা রমণীয় চিত্ররূপময় তির্যক বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু চটুল চিত্রালু তাৎক্ষণিক চালাকি মাত্র নয়।

অমিয়ভূষণের চরিত্ররা ভাবে, ভাবায়, তারা ন্যূনকথনে বিশ্বাসী তাই তিনিও মিতাক্ষরে আস্থাবান, তারা বিহ্বলতায় হাস্যকর হয়ে ওঠে না তাই তাঁর গদ্যও ভাবাবেগে ক্লিন্ন নয়। এ গদ্যের নির্ভরে তিনি তরতর করে সেন্টিমেন্টের ফাঁড়াগুলো কাটিয়ে যান। 'এপ্‌স্‌ অ্যাণ্ড পিকক্‌' গল্পে :

"কিন্তু, চশমাটা আবার পরল সৌম্য সেজন্যই কি লক্ষ্যো এলো, ভাবল শমিতা —রগের শিরা দুটো যেন ফুলে উঠেছে। যেমন নাকি, গল্পে বলে, উত্তেজনার সময়ে হয়। আর তখনই তার মনেও পড়ল গোড়ার দিকে সৌম্য প্রশ্ন করেছিল, তুমি যে মহাভুজগের মতো ঘনালস্পর্শ বাহুর কথা বলেছিলে সেকি কোনো নাটক থেকে? মহাভুজগতুল্য বাহু যা বধূকে রক্ষা করে? তখন এমন দেখিয়েছিল সৌম্যকে।"

আর এমন করে প্রত্ন রূপকল্প ও সমকালের চিত্র তিনি মিলিয়ে দেন, আধুনিক ভঙ্গিমা ও ধ্রুপদী শৈলীর সমাহারে এক নতুন গদ্যরীতি বানিয়ে তোলেন। বীরবলের কাছে তাঁর ঋণ কম নয়, সবুজপত্রের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক দেখাতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী থেকে অন্নদাশঙ্কর পর্যন্ত যে দীপ্ত গদ্য ভাবালুতায়

আদ্র্য তা অমিয়ভূষণের রচনার সম্পর্কে অন্বিত নয়।

শৈলীর অচলতা থেকে চঞ্চল ভঙ্গিমায় ফিরতে পারে অমিয়ভূষণের গদ্য, এ গদ্য কাব্যময়তা ও আখ্যানধর্মকে উপযুক্তভাবে মেলানোর কৌশল আয়ত্ত করেছে। 'তাঁতী বউ' গল্পে :

"সকালে তাঁতঘরে গিয়ে গোকুল প্রথমে কিছুক্ষণ এত সূক্ষ্ম কাজ করল যা জীবনে করে নি। মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানত? শিরা উপ-শিরার শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শ্বেতচন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে। মনের খানিকটা অংশ জুড়ে (গোকুলের মনে হলো বুকে) যে শুভ্রতা কমনীয় হয়ে উঠছিল, স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল তার একবার অনুভব হল সেটা শুভ্র উরুদেশের ছায়া। ঘরে ফিরে এসে সে দেখল তার শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাঁদী। রাত্রির স্বপ্নের সঙ্গে দিনের আলোর মিল দেখে সে অবাক হল একটু।"

এই গদ্য দিয়ে সরেস জিনিশ বানান অমিয়ভূষণ, নিপুণ হাতে তোলা এই নকশা সুন্দর উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়ময় বর্ণবান। শ্রেষ্ঠ গল্প থেকে মাত্র দুটো নমুনা :

১. সেখানে রেবেকা ছিল, সবুজ শেমিজ পরা, লেসের শেমিজ পরা, লাল শেমিজ পরা, লাল, সোনালী, সবুজ মদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শেমিজ পরা, হাতীর দাঁতের তৈরী রেবেকা। [অ্যাভলনের সরাই]

২. শোভা হাসলো। আর অবশ্য এটা তার ভুল ধারণাই, কে আর তাকে এমন দুর্বল দেখেছে শোভার মতো, অসাড় সাপের মতো তাকে, ভুল ধারণাই যে তাকে কম বয়সের একজন মনে হয়। ভুল ধারণাই কারণ সে শোভার সমবয়সী হবে। তা ছাড়া এটা···পুরুষদের এটাই নিয়তি সব জায়গায়, সময়ের কাছে, মাটির কাছে—কথাটা হাত পাতা বলতে পারো, আর তখনই তাকে দেখে মায়া হয়। নিজের চাইতে কমবয়সী মনে হয়। [উরুণ্ডী]

যত্নে দোলা দেয় এই গদ্যের ছন্দ, কাব্যময় কোথাও কোথাও মগুন থাকলেও কখনো তা কাব্যিক নয়, শক্তি আর সুষমার সমন্বয়ে তৈরি এ গদ্য ভাষার ব্যঞ্জনা ভাষার চাতুর্যের আশ্রয় নেয়, এই শৈলী বাক্‌প্রতিমার মধ্য দিয়ে প্লটের বিন্যাস গড়ে তোলে। এবং আমরা সহসা না খোলা দরজা দিয়ে অচিহ্নিত এক গোলাপ-বাগানে উপনীত হই, ভোরবেলা আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হই এক আশ্চর্য নগরীতে।

বেশির ভাগ বাঙালি গল্পকারের রচনার সঙ্গে অমিয়ভূষণের গল্পের দ্বন্দ্বকে যদি শুদ্ধ নান্দনিক পরিভাষায় অনুবাদ করতে হয় তা হলে সেটা দাঁড়াবে বাস্তববাদের সঙ্গে যথাস্থিতবাদের দ্বন্দ্ব। সাংবাদিকতা অমিয়ভূষণের কাছে কোনোমতেই গল্প নয়, তবু খবরকাগজের আকর্ষণীয় ইনসেস্ট এসেছে তাঁর রচনায়। যিনি গল্পকে বয়স্কের যৌন তৃপ্তির আধার রূপে দেখাতে নারাজ, যিনি ডকুমেণ্টশনে একান্ত অনীহ তাঁর রচনায় অজাচার কেন কিভাবে কিরকম ব্যবহার পায় তা সতর্ক পর্যবেক্ষণের বিষয়। বাঙালি গল্পে জায়া ও জননী প্রথম থেকেই একাকার, কিন্তু অমিয়ভূষণের গল্পের নায়িকা ময়নামতীর মতো এক শিশু-স্বামীকে বুকে তুলে পথ পার হতে চায়। এমন নমুনা এখানেও দুর্লভ নয়। যেমন 'দুলারহিন্দের উপকথা'য় ভাই-বোনের নিষিদ্ধ সম্পর্কের ব্যবহার : "দুলারহিন্ ছোটবেলার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে—যেমন করে ছোটোবেলায় বলতো, আমি মরে গেছি। উরু দুটি প্রসারিত, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি, ঈষৎ মুক্ত ঠোঁট দুটি, বুক কাঁপছে থরথর করে।

কিন্তু দুলারহিন্ ধড়ফড় করে উঠে বসলো।" হোক বেদনা, হোক তা যন্ত্রণা, কিংবা নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্ক—যে কোনো লিপিবদ্ধ জৈবিক প্রণালীর বর্ণনা—তা যত অনুপুঙ্খ হোক, যতই শিল্পিত হোক, তা পূর্ণাঙ্গ জটিল মানবিক সম্পর্ক উন্মোচনের পথে বাধাস্বরূপ এবং তাই অমিয়ভূষণ যথাযথবাদের কাছে কখনো নিজেকে সমর্পণ করে দেন না। মূল্যবোধের অবনমন নেই বলে এখানে অমিয়ভূষণ ঝোঁক দেন শেষ বাক্যটির উপর : 'কিন্তু দুলারহিন্ ধড়ফড় করে উঠে বসলো।'

প্রকৃতিবাদী লেখকদের সারিতে তাঁকে বসাতে ইচ্ছে হবে যখন দেখা যাবে তিনি বারবার ধর্ষণের দৃশ্যে ফিরে আসছেন। কিন্তু আসলে পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ-শাসিত সমাজের সামন্ততান্ত্রিক পিছুটান, শোষণের এক ভিন্ন রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করছেন, চোখে আলো ফেলে দেখিয়ে দিচ্ছেন আমাদের। দুলারহিন্দের উপকথা-য় .

'—আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুড়ি তো বটেই। ভাইকে টাকা দেবো আমি।

—চার কুড়ি? বেশ তাই হবে। আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও ভাইকে টাকা দিতে ইচ্ছা হয়, দেখা যাবে।

—না, টাকাটাই আগে দিতে হবে।

—ও খুব দাম বাড়াতে পারো যা হোক। আগে দেখি কত দাম হতে পারে। এই বলে দুলারহিনের আঁচলের একপ্রান্তে চেপে ধরলো লোকটি।'

বাস্তবতার একটি নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে এই নগ্ন প্রান্তর থেকে। সামাজিক পণ্য নারী। হিংস্রতার শিকার নারী, একই সঙ্গে কামনার শিকার। 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে :

"আবার যেন পেমার ভারি দেহটাকে টেনে তুলতে গেল সে, কিন্তু তখনই হয়তো পেমার উজ্জ্বল ত্বক চোখে পড়লো তার, কিংবা পেমার ছড়ানো পা দুখানা। তীব্র কালো অন্ধ আক্রোশে মেজরের তত্ত্ব আর অনুভূতি এক হয়ে গেলো, আর তখন তার দুহাতের নৃশংসতায় পেমার পেটিকোট ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো।"

যারা সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পায় শরৎচন্দ্রের মতো অমিয়ভূষণ তাদের পক্ষে। এবং এ যন্ত্রণা তাঁর ভালোবাসার লক্ষ্য স্থির করে দেয়, তাঁর ঘৃণার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে। তাঁর দৃষ্টি এবং ভঙ্গির নির্ধারক এ যন্ত্রণা। বাস্তববাদের চেতনার সঙ্গে এই বেদনার কোনো অমিল নেই, অমিল থাকার কথা নয়।—

১. বারে বারে বলল, 'কাঁদিস নে, কাঁদিস নে'। কোথা থেকে সাহস পেয়ে বাঁদী দুহাতে গোকুলকে আঁকড়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। [তাঁতী বউ]

২. নিঃশেষে শূন্য বুকে বোধ হয় বেশীক্ষণ কাঁদাও যায় না।

[দুলারহিন্দের উপকথা]

৩. কিন্তু চোখের জল তার গালের উপর ঘাসের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলো।

[অ্যাভলনের সরাই]

৪. মরার চাইতেও হার। মরাটা হারা নয়। যেন দড়ি ধরে খাদের উপরে ঝুলে থাকতে হাত ভেরে গেল। আর্তনাদ করতে করতে খসে পড়লো। [উরুণ্ডী]

৫. ঠোঁট দুটো কাঁপল শমিতার, সে প্রশ্বাসটাকে চেপে ধরল নিঃশ্বাসের সমতা আনতে। তারা আমাকে অপমান করেছিল। বার বার। [এপ্‌স্ অ্যাণ্ড পিকক্]

এক অর্থে অমিয়ভূষণের সব ছোটোগল্প অনার্দ্র গদ্যে লেখা কান্নার গল্প। কান্না আসার গল্প, কান্না আটকে রাখার গল্প, কান্নাকে হাসিতে পালটে দেওয়ার গল্প, কান্নায় চোখের কোণে ক্লেদ জমার চেয়ে ভেতরে ঢেউ তুলে ভেতরেই ভেঙে পড়ার গভীর গল্প। কান্নার এই প্রসঙ্গটিকে তিনি বর্ণনা করেন না, ব্যাখ্যা করেন না, ভাষাকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়েন না, বরং ঢেউ যেমন স্বচ্ছন্দ সাবলীলভাবে সাঁতারুকে জলে তুলে তুলে দেয়, তেমনি এই অশ্রুজল চেতনার তরঙ্গের শীর্ষ থেকে শীর্ষে পাঠককে পৌঁছে দেয়, উত্তীর্ণ করে।

অমিয়ভূষণের গল্পে দেশকালের বৈচিত্র্য আছে, তবু অনেক বস্তুতান্ত্রিক রচয়িতা যে উচ্চকিত দাবি তোলেন সে অনুযায়ী গল্পকে শ্রেণীভিত্তিক স্থানভিত্তিক করার প্রয়াস তাঁর নেই। শোষিতদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে নিজের কাছে এমন

শপথ তিনি করেন নি, বা লিখলে শোষিতদের উপভাষায় লিখতে হবে এমন দিব্যও তিনি নিজেকে দেন নি। কিছু প্লাস্টিকের পুতুল আছে যাদের পেট টিপলে উপ-ভাষার প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ হয়, অমিয়ভূষণ তেমন পুতুল বানান না। তিনি তার বদলে বৈদগ্ধ্যের ক্যাসেট চালিয়ে দেন : কেউ হয়তো পালটা বলে ফেলবেন। উত্তরে অমিয়ভূষণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি হাসবেন, জানিয়ে দেবেন : লেখকের আত্মগোপন আবশ্যিক নয়। এবং ব্যক্তিব ব্যক্তিত্ব নয়—মানবিক এবং সামাজিক নির্ধারকগুলি তার প্রগতিকে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করে। প্রসঙ্গের টানে গদ্য আসবে, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যদি দরকার হয় অমিয়ভূষণ নিভাষা ব্যবহার করবেন, অসামঞ্জস্য এড়ানোর জন্য যদি দরকার হয় তিনি উপভাষা বর্জন করবেন। 'মামকাঃ' গল্পে কোনো আধ্যাত্মিক রগড় নেই ব'লে যেমন লেছু মিঞার ধড়ে সুপর্ণর মুণ্ডু লেগেও লাগে না তেমনিভাবে বাংলা বাস্তববাদী গল্পগুলোয় ভাষা-উপভাষার এই অসামঞ্জস্য অনেক সময় থেকে যায়।

অমিয়ভূষণের গল্পে আরেকটি সংলগ্ন নান্দনিক সমস্যা আছে। বাস্তবতার সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে নিজেদের বিশ্ববীক্ষাকে মিলিয়ে দেবার চতুর খেলা যাঁরা খেলেন অমিয়ভূষণ তাঁদের দলভুক্ত নন। উত্তর দেখে অঙ্ক কষায় তাঁর আপত্তি। বিশ্ব-বীক্ষার ছাঁচে ঢালা বিকৃত মিথ্যা কোনো বাস্তবতার বোধ বিষয়ে বড়াই করায় তাঁর স্পৃহা নেই। তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর সৃজনী-দৃষ্টিতে অবয়ব পায়, মূর্ত হতে থাকে, জীবন্ত হয়ে ওঠে, সে জীবন তাদের প্রাতিস্বিক জীবন, তাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত অস্তিত্বের নিহিত দ্বন্দ্বেই অর্জিত তাদের নিয়তি। তাঁর চরিত্রগুলির নিজস্ব বিবর্তন আছে, এজন্যও তিনি একজন বড়ো শিল্পী।

তাঁর গল্পে এইসব চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কখনো পুরোপুরি মুছে যায় না, সমাজও একেবারে লেপাপোঁছা হয়ে যায় না—চরিত্র আর পরিস্থিতির সপ্রাণ সংশ্লেষে তিনি সাধারণ আর বিশেষকে মিলিয়ে দেবেন মনে করেন, আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে আসা ঘষাপাথরের একটা মূর্তির কথা মনে পড়ে। বাস্তব-বাদের কেন্দ্রীয় নান্দনিক সমস্যা হলো সম্পূর্ণ মানবিক ব্যক্তিত্বের যথাযথ উপস্থাপন, অমিয়ভূষণ তাঁর গল্পে এই দায়িত্ব অঙ্গীকার করে নেন। ফলে একান্ত অন্তর্মুখিতায় সংবৃত হয় না তাঁর গল্প, সম্পূর্ণ বহির্মুখিতায় উৎকেন্দ্রিক হয় না—বাস্তবের এই দুধরনের বিকৃতির মধ্যে থেকে তিনি এক তৃতীয় আয়তন খোঁজেন যার নাম বাস্তবতা।

অমিয়ভূষণ একই সঙ্গে জানেন মানবতার ট্র্যাজিক বোধ কখনো পরিণতি পাবে না, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে যা রূপ দেয় তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন; মানবিক

লক্ষ্যকে যা কিছু জটিল করে সীমাবদ্ধ করে তাকে তিনি সুস্থিত সকরুণ নেত্রপাতে অবলোকন করে যাবেন। এই দ্বিধাবিতর্কের সূত্রটিকে তিনি তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন :

"দেখুন এই সাহিত্যিক, অমিয়বাবুর কথাই ধরুন, আপনার প্রিয়জনস্থানীয় অমিয়বাবুর, যখন ভাবের প্রসারতায় সহানুভূতিতে তাঁর চোখ দুটি করুণায় ভরে উঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে, কলমকে অব্যাহত ছেড়ে দিলে যখন গ্রীক্ ক্লাসিকের স্বল্প পরিমিত গভীর বেদনার দু'চারটে কথা লিখে ফেলবেন মনে হচ্ছে ঠিক তখনই টপিকাল কোনো কথা উত্থাপন করে বাজে কথার অবতারণা করে নিজের ভাবাবেগকে ব্যঙ্গ করে নিজের লেখাটাকে থার্ডক্লাস করে তুলবেন।"

আমাদের প্রিয়জনস্থানীয় সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম শ্রেণীর সব লেখায় এই গহনমুদ্রা জয়যুক্ত হোক।

বীতশোক ভট্টাচার্য